[নব-পর্যায়]

স্বদেশকথা

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী

দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী : কলিকাতা

Written according to the New Syllabus in History for Class IX of all Secondary Schools in West Bengal, as prescribed by the West Bengal Board of Secondary Education.

[নব-পর্যায়]

স্বদেশকথা

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী,
এম. এ., এল. এল. বি., পি. এইচ্. ডি.

দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট · কলিকাতা-১২

প্রথম মুদ্রণ—ডিসেম্বর, ১৯৭৩

প্রকাশক :
দি সেণ্ট্রাল বুক এজেন্সীর পক্ষে
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সেন, বি. এস্-সি.
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০১২

মুদ্রাকর :
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৯এ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম পাঁচ টাকা ষাট পয়সা

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ্ কর্তৃক বিজ্ঞাপিত পাঠ্যসূচী অনুসারে নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বইখানি রচিত হইয়াছে। পাঠ্যসূচী নির্ধারণে অসঙ্গতি পদে পদে রহিয়াছে। পাঠ্যসূচীতে গ্রন্থকারের স্বাধীনতা এভাবে আর কখনও খর্ব করা হয় নাই। যাহা হউক, ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝিবার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা এই বই রচনাকালে করিয়াছি। ছাত্র-ছাত্রীদের উপকারে লাগিলে আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে পড়াশুনার সাফল্য ইতিহাসের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর অত্যধিক নির্ভর করিবে। বইয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে কৃতজ্ঞ হইব। আমার পূর্বের বইয়ের ন্যায় এই বইখানিও তাঁহাদের সহৃদয় আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হইবে না, আশা রাখি। ইতি—

কলিকাতা
১৫ ডিসেম্বর, ১৯৭৩

গ্রন্থকার

শ্রদ্ধাস্পদ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রতি

সবিনয় নিবেদন

প্রশ্নপত্র রচনা পদ্ধতির পরিবর্তন করা আজকাল শিক্ষক-শিক্ষিকা তথা শিক্ষাবিদ্ মাত্রেই প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করাই যদি পরীক্ষা গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে প্রশ্নপত্রে সমগ্র পাঠ্যসূচীর প্রতিফলন একান্ত প্রয়োজন। স্বল্পসংখ্যক প্রশ্ন সম্বলিত প্রশ্নপত্রের মাত্র কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর চাহিয়া পরীক্ষার্থীদের ভাগ্য পরীক্ষায় উপস্থিত করিবার বর্তমানে প্রচলিত রীতি পরিরর্তন করা যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্নপত্রে মোট নম্বরের পঞ্চাশ (বা কম) শতাংশের জন্য প্রবন্ধমূলক (Essay type) প্রশ্ন, চল্লিশ (বা বেশী) শতাংশের জন্য স্বল্প-উত্তরমূলক (Short answer type) প্রশ্ন এবং অবশিষ্ট দশ (বা বেশী) শতাংশের জন্য লক্ষ্যমূলক (Objective type) প্রশ্ন দেওয়া যাইতে পারে। ইহাতে অল্প নম্বরের প্রশ্নের সংখ্যা অনেক বেশী দেওয়া চলিবে, পাঠ্যস্থচীর সকল অংশের উপর প্রশ্নগুলি ছড়াইয়া দেওয়া যাইবে। পরীক্ষার্থীরাও ছোট ছোট উত্তর লিখিয়া অধিক সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে। Objective type প্রশ্নের ক্ষেত্রে দশ শতাংশ নম্বরের জন্য ত্রিশ বা চল্লিশটি ছোট ছোট প্রশ্ন করা চলিবে। এগুলির উত্তর যে-সকল পরীক্ষার্থী পড়াশুনা করিয়া পরীক্ষা দিতে আসিবে তাহারা সাত হইতে দশ মিনিটের মধ্যে দিতে পারিবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী পরীক্ষাগুলিতে উপরি-উক্ত প্রশ্ন রচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে। শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি অযৌক্তিক মনে না করেন তাহা হইলে স্কুলের পরীক্ষায় এই পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারেন। মধ্য-শিক্ষা পর্ষদের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকর্ষণ করি।

এই পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে উপরি-উক্ত তিন প্রকার প্রশ্নের কতক নমুনা দিবার চেষ্টা করিয়াছি। অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা আরও সুন্দরভাবে এবং স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী লক্ষ্যমূলক (Objective type) প্রশ্ন রচনা করিতে পারিবেন, এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। ইতি—

কলিকাতা
১৫. ১২. ৭৩

গ্রন্থকার

৩৭২০

SYLLABUS IN HISTORY

PART A (for Class IX)

HISTORY OF INDIA UP TO THE MIDDLE OF THE 19th CENTURY

I. Geography : Its influence on the country, its people and History.
Elements of India's population—Evolution of composite culture—Fundamental unity.

II. Source material : Ancient, medieval and modern period.

III. Antiquity of India and her civilisation : Indus Valley Civilisation. Coming of the Aryans, Civilisation and religion as revealed in the Vedas and the Upanishads.

IV. Growth of Jainism and Buddhism.

V. (i) Foreign Invasions : Persian, Greek (Macedonian and Bactrian) Scythian (Saka-Parthians, Kusanas and Huns).
(ii) General nature of resistance. Impact of foreign inroads on the social and cultural life. Re-disposition of Indian Society : Rise of the Rajputs.

VI. Bid towards Imperial Unity : its different phases :
Under Magadha : (l) From Bimbisara to Asoka.
(ii) Chandragupta I to Skandagupta
Under Kanauj : From Pusyabhuti Harsha to Pratihara Mahendrapala
Under Gauda : From Sasanka to Devapala.

VII. Society and Culture (in North and South India) from the 4th Century B.C. to the 14th Century A.D.

VIII. Indian Culture and Civilization beyond India.

XI. (a) Rise, growth and decline of Turco-Afghan power.
(b) Rise, growth and decline of Mughal Power in India.

X. Impact of Mahomedan rule on social and economic life on art, architecture, literature, language and religion. Religious reformers

XI. (a) The Mahrattas : From Sivaji to Baji Rao-II (in outline)

(b) The Sikhs : from Nanaka's successors to Ranjit Singh (in outline).

XII. Advent of the Europeans : Their rivalries : Emergence of the English—From Trade to Political domination.

XIII. Expansion of British Power from Clive to Dalhousie (References to wars with the Sikhs, in outline).

XIV. (i) Reforms under Warren Hastings, Cornwallis. Bentinck, Dalhousie and Ripon.

(ii) Social, cultural and religious reforms under Indian initiative.

Rammohan Roy, Derozio and Young Bengal, Brahma Samaj leader, Iswar Chandra Vidyasagar, Syed Ahmed Khan, Prarthana Samaj, Dayananda, Ramkrishna Paramhansa.

XV. Reaction against British rule. Background of the Mutiny and Revolt of 1857—Causes, Progress, nature, Its outcome. End of the rule of the East India Company. India on the threshold of a new era.

The book on Part A should consist of 185 pages with 30 pages of illustrations.

॥ সূচীপত্র ॥

সূচনা

(Introduction)

মানুষ ও তাহার পরিবেশ (Man and his environment) : ইতিহাস শুধু প্রাচীন কালের কাহিনী নহে। সভ্যতার পথে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া মানবজাতি কিভাবে অগ্রসর হইয়াছে সেই কথা হইল ইতিহাসের বিষয়বস্তু। সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রগতি নির্ভর করে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা ও পরিবেশের উপর, আর মানুষের পরিবেশ এবং কতক পরিমাণে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা নির্ভর করে আবাসভূমির ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের উপর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানবগোষ্ঠীর পরিবেশ একই প্রকার নহে, সেজন্য বিভিন্ন দেশের ইতিহাসও এক রূপ নহে। পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতা এবং পরিবেশকে জয় করিবার মত প্রতিভা থাকিলেই সভ্যতার পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। আজ মানুষ সত্যই চাঁদের দেশে পৌছিবার চেষ্টায় সাফল্য লাভ করিয়াছে ; সে কৃত্রিম চাঁদ সৌর জগতে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছে। চাঁদের দেশ আজ রূপকথার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন মানুষ সামান্য ঝড়-তুফান, বন্যা, দাবাগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জন্তু-জানোয়ার প্রভৃতির সম্মুখে অসহায় বোধ করিত। কিন্তু প্রকৃতি আজ মানুষের কাছে পরাজিত ; জন্তু-জানোয়ার আজ মানুষের ভয়ে ভীত এবং মানুষের আজ্ঞাবহ। আদিম স্তর হইতে ধারাবাহিক চেষ্টা ও অগ্রগতির ফলেই আদিম মানুষের বংশধর আমরা আজিকার সভ্যতায় আসিয়া পৌছিয়াছি। মানবসমাজের এই ধারাবাহিক চেষ্টা ও অগ্রগতির কাহিনীই হইল 'ইতিহাস'। ইতিহাস কেবল রাজা-মহারাজাদের কাহিনী বা বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের বিবরণ নহে। পৃথিবীর বৃহত্তর মানবসমাজ কিভাবে পরিবেশের সহিত যুঝিয়া বর্তমান সভ্যতায় আসিয়া পৌছিয়াছে, আদিম যুগের গুহা-মানব কিভাবে আজিকার সুসভ্য ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই কথার আলোচনাই হইল ইতিহাসের বিষয়বস্তু।* মানুষ ও তাহার পরিবেশ হইল ইতিহাসের মূল ভিত্তি। আবার মানুষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে তাহার মাতৃভূমির ভূপ্রকৃতি। মানুষের দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা এবং পরিবেশ বহুলাংশে নির্ভর করে দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের উপর। জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা।

ইতিহাস

ইতিহাসের মূল ভিত্তি—মানুষ ও তাহার পরিবেশ

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা

ভারত তথা প্রত্যেক দেশেরই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা অল্প-বিস্তর নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সুতরাং জাতির চরিত্র, কৃষ্টি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন—এক কথায় জাতির ইতিহাস গঠনে ভূগোলের প্রভাব অপরিসীম, একথা অনস্বীকার্য।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

* cf. 'His (*i.e.*, Man's) Story'=History.

ভূগোল : ভারত, ভারতবাসী ও ভারত-ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাব

(Geography : Its influence on the Country, its People and History)

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশ (Geographical Environment of India) : ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতীয়দের জাতীয় চরিত্র গঠনে ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশের গুরুত্ব অত্যধিক। ভারতের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালা ভারতবর্ষকে এশিয়া মহাদেশের অপরাপর দেশ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতশ্রেণী আফগানিস্তান, রাশিয়া, ইরাণ প্রভৃতি দেশ হইতে এবং পূর্বে আরাকান পর্বত ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। অপর প্রায় তিন দিক বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এইভাবে প্রকৃতি-প্রদত্ত সীমারেখা ভারতবর্ষকে শুধু অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্নই করে নাই, চতুর্দিক দিয়া রক্ষাও করিতেছে।

সুনির্দিষ্ট সীমারেখা

ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। ইহা নিজেই একটি মহাদেশের ন্যায় সুবিশাল। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা ভারতবর্ষে স্বভাবতই থাকিবে, ইহা বলা বাহুল্য। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতবর্ষকে পাঁচটি সম্পূর্ণ পৃথক অংশে ভাগ করা চলে—যথা, (১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতল ভূমি, (৩) মধ্য-ভারতের মালভূমি, (৪) দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, এবং (৫) সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল।

পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত

ভারতবাসী ও ভারত-ইতিহাসের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব (Influence of Physical Geography on the Indians and India) : ভারতবর্ষ যেন প্রকৃতির কোলে সন্তান। উত্তরে অভ্রভেদী হিমালয় পর্বত ভারতবর্ষকে বহিরাক্রমণ হইতে কেবল নিরাপদে রাখিয়াছে এমন নহে, হিমালয় হইতে নির্গত নদ-নদী ভারতভূমিকে শস্য-শ্যামল করিয়া তুলিয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের বারিপাত হিমালয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। অরণ্য-সম্পদ, খনিজ-সম্পদ ও কৃষি-সম্পদে সম্পদশালী ভারতবর্ষের জনসমাজের জীবন-ধারণের কোন সমস্যা প্রাচীন কালে ছিল না। ফলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসী শ্রমবিমুখ, ধর্মপ্রবণ, কাব্য, শিল্প ও সাহিত্যে অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল।

হিমালয়ের প্রভাব

ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বত ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রাচীন কালে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিন্ধ্য পর্বত দক্ষিণ-ভারতের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারত-ইতিহাসের কোন কোন

কালে আর্যাবর্তের পরাক্রমশালী রাজগণ দাক্ষিণাত্য বিজয়ে সমর্থ হইলেও দাক্ষিণাত্য অঞ্চলকে সম্পূর্ণভাবে উত্তর-ভারতের সহিত ঐক্যবদ্ধ করিতে পারেন

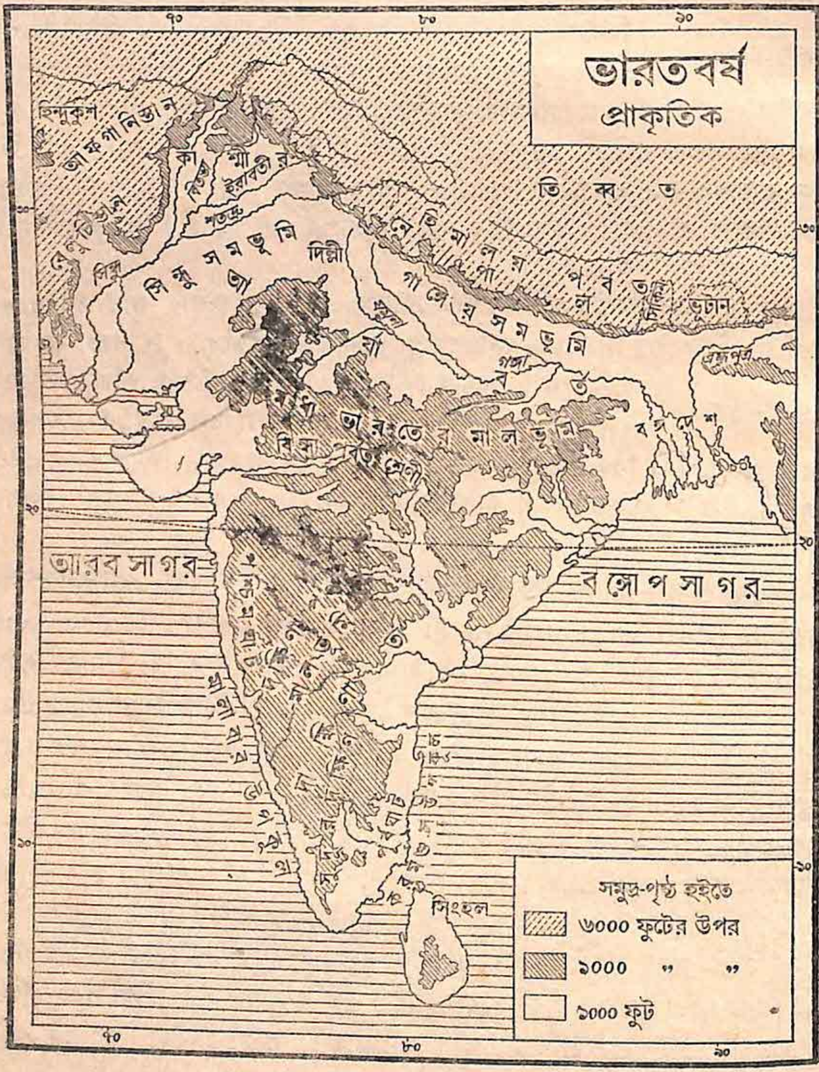
বিন্ধ্য পর্বতের প্রভাব

নাই। বিন্ধ্য পর্বতই যে এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। নতুবা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ়তর হইত, বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমা পর্বতশ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত এবং দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব যথাক্রমে ভারত মহাসাগর, আরব

স্বতন্ত্র সভ্যতা

সাগর ও বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। এইভাবে পৃথিবীর অপরাপর অংশ হইতে প্রকৃতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে ভারতবর্ষে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতা



গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতি দ্বারা সুরক্ষিত বলিয়া ভারতবর্ষের সহিত বহির্জগতের কোন সম্পর্ক ছিল না, একথা মনে করিলে ভুল হইবে। সুদূর অতীত হইতেই ভারতবর্ষ এশিয়া ও ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমের খাইবার, বোলান, গোমাল প্রভৃতি গিরিপথ ধরিয়া আর্যদের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। পারসীক, গ্রীক, শক, হূণ, তুর্কী, আফগান, মোঙ্গল প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আমাদের জন্মভূমিকে এক মহামানবের মিলন-তীর্থে পরিণত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির সহিতও বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ফলে নানা সংস্কৃতির দানে পুষ্ট ভারতীয় সংস্কৃতি এক অপূর্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ভারত মহাসাগর ও অপরাপর সমুদ্রপথে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ

বহু জাতি ও ধর্মের লোকের মিলন-তীর্থ

সুদীর্ঘ সমুদ্র উপকূলরেখার নানা স্থানে বাণিজ্য-বন্দর গড়িয়া উঠিবার ফলে সমুদ্রপথ ধরিয়া অতি প্রাচীন কালেই চীন, রোম, মিশর, চম্পা, কম্বোজ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সিংহল প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের এই সকল বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতেই ক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চম্পা, কম্বোজ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এমনকি, এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রভাব ও নিদর্শন এই সকল অঞ্চলে আজিও বিদ্যমান আছে। সমুদ্রপথ ধরিয়াই আধুনিক কালে ইংরেজ বণিকগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমে এদেশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি মধ্য-এশিয়ায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। খোটান, ইয়ারখন্দ, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলেও ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

সমুদ্রপথে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার

ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণাংশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অধিবাসিগণ সমুদ্রের সন্নিকটে থাকিবার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই সমুদ্র-প্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতের উত্তরাংশের জনসাধারণ সেই পরিমাণ সমুদ্র-প্রবণ হইবার সুযোগলাভ করে নাই। উত্তর-ভারতের কেবল বাংলা-দেশের ন্যায় সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত দেশের এবং সিন্ধু নদের গতিপথ ধরিয়া কতক পরিমাণ সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের চলাচল ছিল। সমুদ্রের প্রতি দাক্ষিণাত্যবাসীর অধিকতর টান থাকিবার একমাত্র কারণ হইল প্রাকৃতিক প্রভাব—অর্থাৎ সমুদ্রের সান্নিধ্য। এইভাবে নানা দিক দিয়া ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস প্রাকৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

ভারতের দক্ষিণাংশ ও উত্তরাংশের জনগণের মধ্যে সমুদ্র-প্রবণতার পার্থক্য

ভারতের নরনারী (Indian People) : ভারতের অধিবাসীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া বিচার করিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত ভারতবাসীকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করিয়াছেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনায় ভারত-সরকার ভারতবাসীকে মোট সাতটি জাতিতে ভাগ করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর হাটন (Dr. J. H. Hutton) ভারতবাসীকে মোট আটটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ডক্টর গুহ (Dr. B. S. Guha) নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ভারতবাসীকে মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতই বর্তমানে মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য বলা যাইতে পারে। এই ছয়টি ভাগ হইল : (১) নিগ্রিটো, (২) প্রোটো-অস্ট্রল্যায়ড, (৩) মোঙ্গল্যয়ড, (৪) মেডিটারেনিয়ান, (৫) ওয়েষ্টার্ন ব্র্যাকিসিফেলাস, এবং (৬) নর্ডিক।

বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদের মতামত

ছয়টি জাতি

নিগ্রিটো জাতির লোকেরা ভারতে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একমাত্র আন্দামান-নিকোবর, আসামের আঙ্গামী নাগা, দক্ষিণ-ভারতীয় ইরুল্লা, কুরুম্বা প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে 'নিগ্রিটো' জাতির বংশধরগণকে দেখা যায়। ইহাদের দেহের রং কালো, চুল পশমের মত, নাক চ্যাপটা এবং শরীরের গড়ন বেঁটে।

নিগ্রিটো (Negrito)

প্রোটো-অস্ট্রল্যায়ড—অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন এক জাতির লোক ভারতের বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর ('lower castes') মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই জাতীয় লোকের বংশধরদের বসবাস আছে।

প্রোটো-অস্ট্রল্যায়ড (Proto-Austroloid)

মোঙ্গল্যয়ড জাতির লোকদিগকে প্রধানত চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মোঙ্গল্যয়ড (Mongoloid)

মেডিটারেনিয়ান—অর্থাৎ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের আদিম অধিবাসীর সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন জাতির লোক গঙ্গা-উপত্যকা, সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মেডিটারেনিয়ান (Mediterranean)

ব্র্যাকিসিফেলাস জাতির লোকের বাস হইল বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, গঙ্গা-উপত্যকা, কানাড়া, তামিল, গিলগিট, চিত্রাল প্রভৃতি অঞ্চলে।

ওয়েষ্টার্ন ব্র্যাকিসিফেলাস (Western Brachycephallous)

নর্ডিক বা আর্য জাতির বংশধরগণকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতির লোক প্রধানত পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র (মারাঠী চিৎপাবন ব্রাহ্মণ) অঞ্চলে বসবাস করে।

নর্ডিক বা আর্য (Nordic or Aryan)

এখানে উল্লেখ করিতে হইবে যে, উপরি-উক্ত জাতিগুলির বসবাসের স্থান সম্পর্কে কোন কঠোরতা নাই। সকল অঞ্চলেই এই জাতির লোকের সংমিশ্রণ ও বসবাস পরিলক্ষিত হয়। কোন জাতিরই জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই।

বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ

ভারতবাসীর মধ্যে মৌলিক ঐক্য (Fundamental Unity among the Indians): 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান' থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীদের মধ্যে এক মহামিলনের অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে 'মহামানবের সাগর' আখ্যা দিয়াছেন। বস্তুত বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার-আচরণ, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের জনসমাজের এক অপূর্ব সমাবেশ আমাদের এদেশে ঘটিয়াছে। আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হূণ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মহামিলন-তীর্থ আমাদের এই ভারতভূমি। ধর্মের দিক দিয়া এদেশে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান, পারসীক, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর এক বিরাট সমন্বয় ঘটিয়াছে।* সেই কারণে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিভিন্ন মত ও পথের বিভিন্ন আচার-আচরণের ও ধ্যান-ধারণার এক সমষ্টিগত ফলস্বরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈচিত্র্য বিরাজমান। নানা আচার-আচরণ, জাতি, ভাষা ও ধর্মের লোক দ্বারা অধ্যুষিত ভারতভূমি এক বিচিত্র দেশে পরিণত হইয়াছে। ভারতের বৈচিত্র্য শুধু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও আচার-আচরণেরই বিভিন্নতা নহে, প্রাকৃতিক দিক দিয়াও এই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দিক দিয়া বিচার করিলে আমাদের দেশে শস্য-শ্যামল উর্বর প্রান্তর যেমন আছে তেমনি অনুর্বর মরুদেশও দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চতার দিক দিয়া হিমালয় পর্বত পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাথায় ধারণ করিয়া ভারতের উত্তর-সীমান্তে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। আবার সুগভীর গুহা ও কন্দরের অভাবও এদেশে নাই। আবহাওয়ার দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতে শীতল, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ—তিন প্রকারের আবহাওয়াই পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়া, লতা, গুল্ম, জীবজন্তু, বৃক্ষাদি সব দিক দিয়াই ভারতবর্ষে এক চরম বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভৌগোলিক বৈষম্য ও বৈচিত্র্য ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনেও প্রতিফলিত হইয়াছিল। ফলে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।**

জাতি, ভাষা, ধর্ম ও আচার-আচরণের পার্থক্য

সমষ্টিগত সংস্কৃতি (Composite culture)

বিচিত্র দেশ

ভাষা, আচার-আচরণ ও জাতি-ধর্মের বৈষম্য

ভৌগোলিক বৈচিত্র্য

কিন্তু নানা প্রকার বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীর মধ্যে এক গভীর একত্ববোধ প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপি বিরাজিত। ভারতীয় সভ্যতার মূল কথাই

* "From the human point of view India has been often described as an ethnological museum, in which numberless races of mankind may be studied, ranging from savages of low degree to polished philosophers. That variety of races, languages, manners, and customs is largely the cause of the innumerable political subdivisions which characterize Indian history before the unification effected by the British supremacy." V. A. Smith: *The Oxford History of India* (3rd Edn. revised by T. G. P. Spear), p. 5.

** Vide V. A. Smith: *The Oxford History of India* (3rd Edn.), p. 4.

হইল সমন্বয়সাধন করা। সুতরাং প্রাকৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে এক মূলগত ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক ঐক্যের উপর এই ঐক্য নির্ভরশীল নহে। ইহা হইল মনের ঐক্য। 'ভারতবর্ষ' নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আসমুদ্র হিমাচল এক বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা জাগে।* এই ঐক্যবদ্ধ এক বিশাল দেশের ধারণাই আমাদের মনে এক জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবও ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সত্ত্বেও হিন্দুসভ্যতার মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতির লোক বিভিন্ন সংস্কৃতি লইয়া এই দেশে প্রবেশ করিয়া এই সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই মূল সভ্যতার কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই সভ্যতার একটি বিশেষ রূপ আছে, পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতা-সংস্কৃতি হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। একই সাংস্কৃতিক ঐক্য স্বভাবতই ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগাইতে সাহায্য করিয়াছে।** পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতা-সংস্কৃতি হইতে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ভারতবাসীকে অন্তরের দিক দিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে সাহায্য করিয়াছে, বলা বাহুল্য।

বিভিন্নতার মধ্যে একতা

'ভারতবর্ষ' নামের ঐক্য

সাংস্কৃতিক ঐক্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির লোকের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু মোটামুটি একই ধরনের জীবনযাত্রা, একই ধরনের খাদ্য-পানীয় ও পরিবেশ ভারতবাসীর মনে পরোক্ষভাবে এক ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে।† প্রাচীন ভারতের রাজগণের 'একরাট', 'সম্রাট' প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং মৌর্য আমল, গুপ্ত যুগ প্রভৃতি বিভিন্ন কালে ভারতের এক বিশাল অংশের রাজনৈতিক ঐক্যসাধন প্রভৃতি ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল।

জীবনযাত্রার মোটামুটি একতা

স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্র ভারতবাসীকে এক গভীর দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের ঐক্যবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং জাতি, ধর্ম,

* "উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য
হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ভারতং নাম
ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥" বিষ্ণুপুরাণ, ২॥৩॥১

** "The most essentially fundamental Indian unity rests upon the fact that the diverse peoples of India have developed a peculiar type of culture or civilization utterly different from any other type in the world." Smith (3rd Edn.) p. 7.

† Vide Sir J. N. Sarkar's article; 'Unity of India'. *Modern Review*, Nov., '42.

ভাষা, আচার-আচরণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদেশের সকলেই 'ভারতবাসী'। এক গভীর আন্তরিক ঐক্যবোধ ভারতীয়দিগকে একই সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই ঐক্য রাজনৈতিক একতা বা ভৌগোলিক ঐক্যের উপর নির্ভরশীল নহে, ইহা হইল ভারতবাসীর অন্তরের একতা।*

'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের প্রভাব

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারত-ইতিহাসের উপাদান
(Source Materials of Indian History)

5.4.82

ইতিহাসের উপাদান (Sources of History): সভ্যতার পথে মানুষ যতই অগ্রসর হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক চিহ্নাদিও সে ততই অধিক পরিমাণে রাখিয়া গিয়াছে। এই কারণে ভারতের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানও ভিন্ন ভিন্ন। এই তিনটি পৃথক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ

2/1) **প্রাচীন যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Ancient Indian History):** ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, (১) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, (২) শিলালিপি, তাম্রলিপি, (৩) মুদ্রা, (৪) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প-চিহ্নাদি, (৫) দেশীয় লেখকদের রচনা, এবং (৬) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ।

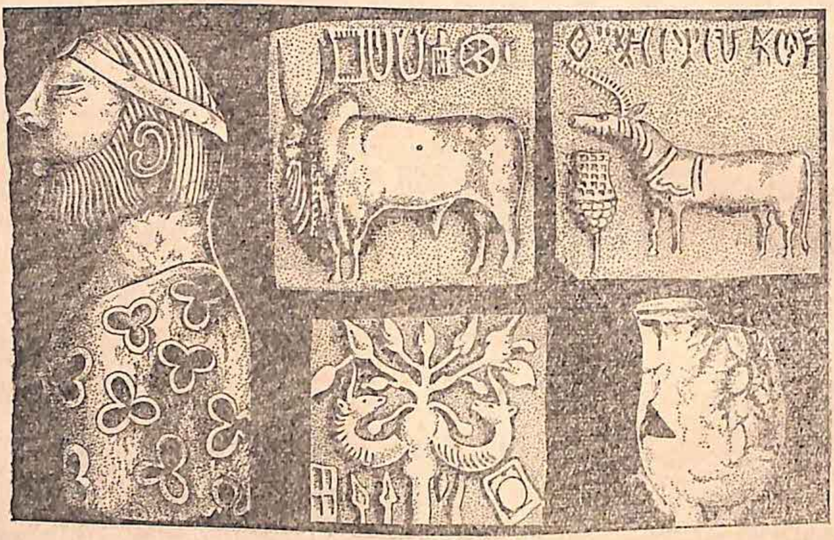
বিভিন্ন উপাদান

(১) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান: প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন ভারতের নানা স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের ফলে এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের আদি সভ্যতা যে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি—যথা, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় প্রভৃতির সমসাময়িক ছিল সেকথা প্রমাণিত হইয়াছে। কেবল সিন্ধু-উপত্যকায়ই নহে, সাঁচী ও সারনাথে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে মৌর্য আমলের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। নালন্দায়ও তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের

মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, সাঁচী, সারনাথ, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক চিহ্ন

* "India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or by political suzerainty. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners, and sect." Smith: *The Oxford History of India* (3rd Edn.), p. 7.

লিখিত ইতিহাস না পাওয়া গেলেও এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে একটি মোটামুটি ইতিহাস রচনা করা যায়।)



প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

(২) **শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি :** (প্রাচীন ইতিহাস রচনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি। প্রাচীন কালে যখন কাগজপত্রাদির ব্যবহার জানা ছিল না তখন রাজা-মহারাজারা পাথরের উপর অথবা তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর উপর তাঁহাদের আদেশ, দানপত্র প্রভৃতি খোদাই করিয়া দিতেন।) এগুলি সেই সকল রাজার রাজত্বকালের অতিশয় নির্ভরযোগ্য উপাদান, সন্দেহ নাই। বিশেষত এগুলিকে পরবর্তী কালে অদল-বদল করিবারও কোন উপায় থাকে না। (প্রাচীন ভারতের শিলালিপিগুলির মধ্যে মৌর্য সম্রাট অশোকের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি প্রভৃতি তাঁহার আমলের ইতিহাস রচনার এক অতি নির্ভরযোগ্য উপাদান।) এইভাবে এলাহাবাদের এক স্তম্ভগাত্রে গুপ্ত যুগের সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের বিজয় কাহিনী খোদিত পাওয়া গিয়াছে। এই সকল লিপি প্রাচীন ইতিহাস রচনার অমূল্য সম্পদ।)

পাথর ও বিভিন্ন ধাতুর উপরে খোদিত লিপি

অশোকের শিলালিপি

সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি

(৩) **প্রাচীন মুদ্রা :** (প্রাচীন কালের রাজাগণের মুদ্রা—অর্থাৎ ধাতু-নির্মিত টাকাকড়ি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রায় রাজার নাম, তারিখ, রাজার প্রতিকৃতি বা কোন দেব-দেবীর ছাপ খোদাই করা



প্রাচীন মুদ্রা

আছে। এগুলি হইতে স্বভাবতই আমরা রাজার শাসনকাল, সেই সময়কার ধাতুশিল্পের উন্নতি, রাজা-মহারাজাদের ধর্মমত, সঙ্গীতানুরাগ প্রভৃতি সম্পর্কে জানিতে পারি। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্তি হইতে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে পাওয়া গেলে এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল একথাও অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রীক, শক, বাহ্লিক প্রভৃতি যে-সকল বিদেশী জাতির রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের নাম আমরা তাঁহাদের মুদ্রা হইতে জানিতে পারিয়াছি।

ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে প্রাচীন মুদ্রার গুরুত্ব



প্রাচীন মুদ্রা

(৪) **স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন** : প্রাচীন যুগে নির্মিত বাড়ী-ঘর, দালান-প্রাসাদ প্রভৃতির চিহ্নাদি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে মাটির নীচ হইতে যেমন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তেমনি মাটির উপরেও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্থাপত্য নিদর্শন হইতে তখনকার কালে স্থাপত্য শিল্প কতদূর উন্নত ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ-বিষয়ে সাঁচী স্তূপ এবং উহার রেলিং, তোরণ-দ্বার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাস্কর্য শিল্পেরও বহু প্রাচীন নিদর্শন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। গন্ধার নামক স্থানের ভাস্কর্য রীতি বৌদ্ধ, গ্রীক ও রোমান ভাস্কর্য শিল্পের প্রভাবে যে এক অতি সুন্দর রূপ লাভ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন আজিও বিদ্যমান।

প্রাচীন বাড়ী-ঘর, দালান-প্রাসাদ, মূর্তি প্রভৃতির গুরুত্ব

(৫) **প্রাচীন কালের রচনা** : প্রাচীন কালে রচিত সাহিত্য-গ্রন্থাদি হইতেও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ হইতে বৈদিক যুগের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি হইতেও প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যাদি সংগ্রহ করা গিয়াছে। মৌর্য যুগে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পরবর্তী কালের কবি বাণভট্ট-প্রণীত হর্ষ-চরিত, বাকপতির 'গৌড়বহো', কলহনের 'রাজ-তরঙ্গিণী', বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্ক-চরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি : অর্থশাস্ত্র, হর্ষ-চরিত, গৌড়বহো প্রভৃতি

(৬) **বৈদেশিক বিবরণ** : অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদেশী ভ্রমণকারিগণ আমাদের দেশে আসিয়া তাঁহাদের ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের অনুচরবর্গের অনেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সীরিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকাস মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মেগাস্থিনিস

ভারতবর্ষে অবস্থানকালে মেগাস্থিনিস মৌর্য শাসন এবং তখনকার জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস ভিন্ন ডেইমেকোস, ডাইওনিসাস প্রভৃতি গ্রীক দূতও অনুরূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও গ্রীক চিকিৎসক টেসিয়াসের বিবরণে প্রাচীন ভারতের বর্ণনা পাওয়া যায়। জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীক লেখক 'পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে ভারতীয় পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য সম্পর্কে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন।

ডেইমেকোস, ডাইওনিসাস হেরোডোটাস, টেসিয়াস

প্রাচীন যুগে চীন দেশ হইতেও বহু পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ই-সিঙ, ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ প্রভৃতির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ফা-হিয়েন গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। গুপ্ত যুগ ও হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু তথ্য ইঁহাদের রচনায় পাওয়া গিয়াছে।

ই-সিঙ, ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব লেখকদের রচনায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। আরব লেখকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ অলবিরুণী হিন্দু যুগের শেষভাগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দুদের সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'তহ্‌কক্‌-ই-হিন্দ' গ্রন্থে সেই যুগের হিন্দুদের আচার-আচরণ, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে এক অতি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়।

অলবিরুণী

মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Medieval Indian History) : মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাস রচনার পর্যাপ্ত উপকরণ আছে। এগুলিকে সরকারী দলিলপত্র, সমসাময়িক ঐতিহাসিক রচনা, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, মুদ্রা ও শিল্প-নিদর্শন এবং হিন্দু লেখকগণের রচনা—এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

বিবিধ উপাদান

(১) সরকারী দলিলপত্র : সুলতানি আমল এবং মোগল শাসনকালের সরকারী দলিলপত্রাদি ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনার অতি মূল্যবান উপকরণ। এগুলির অধিকাংশই যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এবং সংরক্ষণের অভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে। মোগল সম্রাট আকবরের গ্রন্থাগারে এক বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ছিল কিন্তু সেগুলির একটিও আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পৌছায় নাই।

সরকারী দলিলপত্র —বিনাশপ্রাপ্ত

(২) সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা : আমীর খুস্রু বা খুস্রভ মধ্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচনায় সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক তথ্যাদিও পাওয়া যায়। আমীর খুস্রু ভিন্ন মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ, শাম্‌স-ই-সিরাজ, হাসান নিজামী, জিয়া-উদ্দিন বর্‌নী, ফেরিস্তা প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনা সেই যুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। আবুল ফজ্‌ল-প্রণীত 'আকবর-নামা' ও

আমীর খুস্রু, মিন্‌হাজ, হাসান, ফেরিস্তা, জিয়া-উদ্দিন, আবুল ফজ্‌ল, বদাউনী

'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থদ্বয় আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। ইহা ভিন্ন, বদাউনী-রচিত ইতিহাস গ্রন্থও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

বাবর ও জাহাঙ্গীরের জীবন-স্মৃতি

সুলতানি ও মোগল সম্রাটদের অনেকে নিজ নিজ জীবনচরিত রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। এগুলিও সমসাময়িক ইতিহাস রচনার উপাদানে পরিপূর্ণ। এগুলির মধ্যে ফিরুজ শাহের স্বরচিত 'ফতোয়াৎ-ই-ফিরুজ শাহী', 'বাবরের জীবন-স্মৃতি', 'জাহাঙ্গীরের জীবন-স্মৃতি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'আলমগীর-নামা', 'পাদশাহ্-নামা', 'মুন্তাখাব্-উল্-লুবাব্'

উপরি-উক্ত উপাদানগুলি ভিন্ন 'আলমগীর-নামা', 'পাদশাহ্-নামা', খাফি খাঁ রচিত 'মুন্তাখাব্-উল্-লুবাব্' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

(৩) বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা : সুলতানি ও মোগল শাসনকালে বহু বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইহাদের রচনা হইতে সেই সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো, আফ্রিকাবাসী ইবন্ বতুতা, চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান, মোগল যুগে জেসুইট্ ধর্মযাজকগণ, ইওরোপীয় পর্যটক বার্থেমা, বার্বোসা, র‍্যাল্ফ ফিচ্, টমাস রো, বার্ণিয়ে, তেভার্নিয়ে, টেরি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পারসীক পর্যটক আব্দুর্ রজাক্, পোর্তুগীজ পায়েজ ও হুনিজ, ইতালীয় নিকোলো কণ্টি প্রমুখ পর্যটকের রচনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায়।

মার্কো পোলো, বন্-বতুতা, মাহুয়ান, জেসুইট্ ধর্মযাজকগণ, র‍্যাল্ফ ফিচ্, টমাস রো, বার্ণিয়ে, তেভার্নিয়ে, টেরি প্রভৃতি

(৪) মুদ্রা ও স্থাপত্য নিদর্শন : মধ্য যুগের সুলতান ও সম্রাটগণের মুদ্রা হইতে তাঁহাদের আমলে ধাতুশিল্পের উন্নতি এবং মুদ্রানীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সুলতানি ও মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্প ও চিত্রশিল্প হইতে সেই যুগের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কুতব মিনার, আলাই দরওয়াজা, তাজমহল, আগ্রা ও দিল্লীর কেল্লা প্রভৃতি এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মধ্য যুগের—অর্থাৎ সুলতানি ও মোগল যুগের স্থাপত্য শিল্পে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণ

(৫) হিন্দু লেখকদের রচনা : মারাঠা ইতিহাস-গ্রন্থাদি, রাজপুত চারণদের রচনা প্রভৃতিতেও সেই যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায়। টডের 'রাজস্থানের ইতিহাস' (Annals and Antiquities of Rajasthan) গ্রন্থখানি রাজপুত চারণদের রচনার উপর নির্ভর করিয়াই রচিত।

মারাঠা ইতিহাস-গ্রন্থাদি, রাজপুত চারণদের রচনা

আধুনিক যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Modern Indian History) : ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার

উপকরণগুলির মধ্যে সরকারী কাগজপত্র, ইওরোপীয় বাণিজ্যকুঠির দলিলপত্র, দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিক রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১) সরকারী কাগজপত্র : ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপকরণ সরকারী কাগজপত্র হইতে পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে কাগজপত্র হইতে এই যুগের ইতিহাস রচনা করা যায়। ফরাসী পর্যটক 'জ্যাকেমোঁ' (Jaquemont) বলিয়াছিলেন যে, ভারত-সরকারের (ব্রিটিশ) শাসনকার্য 'কাগজ-কলমে'র দ্বারাই চলিতেছে। এই উক্তি হইতে ভারতের আধুনিক ইতিহাস রচনায় সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব

(২) ইওরোপীয় বাণিজ্যকুঠির দলিলপত্র : ইংরেজ, ফরাসী, পোর্তুগীজ, দিনেমার প্রভৃতি ইওরোপীয় বণিকের বাণিজ্য কুঠিতে যে-সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইতেও ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ করা যায়।

বাণিজ্যকুঠিতে প্রাপ্ত দলিলপত্রের গুরুত্ব

(৩) দেশীয় ও বিদেশীয় রচনা : ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'সিয়ার-উল্-মুতাখেরিণ', 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন', 'খুলাসাৎ-উৎ-তোয়ারিখ্', তামিল ভাষায় লিখিত আর. এ. পিলাই-এর 'দিনপঞ্জী', ফরাসী গভর্নর ডুপ্লের 'ডুবাস', ইংরেজ ঐতিহাসিক মিল, উইল্‌কস্, গ্র্যাণ্ট্ ডাফ প্রভৃতি রচিত গ্রন্থাদি এ-যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ।

ফারসী, তামিল, ফরাসী ও ইংরেজী গ্রন্থাদি

তৃতীয় অধ্যায়

ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব

(Antiquity of India and Her Civilization)

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। একমাত্র চীন ভিন্ন অপর কোন দেশ এত প্রাচীন এবং নিরবচ্ছিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরবের অধিকারী নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া এবং বিভিন্ন উপকরণে পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ভারত ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব

সিন্ধু সভ্যতা (Indus Valley Civilization) : ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু প্রদেশের 'মহেঞ্জোদরো' নামক স্থানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের খননকার্য আরম্ভ করেন। এই স্তূপটি একটি উঁচু ঢিপির উপর নির্মিত ছিল। এই ঢিপিটি সিন্ধুদেশের লোকের নিকট 'মহেঞ্জোদরো'—অর্থাৎ 'মড়ার ঢিপি' নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ স্তূপটির খননকার্য শুরু করিলে উহার তলদেশ হইতে এক বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত সিন্ধু-সভ্যতা

আবিষ্কৃত হয়। ইহার পর বর্তমানে পাকিস্তান পাঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থান, চানহুদরো, স্থংকাজেনদোর প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের দ্বারা ঐ একই রূপ বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল নিদর্শন একই সভ্যতার পরিচয় বহন করে। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া এই সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া এই সভ্যতার নামকরণ হইয়াছে 'সিন্ধু-সভ্যতা'। পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক যুগ হইতে শুরু হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এখন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৈদিক যুগের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। ইহা মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয় প্রভৃতি প্রাচীনতম সভ্যতার সমসাময়িক ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা

'সিন্ধু-সভ্যতা' নামকরণ ও প্রাচীনত্ব

সিন্ধু-উপত্যকার মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, চানহুদরো, স্থংকাজেনদোর, ভাওয়ালপুর প্রভৃতি নানা স্থানে সিন্ধু-সভ্যতার চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা নামক শহর দুইটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুইটি শহরের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান থাকিলেও জল-পথে সহজ যোগাযোগের উপায় ছিল।* এই দুইটি স্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝা যায় যে, উভয় শহরই পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছিল। উভয় শহরই রৌদ্রে পোড়া ইটের উচ্চ ভিত্তির উপর নির্মিত। দালান বা প্রাসাদ অবশ্য পোড়া ইটের প্রস্তুত ছিল। অপরাপর যে-সকল স্থানে খননকার্যের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে পরিকল্পনা ও গঠনকৌশলের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা—সিন্ধু-সভ্যতার দুইটি শ্রেষ্ঠ শহর

পোড়া ইট ও রৌদ্রে পোড়া ইটের ব্যবহার

মহেঞ্জোদরো শহরের রাস্তাগুলি ছিল সোজা ও চওড়া। রাস্তার পাশ ধরিয়া সারিবদ্ধভাবে ছোট-বড় অসংখ্য দালান নির্মিত ছিল। দালানগুলির গড়ন-ভঙ্গিমা, পরিসর প্রভৃতি দেখিয়া ধনী-দরিদ্রের বাসস্থানের পার্থক্য সুস্পষ্ট-ভাবে বুঝিতে পারা যায়। ক্ষুদ্র দুই কক্ষযুক্ত দালান হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাবশেষও মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দালানগুলি যে দ্বিতল বা ততোধিক উচ্চ ছিল তাহা সিঁড়িগুলি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। দালান মাত্রেরই দেওয়াল ও মেঝে অত্যন্ত মসৃণ ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতেই কূপ, স্নানাগার প্রভৃতি ছিল। মহেঞ্জোদরোতে একটি বিরাট প্রাসাদ, একটি বিশাল স্নানাগার এবং চতুষ্কোণ স্তম্ভবিশিষ্ট একটি বিরাট হলঘর আবিষ্কৃত হইয়াছে। হরপ্পার ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি বিশাল শস্যভাণ্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে একই স্থানে কতকগুলি

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর পূর্ত কার্যাদি

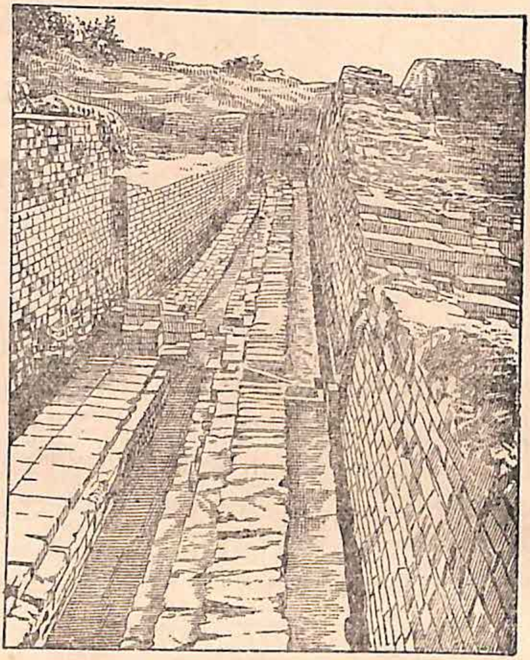
স্থাপত্য কার্য

* Vide Wheeler: *The Indus Civilization (The Cambridge History of India, Supplementary Volume)*, p. 2. ff.

ছোট ছোট দালানের পাশাপাশি নির্মাণ-ভঙ্গী দেখিয়া এগুলি শ্রমিকদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

আধুনিক ধরনের পয়ঃপ্রণালী

মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি শহরের পয়ঃপ্রণালী আধুনিক ধরনের ছিল। প্রত্যেক দালান হইতে জল-নিকাশের সুন্দর-ব্যবস্থা ছিল। নর্দমা রাস্তার তলদেশ দিয়া নির্মিত ছিল। এই সকল নর্দমা দিয়া জল যাইবার কালে আবর্জনাগুলি আটকাইয়া রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গর্ত করিয়া দেওয়া হইত। নাগরিক জীবনকে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিবার যাবতীয় ব্যবস্থা মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় ছিল।



রাস্তা ও রাস্তার নীচে পয়ঃপ্রণালী (মহেঞ্জোদরো)

মন্দির বা কোনপ্রকার উপাসনা গৃহের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই

সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন যে-সকল স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কোথাও কোন মন্দিরের বা উপাসনা গৃহের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। ধর্মকর্মাদি ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ বাড়ীতেই সম্ভবত লোকে করিত। যাহা হউক, সিন্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন হইতে সেই যুগের লোক যে অতি উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন করিত সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

খাদ্য

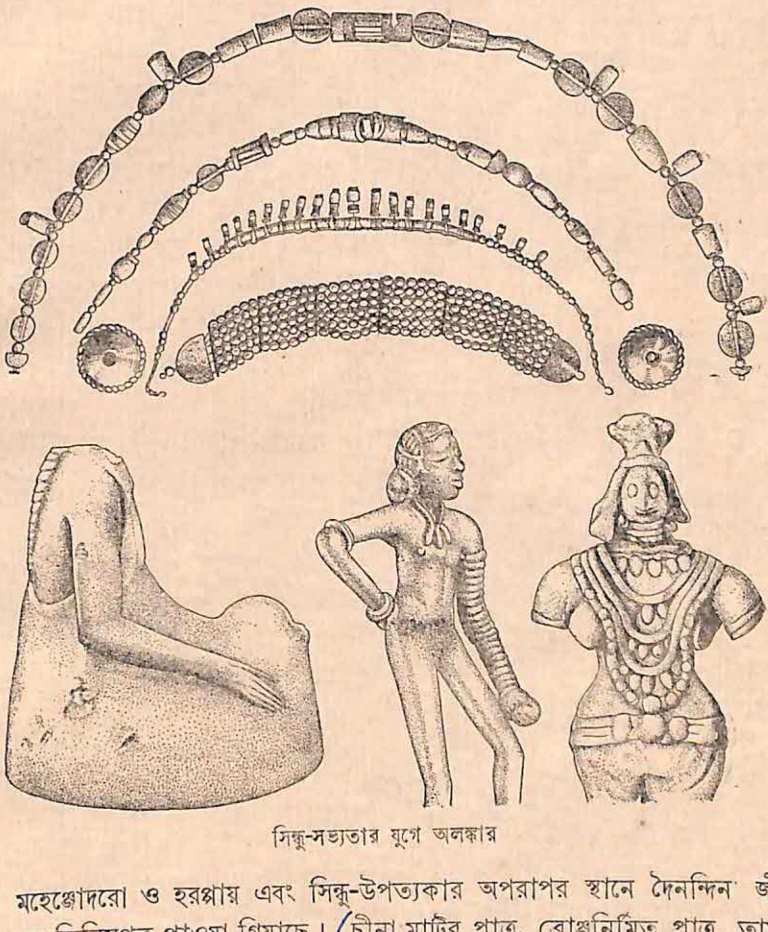
সিন্ধু-সভ্যতার কালে লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল গম, বার্লি, খেজুর প্রভৃতি। এগুলি ভিন্ন নানা প্রকার ফলও তাহারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিত। গরু, শূকর, ভেড়া, হাঁস, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস তাহারা খাইত। দুধ, শুকনা মাছ, সিন্ধু নদের টাটকা মাছ প্রভৃতি তাহাদের অপরাপর প্রধান খাদ্য ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদ

সূতী ও পশমী উভয় প্রকার বস্ত্র সে-যুগের লোকেরা ব্যবহার করিতে জানিত। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে পোশাক-পরিচ্ছদের কোন চিহ্নাদি পাওয়া যায় নাই। তবে প্রস্তর মূর্তির পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হয় যে, সে-যুগের লোকেরা শরীরের উপরাংশের জন্য একখণ্ড এবং নিম্নাংশের জন্য পৃথক

একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করিত। অলঙ্কারাদি স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ব্যবহার করিত। তবে কানপাশা, নাকের অলঙ্কার, হার, কোমরবন্ধ প্রভৃতি স্ত্রীজাতিই ব্যবহার করিতেন। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা, হাতীর দাঁত এবং মূল্যবান পাথর অলঙ্কার নির্মাণে ব্যবহৃত হইত। স্ত্রীজাতি আধুনিক কালের ভারতীয় নারীদের ন্যায় কেশবিন্যাস করিতেন। প্রসাধন সামগ্রীও যে তাঁহারা ব্যবহার করিতেন সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

অলঙ্কারপত্র



সিন্ধু-সভ্যতার যুগে অলঙ্কার

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় এবং সিন্ধু-উপত্যকার অপরাপর স্থানে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে। চীনা মাটির পাত্র, ব্রোঞ্জনির্মিত পাত্র, তামা ও রূপার পাত্র, সূচ, মাছ ধরিবার বড়শি, চিরুনি, কুঠার, বর্শা, থালা, বাটি, জগ, ক্ষুর, আয়না, কাস্তে প্রভৃতি বহু প্রকার জিনিস হইতে সিন্ধু-সভ্যতার যুগে লোকেরা যে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। মাটির পাখী ও ফাঁপা ঝুনঝুনি, ছোট ছোট চেয়ার, ঠেলাগাড়ী, খাট, চারপাই

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র

খেলনা

প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের খেলনা হইতে মনে হয় যে, এইরূপ জিনিস দৈনন্দিন জীবনেও ব্যবহৃত হইত।

অস্ত্রশস্ত্র

সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হরপ্পা বা মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া যায় নাই। এই দুইটি শহরের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে দুর্গাদি নির্মিত হইয়াছিল এই অনুমান করা হইয়া থাকে।* যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র হিসাবে ছুরি, তীর-ধনুক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি তখন ব্যবহার করা হইত। কিন্তু ঢালজাতীয় কোনপ্রকার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সাজ পাওয়া যায় নাই। অস্ত্রশস্ত্র তামা ও ব্রোঞ্জ দ্বারা নির্মিত ছিল।

শিল্পকলা ও সীলমোহর

সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ব্রোঞ্জনির্মিত একটি নর্তকী-মূর্তি মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন, বিভিন্ন পশুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত বহু সীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। এগুলির নির্মাণকৌশল এবং এগুলিতে অঙ্কিত পশুর প্রতিকৃতি দেখিয়া, সে-যুগের শিল্পীদের শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাহা অনুমান করা যায়। এঁটেল মাটি এবং বালি দ্বারা নির্মিত কয়েকটি পশু ও মানুষের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিও উচ্চ শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক।

চিত্রলিপি

সিন্ধু-উপত্যকায় মোট দুই হাজার সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির উপরে একপ্রকার চিত্রলিপিও আঁকা আছে। কিন্তু এযাবৎ এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য : মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি

সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়াই জীবনধারণ করিত। কৃষি ও পশুপালন প্রধান উপজীবিকা হইলেও মৃৎপাত্র-নির্মাণশিল্প, বয়নশিল্প, ভাস্কর্য, ধাতুশিল্প প্রভৃতিও জীবিকার্জনের বিভিন্ন বৃত্তি ছিল। কুকুর, হাতী, গণ্ডার, ভেড়া, হরিণ, মহিষ, ষাঁড় প্রভৃতির প্রতিকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে, এগুলির মধ্যে অন্তত কতকগুলি তাহাদের গৃহপালিত ছিল।

ব্যবসায়-বাণিজ্য

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সিন্ধু-সভ্যতা যুগের লোকেরা পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। ভারতবর্ষের অপরাপর অংশ ভিন্ন আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, বেলুচিস্তান, পারস্য প্রভৃতি দেশের সহিতও তাহাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ইহা ভিন্ন, মেসোপটেমিয়ার সহিতও যে তাহাদের যোগাযোগ ছিল সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। জলপথে এবং স্থলপথে বাণিজ্য পরিচালিত হইত। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার দুইটি সীলমোহরে নৌকার চিত্র দেখিয়া মনে হয় নৌচালনাও তাহাদের অজানা ছিল না।

ধর্ম

সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা এক যোগী-পুরুষের পূজা করিত। এই যোগী-পুরুষের মস্তকে তিনটি শৃঙ্গ এবং তাঁহার চতুর্দিকে পশুর ছবি অঙ্কিত আছে। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে, তাঁহাকে পশুপতি

---

* Vide Wheeler: *The Indus Civilization* (*The Cambridge History of India*, Supplementary Volume), pp. 52-53.

শিবের আদি-সংস্করণ বলিয়া মনে করা ভুল হইবে না।*) ইহা ভিন্ন, এক মাতৃমূর্তির—সম্ভবত মহাদেবীর পূজাও সে-যুগে প্রচলিত ছিল।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সিন্ধু-সভ্যতা যে অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

(সিন্ধু-সভ্যতার চিহ্নাদি আবিষ্কারের ফলে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে বৈদিক যুগের পূর্বেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল একথা বুঝিতে পারা গিয়াছে। পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা বা আর্য সভ্যতা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক একথা প্রমাণ করিয়াছে। বস্তুত, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা এই উভয়ের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম একথাও সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে। স্যার জন্ মার্শাল প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে সিন্ধু-সভ্যতা কোন কোন বিষয়ে সমসাময়িক মিশরীয় বা আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় সভ্যতা হইতেও শ্রেষ্ঠতর ছিল।)

সিন্ধু-সভ্যতার গুরুত্ব

(সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের আনুমানিক কারণও কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন।) সিন্ধু-সভ্যতা যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একাধিকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। (বৈদিক যুগের প্রারম্ভে—অর্থাৎ মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টপূর্ব দুই সহস্র অব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে সিন্ধু-সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্লাবন, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই সাধারণত অনুমিত হইয়া থাকে।) মাটির নীচ হইতে যে ধরনের মৃতদেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে কোন আকস্মিক কারণে সিন্ধু-সভ্যতার এক বিরাট অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। (রন্ধনশালা, রাস্তাঘাট, স্নানাগার প্রভৃতি স্থানে মৃতদেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। সেইজন্য ভূমিকম্পই যে এই আকস্মিক কারণ ছিল তাহা অনুমান করা ভুল হইবে না।) (মেসোপটেমিয়া হইতে আগত বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, আর্যদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিও সিন্ধু-সভ্যতা বিনাশের কারণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।) কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিন্ধু-সভ্যতা বিনাশের প্রকৃত কারণ এখনও জানা সম্ভব হয় নাই। উপরি-উক্ত কারণসমূহ সম্পূর্ণ আনুমানিক।

সিন্ধু-সভ্যতা বিনাশের আনুমানিক কারণ

আর্যদের আগমন (Coming of the Aryans): আর্যগণ প্রথমে কোন্ দেশে বাস করিত সে-সম্পর্কে নানা প্রকার মতভেদ আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতবর্ষ আর্যদের মূল বাসস্থান ছিল। কিন্তু আধুনিক

---

* "It is very interesting to note how this figure corresponds with, and to a certain extent explains, the later conception of Siva ... ." *An Advance History of India* (3rd Edn., 1967), p. 20.

ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের অধিকাংশের মতে আর্যগণ ভারতের বাহির হইতে এদেশে আসিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে আর্যদের বাসস্থান ছিল এশিয়া-মাইনরের ক্যাপাডোসিয়া (Cappadocia) অঞ্চলে। এই মতের বিরুদ্ধেও নানা যুক্তি দেখানো হইয়াছে। এইভাবে আর্যদের মূল বাসস্থান ভিস্টুলা নদীর তীরে, জার্মানিতে বা লিথুয়ানিয়ায় ছিল বলিয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকের, বিশেষত ব্র্যাণ্ডেনষ্টিনের মতে, আর্যগণ প্রথমে আরল বা উরাল সাগরের দক্ষিণ তীরে বাস করিত। সেখান হইতে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাহাদের এক শাখা পারস্য ও ভারতবর্ষের দিকে এবং অপর এক শাখা ইওরোপের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আর্যদের যে শাখা প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল উহার একাংশ ইরাণ এবং অপরাংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে মতভেদ

ব্র্যাণ্ডেনষ্টিনের মত

আর্য বসতি : আর্য সভ্যতা : ভারতীয় আর্যদের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদে তাহাদের বাসস্থানের পরিবেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং বিভিন্ন নদ-নদীর নামের উল্লেখ আছে। এগুলি হইতে ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অঞ্চলে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। শতদ্রু, বিপাশা, ঝিলাম, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা—পাঞ্জাবের পঞ্চ নদী এবং সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা-যমুনা, সরযূ প্রভৃতি নদ-নদীর অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া আর্যগণ বসতি বিস্তার করিয়াছিল। ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'সপ্তসিন্ধব' নামক দেশ পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী এবং সিন্ধু ও সরস্বতী, মোট এই সাতটি নদীর অববাহিকা অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল, একথা আধুনিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ মনে করেন। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্যগণ বাংলাদেশ, আসাম বা দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে নাই বলিয়াই মনে করা হইয়া থাকে, কারণ ঋগ্বেদে এই সকল অঞ্চলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এই সকল অঞ্চলে বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল।

ভারতে আর্যদের বসতি বিস্তার—'সপ্তসিন্ধব'

দাক্ষিণাত্য, বাংলাদেশ ও আসামে পরবর্তী কালে আর্য বসতি-বিস্তৃতি

বৈদিক সাহিত্য : চারি বেদ : পৃথিবীর কোন অংশের আর্যগণই ভারতীয় আর্যদের ন্যায় এত সুদূর অতীতে ঋগ্বেদের মত গ্রন্থ রচনা করিবার প্রতিভা প্রদর্শন করেন নাই। ভারতীয় আর্যঋষিগণ চারিখানি গ্রন্থ বা চতুর্বেদ—যথা, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—রচনা করিয়া তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন।

চতুর্বেদ : ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব

'বিদ্'—অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই 'বেদ' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চারিখানি বেদে জ্ঞানেরই প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। আর্যগণ তথা পরবর্তী কালের হিন্দুমাত্রেই 'বেদ' ভগবানের

'বেদ' অর্থ 'জ্ঞান'—বেদ অপৌরুষেয়

মুখ-নিঃসৃত বাণী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এজন্য বেদমাত্রেই অপৌরুষেয় এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া বেদের জ্ঞান লাভ করা হইয়াছিল বলিয়া বেদকে 'শ্রুতি' বলা হইয়া থাকে।

বিভিন্ন বেদের বিষয়বস্তু

বেদগুলির মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বপ্রথমে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে সহস্রাধিক স্তোত্রে প্রকৃতির স্তুতিগান করা হইয়াছে। সামবেদ ঋগ্বেদের শ্লোকগুলির উপর নির্ভর করিয়া রচিত। সামবেদের স্তোত্রগুলি যাগ-যজ্ঞের কালে গানের ন্যায় সুর করিয়া গীত হইত। এইজন্য সামবেদ 'সামগান' নামেও পরিচিত। যজুর্বেদে যাগ-যজ্ঞের মন্ত্র-তন্ত্র, অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনা প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট আছে। সর্বশেষ বেদ—অর্থাৎ অথর্ববেদে কতকগুলি রহস্যজনক সাঙ্কেতিক চিহ্ন, চিকিৎসার মন্ত্র, পৃথিবী-স্তব, সৃষ্টি-রহস্য প্রভৃতি বর্ণিত আছে। বেদের চারিটি করিয়া অংশ আছে—যথা, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্।

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ বা বেদান্ত

যাগ-যজ্ঞের মন্ত্র-তন্ত্র সংহিতায় সন্নিবিষ্ট আছে। এই অংশটি পদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ অংশে পূজা-পার্বণ ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি গদ্যে লিপিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণ অংশ প্রধানত গদ্যে লিখিত হইলেও কতক পদ্যও ইহাতে আছে। পরবর্তী কালে সন্ন্যাস ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে চলিয়া যাইতেন তাঁহাদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম জটিল যাগ-যজ্ঞ রীতি প্রবর্তন করিয়া 'আরণ্যকে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সকল আরণ্যকের উপর গভীর চিন্তার ফলে যে দার্শনিক জ্ঞান জন্মিয়াছিল উহাই 'উপনিষদ্' বা 'বেদান্ত' নামে পরিচিত। বৈদিক গ্রন্থাদির 'অন্তে'—অর্থাৎ শেষে রচিত হইয়াছিল বলিয়া উপনিষদ্ 'বেদান্ত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

সূত্র-সাহিত্য
ছয় বেদাঙ্গ, ছয় দর্শন (ষড়দর্শন)

পরবর্তী কালে বেদ হইতে আরও নানা প্রকার ধর্মগ্রন্থের উৎপত্তি ঘটে। এগুলি সূত্র-সাহিত্য নামে পরিচিত। সূত্র-সাহিত্য আবার ছয়টি বেদাঙ্গ ও ছয়টি দর্শনে বিভক্ত।

অপরাপর গ্রন্থ

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আর্যদের সাহিত্য—অর্থাৎ চতুর্বেদকে নির্ভর করিয়া যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য ঋষিগণ আয়ুর্বেদশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র—অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি, সঙ্গীতশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, চারুশিল্প, কারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ের উপর গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন।

বৈদিক আর্যদের মনীষার অভিব্যক্তি

বৈদিক যুগের আর্য ঋষিগণ ভারতীয় মনীষার যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজও আমাদিগকে বিস্মিত করে।

আর্যদের সমাজ ও ধর্ম: আর্যগণ বিনা বাধায় ভারতবর্ষে বসতি বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। অনার্যদের সহিত সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই আর্যগণ প্রথমে ভারতে বসতি বিস্তার করে।

বর্ণবিভাগ—আর্য ও অনার্য

আর্যদের মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে বসতি বিস্তার করিলেও শেষ পর্যন্ত আর্য ও ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। ফলে সমাজে আর্য ও অনার্য দুই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। আর্যগণ ছিল

দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি, প্রশস্ত ললাট এবং উন্নত নাসিকাযুক্ত। পক্ষান্তরে অনার্যগণ ছিল কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি এবং তাহাদের নাসিকা ছিল অনুন্নত। এই দুই শ্রেণীর লোকের বর্ণ—অর্থাৎ রঙের ভিত্তিতেই সর্বপ্রথম আর্য ও অনার্য বর্ণবিভাগ হইয়াছিল।

কিন্তু ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংগঠনকে অধিকতর সুষ্ঠু করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হইল। তখন বৃত্তি ও ক্ষমতা—অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজকে চারি ভাগে ভাগ করা হইল। আধ্যাত্মিক কার্যাদি, জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতিতে যাঁহারা উৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ; দেশরক্ষা, শিকার প্রভৃতি কার্যে পারদর্শী শ্রেণী ক্ষত্রিয়; বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাদিতে পারদর্শী ব্যক্তিগণ বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইলেন। সমাজের উপর তিন শ্রেণীর—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের যাহারা সেবা করিত তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল। এইভাবে বৃত্তির ভিত্তিতে আর্য ও অনার্যগণ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, সমাজের অধস্তন শূদ্রশ্রেণীতে স্থান হইল অনার্যদের। কিন্তু বৃত্তি অনুসারে চারিটি পৃথক শ্রেণী বিভক্ত হইলেও এগুলির মধ্যে কোনপ্রকার জাতিভেদ ছিল না বা সামাজিক আচার-আচরণে কোন ভেদাভেদ করা হইত না। এই সকল জাতির মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ক্রমেই দেখা দিল শ্রেণীগত সঙ্কীর্ণতা। বৈদিক যুগের শেষভাগে এই সকল শ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদ এবং বিবাহ ব্যাপারে রক্ষণশীলতা দেখা দিতে লাগিল।

গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

জাতিভেদহীন সমাজ

পরবর্তী কালে জাতিভেদের কঠোরতার উদ্ভব

আর্য সমাজের মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে 'কর্তা' বলা হইত। পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা রক্ষা করা ছিল তাঁহার দায়িত্ব। পরিবারের ব্যক্তিবর্গের উপর তাঁহার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল। বৈদিক আর্যগণের সামাজিক জীবন ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। সততা, ধর্মপরায়ণতা, পরস্পর শ্রদ্ধা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছিল সমাজের কতকগুলি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য।

পরিবার ও পারিবারিক আদর্শ

আর্যদের সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল 'চতুরাশ্রম'। সমাজের উর্ধ্বতন তিন শ্রেণী—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগকে বাল্যকালে উপবীত ধারণের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইত। জীবনের এই পর্যায়কে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বলা হইত। গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর জীবনের সুখ-দুঃখের অংশগ্রহণ করিয়া গুরুর ন্যায় নির্লোভ, সরল ও ন্যায়পরায়ণ জীবনের আদর্শে চরিত্র গঠন করিতে হইত। শাস্ত্রশিক্ষা শেষ হইলে শুরু হইত জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়—গার্হস্থ্যাশ্রম। বিবাহাদি করিয়া পরমব্রহ্মের কথা স্মরণ রাখিয়া জীবন যাপন করাই ছিল এই আশ্রমের কর্তব্য। প্রৌঢ় বয়সে বানপ্রস্থ গ্রহণ করিতে হইত—অর্থাৎ সাংসারিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্ত্রীকে পুত্রের

চতুরাশ্রম :

(১) ব্রহ্মচর্য

(২) গার্হস্থ্য

নিকট রাখিয়া অথবা সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিতে হইত। সেখানে কুটির বাঁধিয়া ধর্মাচরণের মাধ্যমে পরবর্তী আশ্রম—অর্থাৎ সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত।* চতুর্থ এবং শেষ পর্যায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় অরণ্যে জপ-তপে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে হইত। এইভাবে আর্যদের সমগ্র জীবনটাই যেন একটি মূর্ত ধর্মস্বরূপ ছিল।

(৩) বানপ্রস্থ

(৪) সন্ন্যাস

আর্য সমাজে নারীজাতি উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহারা পারিবারিক জীবনে যেমন পুরুষদের সহধর্মিণী ছিলেন তেমনি পরিবারের বাহিরেও তাঁহারা পুরুষদের সাহায্য-সহায়তা দান করিতেন। জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর কাজ তাঁহারা করিতেন এবং উদ্বৃত্ত সময়ে স্বামীর সহিত ধর্মকর্মেও অংশগ্রহণ করিতেন। সে-যুগে কয়েকজন আর্যনারী শাস্ত্রালোচনা ও মন্ত্রাদি রচনায় অনন্যসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অপলা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্যনারীর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

আর্য সমাজে নারীর স্থান

অপলা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, গার্গী ও মৈত্রেয়ী

আর্য সমাজ সম্পূর্ণভাবে ধর্মভিত্তিক ছিল, একথার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। এই ধর্ম ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উপাসনা। ভারতীয় সভ্যতা তপোবনের সভ্যতা। স্বভাবতই এই সভ্যতায় ধর্ম বলিতে প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা বুঝাইত। প্রাকৃতিক প্রভাব বৈদিক আর্যদের সমাজ-জীবন, সাহিত্য, আচার-আচরণ, ধর্ম সবকিছুকেই প্রভাবিত করিয়াছিল। আর্যগণ প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশ—যথা, আকাশের দেবতা দ্যৌ, জলের দেবতা বরুণ, আলোকের দেবতা সূর্য, বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, বাতাসের দেবতা মরুৎ, উষা, সরস্বতী প্রভৃতির উপাসনা করিত। প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠ, যজ্ঞ এবং আরও নানা প্রকার জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করিতে হইত। মূলত আর্যদের মধ্যে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের ফলে ধর্ম-বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার ফলে মূর্তিপূজা, পশুবলি প্রভৃতি অনার্যদের ক্রিয়াকলাপও ক্রমে আর্যদের উপাসনা-পদ্ধতিতে স্থানলাভ করিয়াছিল।

প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে উপাসনা—দ্যৌ, বরুণ, সূর্য, ইন্দ্র, মরুৎ, উষা, সরস্বতী প্রভৃতি

আর্যদের অর্থ নৈতিক জীবন: আর্যদের অর্থ নৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। গরুর সাহায্যে লাঙ্গল টানানো হইত, এজন্য কৃষির সঙ্গে সঙ্গে গো-পালন অপরিহার্য ছিল। ইহা ভিন্ন ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পশুপালন করিয়াও অনেকে জীবিকার্জন করিত। বৈদিক যুগের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল গ্রাম।

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য

* মনুসংহিতা
গরুড়পুরাণে বানপ্রস্থ-আশ্রম স্বগৃহে থাকিয়া সংসারের দায়িত্বমুক্তভাবে জীবন যাপন করিয়া পরবর্তী জীবনের—অর্থাৎ সন্ন্যাস-আশ্রমের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উল্লেখ আছে। গরুড়পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। প্রতি গ্রামেই জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত। বৈদিক যুগে শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সূতী ও পশমের বস্ত্রাদি, মাটির পাত্র, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্র, কাঠের নানা প্রকার আসবাবপত্র প্রস্তুত করা হইত। নৌ-চালনা, গৃহনির্মাণ, কৃষির জন্য সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সে-যুগে জানা ছিল। বিদেশের সহিত বৈদিক আর্যদের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল এইরূপ মনে করা ভুল হইবে না। বৈদিক আর্যগণ সামুদ্রিক বাণিজ্যেও অংশগ্রহণ করিত।* বৈদিক যুগে 'মনা' নামে এক প্রকার মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। সেই সময়ে ব্যাবিলনে 'মানা' নামে একপ্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৈদিক যুগের 'মনা' ব্যাবিলনের 'মানা' এবং ল্যাটিন 'মিনা'র অনুকরণ বলা যাইতে পারে। এইরূপ সামঞ্জস্য হইতে বহির্জগতের সহিত বৈদিক আর্যদের যোগাযোগ ছিল একথা অনুমিত হইয়া থাকে। 'মনা' ভিন্ন 'নিষ্ক' নামক অপর একপ্রকার মুদ্রা এবং গরু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বলি, শুল্ক ও ভাগ—এই তিন প্রকারের রাজস্ব সে-যুগে আদায় করা হইত।

শিল্প : বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, গৃহনির্মাণ-শিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতি

'মনা', 'নিষ্ক' ও গরু বিনিময়ের মাধ্যম

রাজস্ব : বলি, শুল্ক ও ভাগ

আর্যদের আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ হইতে তাহাদের উন্নত অর্থনৈতিক জীবনের ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। যব, গম প্রভৃতি ছিল সে-যুগের প্রধান খাদ্যশস্য। ইহা ভিন্ন, মাছ, মাংস, শাকসবজি প্রভৃতিও তাহারা খাইত। অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞাদির সময় তাহারা সোমরস ও সুরা নামক মাদক পানীয় ব্যবহার করিত। গরুর দুধ ও দুধ হইতে প্রস্তুত নানা প্রকার খাদ্য, পিষ্টক প্রভৃতি তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল।

আর্যদের আহার্য—যব, গম, মাছ, মাংস, শাকসবজি ; পানীয়—সোমরস ও সুরা

পোশাক-পরিচ্ছদের দিক দিয়া আর্যদের কোন আড়ম্বর ছিল না। দেহের উপরাংশের জন্য 'উত্তরীয়' ব্যবহৃত হইত। নিম্নাংশের জন্য 'নিবি'—অর্থাৎ কৌপীনের মত একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহাকে 'অন্তর্বাস' বলা হইত। 'নিবি'র উপরে 'বাস' বা 'পরিধান'—অর্থাৎ একখানা বস্ত্র ব্যবহার করা হইত। ইহাকে 'বহির্বাস'ও বলা হইত। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অলঙ্কার ব্যবহারের রীতি ছিল। অবশ্য কোন কোন প্রকার অলঙ্কার কেবল আর্যনারীগণই ব্যবহার করিতেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি

আর্যদের রাজনৈতিক জীবন : বৈদিক যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনা হইতে একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সে-যুগে সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। সামাজিক নিরাপত্তা এবং শান্তি বজায় না থাকিলে ঐরূপ উন্নত ধরনের সামাজিক বা অর্থনৈতিক জীবন যে গড়িয়া উঠিত না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরই

সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচায়ক

* Vide *The Vedic Age*, pp. 397, 461.

সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, আর্যদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুদক্ষ ও সুশৃঙ্খল ছিল।

আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হিসাবে বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকার্য প্রথমে দলপতির উপর ন্যস্ত ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা বসতি বিস্তারের ফলে দলপতিগণের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ক্রমে স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা ও শান্তি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে দলপতির আদেশ মানিয়া চলিবার প্রয়োজনীয়তাও সমাজের জনগণ উপলব্ধি করিয়াছিল। এইভাবে ক্রমে দলপতি 'রাজা' বা 'রাজন্' নামে পরিচিত হন। রাজা সমগ্র রাজ্যের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন। আইনত তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসীম, কিন্তু কার্যত তাঁহাকে 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুইটি পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। রাজ্যের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধদের লইয়া 'সভা' গঠিত হইত। জনগণের পরিষদের নাম ছিল 'সমিতি'। রাজ্যশাসনে রাজা এই দুইটি পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। রাজ্যকে 'জন' বা 'বিশ' বলা হইত এবং রাজাকে 'বিশপতি' বা 'রাজন্' নামে অভিহিত করা হইত। রাজ্যের ভিত্তি ছিল গ্রাম। সমগ্র রাজ্যটি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামের শাসনকার্যাদি পরিচালনার ভার ছিল 'গ্রামণী'র উপর। রাজকর্মচারীদের মধ্যে 'পুরোহিত', 'সেনানী' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজার সেনাবাহিনীতে অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। তরবারি, কুঠার, তীর-ধনুক, বর্শা প্রভৃতি ছিল সে-যুগের যুদ্ধাস্ত্র।

রাজপদের উৎপত্তি

'রাজন্'—'সভা' ও 'সমিতি'

বিশ

গ্রাম—'গ্রামণী'

রাজকর্মচারিগণ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি লাগিয়াই থাকিত। ফলে দুর্বল রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজ্যগুলি কর্তৃক অধিকৃত হইতে থাকে। এইভাবে বৈদিক যুগের শেষভাগে বড় বড় রাজ্যের যেমন উদ্ভব ঘটিয়াছিল তেমনি রাজ-ক্ষমতাও স্বৈরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল রাজা দিগ্বিজয়ে সাফল্যলাভ করিয়া 'অশ্বমেধ', 'রাজসূয়', 'রাজপেয়' প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি করিতেন এবং 'সম্রাট', 'একরাট', 'রাজচক্রবর্তী' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া নিজ নিজ বর্ধিত ক্ষমতার পরিচয় দিতেন।

'সম্রাট', 'একরাট', 'রাজচক্রবর্তী'

বৈদিক যুগের শেষভাগকেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বলা হয়। বস্তুত, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বলিয়া কোন পৃথক যুগের উল্লেখ করিবার কোন যুক্তি নাই, কারণ রামায়ণ-মহাভারতের কাল বৈদিক যুগেরই অংশবিশেষ।

বৈদিক যুগের শেষভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

(Jainism and Buddhism)

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (Reaction against Brahmanism) : বৈদিক যুগের শেষভাগে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অত্যন্ত গতানুগতিক হইয়া পড়ে। কতকগুলি জটিল, সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য ক্রিয়াকাণ্ড ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্মকর্ম সম্পন্ন হইল, এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। আন্তরিক ভক্তি, সততা ও ধর্মপরায়ণতা অপেক্ষা বাহিক আচার-অনুষ্ঠান, হোম, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে। এই জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনে সাধারণ লোক স্বভাবতই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিল। এই বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন পুরোহিতশ্রেণী। এই সুযোগে পুরোহিত-শ্রেণী সমাজের উপর এক প্রবল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি, পুরোহিতশ্রেণীর প্রতি অচলা ভক্তি প্রভৃতি সেই যুগের ধর্মরীতি হিসাবে যেমন প্রচলিত হইল তেমনি নিম্ন-শ্রেণীর লোকদের প্রতি ঘৃণা, অন্যায় আচরণ প্রভৃতিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এরূপ আন্তরিকতাশূন্য জনকল্যাণের আদর্শচ্যুত ধর্মের প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মনে ক্রমেই বিরুদ্ধভাব জাগিতে লাগিল। সহজ, সরল এবং সাধারণের বোধ-গম্য ধর্ম-পন্থা উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন তখন অনুভূত হইতে লাগিল। উপনিষদের স্বাধীন চিন্তাধারার উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম-বিষয়ে নূতন এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করা আরম্ভ হইল। ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে বহু ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটিল। ইঁহাদের মধ্যে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জটিলতা

পুরোহিতশ্রেণীর প্রাধান্য

বৈদিক ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধভাব

জৈনধর্ম : মহাবীর 'জিন' (Jainism : Mahavira) : মহাবীর 'জিন'-এর নামানুকরণেই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম 'জৈনধর্ম' বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু জৈন কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে মহাবীরের পূর্বে আরও তেইশ জন 'তীর্থঙ্কর'—অর্থাৎ মুক্তির পথ-নির্মাতা এই ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবীর ছিলেন চতুর্বিংশ এবং শেষ তীর্থঙ্কর। জৈনধর্মের মূল প্রবর্তক ছিলেন ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। মহাবীর জৈন ধর্মমতের কতক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং উহার বহুল প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। এজন্য সাধারণত তাঁহার নামানুকরণেই এই ধর্মমত 'জৈনধর্ম' বলিয়া পরিচিত।

তীর্থঙ্করগণ

মহাবীর ছিলেন কুন্দপুর নামক স্থানের সিদ্ধার্থ নামে এক ক্ষত্রিয় দলপতির পুত্র। তাঁহার মাতার নাম ছিল ত্রিশলা। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। মহাবীরের বাল্যজীবন সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে জৈন কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে কতক

কতক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। এই সকল কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে মহাবীর যশোদা নামে এক ক্ষত্রিয় রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গৃহীর ন্যায় জীবন যাপন করেন। তারপর—অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পরম সত্যের সন্ধানে তপস্যা শুরু করেন। গোঁসাল নামে জনৈক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর এবং স্বাধীনভাবে আরও ছয় বৎসর—মোট বার বৎসর তপশ্চরণের পরও তিনি দিব্যজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন না। একপ্রকার হতাশ হইয়াই তিনি ঋজুপালিকা নদীতীরে পুনরায় নূতনভাবে তপস্যায় রত হন। এইবার তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল।

মহাবীরের পরিচয়

গৃহত্যাগ ও তপশ্চরণ



মহাবীর

এইভাবে দীর্ঘ বার বৎসর তপশ্চর্যা করিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে দিব্যজ্ঞান লাভের পর তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তিনি সর্বজ্ঞ হইয়া—অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করিয়া তাঁহার ধর্মমত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে শুরু করেন। তিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া 'জিন'—অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় নামে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত, 'নির্গ্রন্থ'—অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি হইতে গ্রন্থিহীন (বন্ধনহীন)—নামে পরিচিত। সাধারণ্যে অবশ্য ইহা 'জিন' নামানুকরণে 'জৈন' ধর্ম নামেই পরিচিতি লাভ করিয়াছে। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল ধর্ম প্রচারের পর মহাবীর পাবাপুরীতে দেহরক্ষা করেন।*

'কৈবল্য' লাভ : 'জিন' বা জিতেন্দ্রিয়

মহাবীর জিন-প্রবর্তিত ধর্ম 'নির্গ্রন্থ' বা জৈনধর্ম নামে পরিচিত

মহাবীর জিন কোন নূতন ধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন না একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি পার্শ্বনাথ-প্রচারিত ধর্মমতের কতক পরিবর্তন করিয়া ব্যাপকভাবে উহার প্রচারের পথ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ-প্রবর্তিত ধর্মমতের মূল চারিটি সূত্র ছিল : সত্যবাদিতা, চুরি না করা, হিংসা না করা ও লোভ সম্বরণ করা। এই চারিটি সূত্রের সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করিবার

জৈনধর্মের সার

* মহাবীরের দেহত্যাগের তারিখ সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে। Vide *An Advanced History of India* (3rd Edn., 1967), p. 80.

আরও একটি নূতন সূত্র মহাবীর যোগ করিয়াছিলেন।* মহাবীরের ধর্মনীতিতে চরম অনাসক্তি পরিলক্ষিত হয়। তিনি পার্থিব কোনকিছুর প্রতি আসক্তি বা লোভ থাকা অনুচিত মনে করিতেন। এমনকি পরিধানের বস্ত্রের জন্যও যাহাতে কোনপ্রকার আসক্তি জন্মিতে না পারে সেজন্য তিনি স্বয়ং দিগম্বর ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণও দিগম্বর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর তিন শত বৎসর পর—অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তাঁহার শিষ্যগণের অনেকে 'দিগম্বর' ধর্মরীতি ত্যাগ করিয়া 'শ্বেতাম্বর' নামে জৈনধর্মেরই অপর এক শাখার সৃষ্টি করেন। অদ্যাপি জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' এই দুই সম্প্রদায় আছে। বলা বাহুল্য, 'দিগম্বর' সম্প্রদায় পরবর্তী কাল হইতেই বস্ত্রাদি পরিধান করিতে শুরু করিয়াছিল।

'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' সম্প্রদায়

আত্মার চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভই জৈনধর্মের আদর্শ। জৈনধর্মমতে 'নির্বাণ'—অর্থাৎ পুনর্জন্ম হইতে আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের তিনটি পন্থা আছে—যথা, সৎ-জ্ঞান, সৎ-কর্ম ও সৎ-ব্যবহার। জৈন ধর্মমতে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। জৈনগণ বেদকে ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলিয়া মনে করে না। জাতিভেদও তাহারা মানে না। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে জৈনরা হিন্দুদের ন্যায়ই বিশ্বাসী। অহিংসা জৈনধর্মের মূল ভিত্তি। অহিংসা-নীতি প্রয়োগে জৈনগণ পাথর, ধাতু প্রভৃতির মধ্যেও প্রাণ আছে বলিয়া মনে করে। সৎ-কর্ম ও কঠোর তপশ্চর্যার মাধ্যমে আত্মার উন্নতিসাধন এবং ক্রমে পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভই হইল জৈন ধর্মমতের উদ্দেশ্য। এই কারণে দেহকে যথাসম্ভব কঠোর শাসনে রাখা এবং কৃচ্ছ্রসাধনে কালাতিপাত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুতরাং প্রকৃতভাবে জৈনধর্ম পালন করা গৃহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একমাত্র সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের পক্ষেই এই কঠোর ধর্মরীতি পালন করা সম্ভব ছিল। পরবর্তী কালে অবশ্য জৈনধর্ম অনেকটা বাস্তববাদী হইয়া উঠে। ফলে গৃহীদের পক্ষেও উহা পালন করা সম্ভব হয়। জৈনধর্ম বলিতে বর্তমান কালে যাহা বুঝা যায় উহা মহাবীর জিন কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে বহুলাংশে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এখন গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনা জৈনধর্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে।

জৈনধর্মের আদর্শ—নির্বাণলাভ

জৈনধর্মমতে অহিংসা-নীতির ব্যাপকতা

পরবর্তী কালে জৈনধর্মের রূপান্তর

মহাবীরের মূল উপদেশাবলী চৌদ্দটি 'পূর্ব'—অর্থাৎ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাটলিপুত্র নগরীতে আহূত ধর্মসভায় জৈনধর্ম বিষয়ে যে-সকল আলোচনা হইয়াছিল সেগুলি বারটি 'অঙ্গ'—অর্থাৎ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরবর্তী কালে (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে) গুজরাটে অপর একটি জৈনধর্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভা

জৈন ধর্ম-সাহিত্য : 'পূর্ব'

পাটলিপুত্র নগরীতে ও গুজরাটে জৈনধর্মসভা

* "... he (Parsvanath) enjoined on his disciples the four great vows of non-injury, truthfulness, abstention from stealing and non-attachment. To these Mahavira added the vow of *Brahmacharya* or continence." *Ibid.*, p. 81.

অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র
জৈন কাহিনী-কিংবদন্তী
—পরিশিষ্ট পার্বণ, রাজাবলীকথে প্রভৃতি

কর্তৃক জৈন ধর্ম-সাহিত্য অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র এই চারিটি ভাগে সঙ্কলিত হইয়াছিল। জৈনধর্ম সম্পর্কে কাহিনী-কিংবদন্তী —যথা, 'পরিশিষ্ট পার্বণ', 'রাজাবলীকথে' প্রভৃতি জৈন ধর্ম-সাহিত্যের অংশ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।)

বৌদ্ধধর্ম : গৌতম বুদ্ধ (Buddhism : Gautama Buddha) : বৈদিক ধর্মের জটিলতা ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান প্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে সহজ ও সরল ধর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য যে-সকল মনীষী সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমত বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত। (নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর শাক্য জাতির নায়ক শুদ্ধোদন ছিলেন গৌতমের পিতা। তাঁহার মাতা ছিলেন মায়াদেবী। গৌতমের আদি নাম ছিল সিদ্ধার্থ। জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধার্থ মাতৃহীন হন। মাতৃস্বসা ও বিমাতা গৌতমী তাঁহাকে লালন-পালন করেন। এজন্য তাঁহার অপর নাম হয় গৌতম।)

পরিচয়



গৌতম বুদ্ধ

বাল্যকাল হইতেই গৌতম ছিলেন ধর্ম-ভাবাপন্ন। রাজপ্রাসাদের আবহাওয়ায় মানুষ হইলেও জীবের প্রতি দয়া, ধর্ম-বিষয়ে চিন্তা প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বাল্য-কাল হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই গৌতমের অন্তরের দয়া, জীবে প্রেম ও অহিংসার পরিচয় পাওয়া গেল। সেই সময়কার সামাজিক রীতি অনুসারে যোল বৎসর বয়সেই গোপা বা যশোধরা বা বিম্বা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিতা এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইল।

বাল্যজীবন

বিবাহ

ইহার পর কিছুকাল গৌতম গৃহী হিসাবেই কাটাইলেন। মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি তাঁহাকে ক্রমেই বিচলিত করিয়া তুলিল। কিভাবে মানুষকে এই দুঃখ-দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসিল। ২৯ বৎসর বয়সে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জাত হইল। পুত্রের নাম রাখা হইল রাহুল। কিন্তু পুত্র জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে গৌতম দেখিলেন যে, তিনি ক্রমেই সংসারের মায়ায় আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস সবকিছু ত্যাগ করিয়া একদিন গভীর রাত্রিতে

পুত্রসন্তান লাভ—রাহুল

গৃহত্যাগ

সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বয়স তখন ২৯ বৎসর।

সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করিয়া গৌতম দিব্যজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কঠোর তপস্যা, আত্মপীড়ন, কৃচ্ছ্রসাধন—সর্বপ্রকারের যোগসাধন করিয়া দেহকে অস্থিচর্মসার করিলেন, বহু তীর্থস্থান পর্যটন করিলেন। তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। অবশেষে তিনি উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। তাঁহার দেহ দুর্বল হইল, তাঁহার জীবনসংশয় দেখা দিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল কৃচ্ছ্রসাধন ও দেহপীড়নের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায় না; দেহ যদি সুস্থ ও স্থির না থাকিল তাহা হইলে মানসিক একাগ্রতা আসিবে কোথা হইতে? সুতরাং তিনি নৈরঞ্জনা (বর্তমানে লীলাজান) নদীর জলে স্নান করিয়া বর্তমান বোধগয়ার এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে ধ্যানে বসিলেন। জনৈক ধনবান বণিকের কন্যা সুজাতা নিজ পুত্রসন্তান জাত হইয়াছে, সেই উপলক্ষে বনদেবতার পূজা দিতে গিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে গৌতমকে দেখিয়া তাঁহাকেই দেবতা-রূপে মিষ্টান্ন নিবেদন করিলেন। গৌতম সেই মিষ্টান্ন ভোজনের পর অনাহারক্লিষ্ট দেহে শক্তিলাভ করিলে তাঁহার ধ্যানের গভীরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ঐ রাত্রিতেই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। এই দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি 'বুদ্ধ'—অর্থাৎ জ্ঞানী, 'তথাগত'—অর্থাৎ যিনি পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন—এই সকল বিভিন্ন নামে পরিচিত হন। যে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে ধ্যান করিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহা 'বোধিদ্রুম' নামে এবং সেই স্থানটি 'বোধগয়া' বা 'বুদ্ধগয়া' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

কঠোর তপস্যা

বোধগয়ায় তপস্যা

দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ

বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম সারনাথের নিকট মৃগশিখাবনে তাঁহার সর্বপ্রথম বাণী প্রচার করেন। ইহার পর দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধরিয়া বিহার ও অযোধ্যায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমবায় ও একতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বৌদ্ধ সঙ্ঘও স্থাপন করেন। আশী বৎসর বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে গৌতম বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে।

বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপন

দেহত্যাগ

গৌতম বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্ম কয়েকটি মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে মানুষের যাবতীয় দুঃখকষ্ট লোভ ও অজ্ঞতা হইতেই জন্মিয়া থাকে। অজ্ঞতা বা প্রকৃত জ্ঞানের অভাব এবং আসক্তি—অর্থাৎ পার্থিব সবকিছুর প্রতি লোভ হেতুই মানুষের আত্মার অবনতি ঘটে। এজন্য জন্ম-জন্মান্তরে তাহাকে জরা, ব্যাধি, দুঃখকষ্ট, মৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সৎ-কর্মের দ্বারা আত্মার উন্নতিসাধন করিতে পারিলে পুনর্জন্ম ও দুঃখকষ্ট ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আত্মার এই চরম শান্তি বা মুক্তিকে তিনি 'নির্বাণ' আখ্যা দিয়াছিলেন।

বৌদ্ধধর্মের মূল নীতি

বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী ধর্মপ্রবর্তক। তাঁহার ধর্মমত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ধর্ম ছিল না। সংসারধর্মী জনসাধারণের জন্যই তিনি তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অত্যধিক কঠোর তপশ্চর্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে অত্যধিক আত্মপীড়ন, তপশ্চরণ যেমন ধর্মপথে অগ্রসর হওয়ার বাধা সৃষ্টি করে তেমনি অত্যধিক ভোগবিলাসও আত্মার উন্নতির পথে বাধাদান করে। সুতরাং মধ্য-পথ* অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই কারণে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভের একটি মধ্য-পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন। এই মধ্য-পন্থা অনুসরণের আটটি রীতি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে পরিচিত। এইগুলি হইল সৎ-চিন্তা, সৎ-বাক্য, সৎ-দৃষ্টি, সৎ-শ্রম, সৎ-মনোবৃত্তি, সৎ-ব্যবহার, সৎ-জীবন ও সৎ-আদর্শ। এই 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' অনুসরণ করিলেই মানুষ আত্মার উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবে এবং ক্রমে চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভ করিতে পারিবে। 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' ভিন্ন বুদ্ধদেব আরও কতকগুলি নীতি মানিয়া চলিবার উপদেশ দিয়াছেন। এই সকল নীতি হইল: অহিংসা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য, অনাসক্তি, ঐশ্বর্য ত্যাগ, চুরি না করা, পরনিন্দা হইতে বিরত থাকা, অর্থলিপ্সা ত্যাগ করা ও পশুবলি না দেওয়া। বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ, বেদের অপৌরুষেয়তা বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। বুদ্ধদেব-স্থাপিত 'সঙ্ঘ'—অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের লইয়া গঠিত একটি সংগঠন ক্রমে বৌদ্ধধর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়। 'সূত্র-পিটক', 'বিনয়-পিটক' ও 'অভিধর্ম-পিটক' এই তিনটি অংশে বুদ্ধদেবের বাণী, উপদেশাবলী ও বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়মাবলী এবং বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়। বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কাহিনীগুলি 'জাতক' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

গৌতম বুদ্ধের বাস্তববাদিতা

মধ্য-পথ: অষ্টাঙ্গিক মার্গ

অপরাপর নীতি

বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য: ত্রিপিটক: সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম: জাতক

বৌদ্ধধর্মে কোনপ্রকার মতভেদ দেখা দিলে তাহা দূরীকরণের জন্য কয়েকবার বৌদ্ধসভা বা বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজগৃহে মহাকাশ্যপ সর্বপ্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় একশত বৎসর পর বৈশালী নগরীতে দ্বিতীয়, সম্রাট অশোক কর্তৃক পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় এবং কুষাণরাজ কণিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে (মতান্তরে জলন্ধরে) চতুর্থ ও সর্বশেষ বৌদ্ধসভা আহূত হইয়াছিল।

চারিটি বৌদ্ধসভা বা বৌদ্ধ সঙ্গীতির অনুষ্ঠান

ভারত-ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব (Importance of Jainism and Buddhism in Indian History): জৈন ও

* 'মধ্য-পথ' (Middle Path)—'মধ্যম পথ' (Middling Path) নহে। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনের মধ্যে মধ্যম যেমন ভাল-মন্দের মাঝামাঝি, সেই অর্থে গৌতম বুদ্ধের ধর্মমতকে মধ্য-পথ বা মধ্য-পন্থা বলা হয় না। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি না করিয়া ধর্ম-বিষয়ে মাঝামাঝি পথে চলাই তিনি শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে করিতেন। ইহা 'মধ্য-পথ' বা 'মধ্য-পন্থা'।

বৌদ্ধ ধর্মে সামাজিক জীবনে সরলতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল। জাতিভেদশূন্য সমাজ-ব্যবস্থা, ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণার আদর্শে ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ-জীবন গড়িয়া তোলা প্রভৃতি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতীয় সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারে জৈনধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশী, সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া জাতিভেদজনিত সঙ্কীর্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেন্‌জিৎ প্রভৃতি রাজা ; অনাথপিণ্ডদ, সারিপুত্ত, মোগ্‌গলান প্রভৃতির ন্যায় ধনবান বণিক ; আনন্দ, উপালি প্রভৃতির ন্যায় সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোক—সকলেই বুদ্ধের চক্ষে সমান ছিলেন। এই পরম ভ্রাতৃত্ব, জাতিবৈষম্যহীন ঐক্যবোধ, ক্ষমা, করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি মানবিকতার নীতিজ্ঞান প্রচার করিয়া গৌতম বুদ্ধ ভারতবাসীর জীবনাদর্শকে প্রভাবিত করিয়া গিয়াছেন। এই নীতি যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতবাসী অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। গৌতম বুদ্ধ ও সম্রাট অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী এবং বর্তমান ভারতের মূল নীতি হইল ক্ষমা, করুণা ও মৈত্রী। ভারতের ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধের বাণীর গুরুত্ব অত্যধিক, ইহা অনস্বীকার্য।

ক্ষমা, করুণা ও মৈত্রী —ভারতের জীবনাদর্শ

পঞ্চম অধ্যায়

(১) বৈদেশিক আক্রমণ

(Foreign Invasions)

ভারতের বিশাল ভূখণ্ডকে একটি মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সুবৃহৎ দেশের উর্বরতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ অতি প্রাচীন কালে যেমন আর্য জাতিকে আকৃষ্ট করিয়াছিল তেমনি পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে বহু বিদেশী আক্রমণকারী ও লুণ্ঠনকারীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। এই সকল আক্রমণকারীর অনেকে এদেশকেই স্থায়ী বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করিয়া ভারতের বিশাল মানবসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, আবার অনেকে এদেশকে শোষণ করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল।

বৈদেশিক আক্রমণের কারণ

পারসীক আক্রমণ (Persian Invasion) : খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধ রাজ্য যখন সাম্রাজ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যহীন। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন 'উত্তরাপথ' নামে অভিহিত হইত। উত্তরাপথের রাজ্যগুলির মধ্যে গন্ধার, কম্বোজ ও মদ্র ছিল অন্যতম প্রধান। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস, টেসিয়াস্ প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পারস্য সম্রাট সাইরাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮-৫৩০) গন্ধার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। গন্ধার রাজ্য জয় করিবার কালে জনৈক ভারতীয় সৈনিকের অস্ত্রাঘাতের

সাইরাস্

ফলেই শেষ পর্যন্ত সাইরাসের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া টেসিয়াস্ উল্লেখ করিয়াছেন। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির রচনায় সাইরাস্ কর্তৃক গন্ধার রাজ্য জয়ের কথার উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু নিয়ারকাস্ প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় সাইরাসের ভারত আক্রমণ বিফল হইয়াছিল। যাহা হউক,

দরায়াস্

সাইরাসের পৌত্র দরায়াসের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়। তাঁহার আমলে (খ্রীঃ পূঃ ৫২২-৪৮৬) গন্ধার ও সিন্ধু-উপত্যকা পারসীক সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এই অংশকে পারসীক সাম্রাজ্যের বিংশতিতম প্রদেশে পরিণত করা হইয়াছিল। সমগ্র

জারেক্সিস্

পারসীক সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ পারসীক সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতীয় দেশগুলি হইতে আদায় হইত। দরায়াসের পুত্র জারেক্সিসের আমলে পারসীক সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী পারসীক সম্রাট তৃতীয় দরায়াস্ আলেকজাণ্ডারের হস্তে পরাজিত হইলে (খ্রীঃ পূঃ ৩৩০) ভারতে পারসীক আধিপত্য লোপ পাইয়াছিল।

তৃতীয় দরায়াস্
পারসীক অধিকারের অবসান

গ্রীক আক্রমণ (Greek Invasion): আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ. পারসীক আক্রমণের পরবর্তী বৈদেশিক আক্রমণ গ্রীসের ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে ঘটিয়াছিল। পারস্য সম্রাটগণ কয়েক শতাব্দী পূর্বে একবার গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিলেন। আলেক-জাণ্ডার পারস্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তৃতীয় দরায়াস্কে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া (খ্রীঃ পূঃ ৩৩০) আলেকজাণ্ডার সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সেই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭) বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে রাজতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক উভয় প্রকার রাজ্যই ছিল। পুরু বা পৌরব, তক্ষশিলা, অভিসার, ক্ষুদ্রক, অস্মক, গন্ধার, সৌভূতি প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আলেকজাণ্ডারের
পারস্য জয়

উত্তর-পশ্চিম ভারতের
রাজনৈতিক অনৈক্য

গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন উত্তর-পশ্চিম ভারত তাঁহাকে স্বভাবতই প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল না। পরস্পর বিবদমান রাজ্যগুলির রাজগণ দেশরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া দূরের কথা, পূর্বাহ্লেই আক্রমণকারীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইলেন। তক্ষশিলার রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া উপঢৌকন প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। পুরু রাজ্যের (বা পৌরব রাজ্যের) রাজা পুরুর সহিত অম্ভির শত্রুতা ছিল। পুরুকে তিনি কোনপ্রকারেই পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই।

আলেকজাণ্ডারের
ভারত আক্রমণ

বিদেশী আক্রমণকারীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া এবং তাঁহাকে সাহায্যদান করিয়া অম্ভি পুরুরাজের সর্বনাশসাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক রাজা পুরু পরাধীনতা অপেক্ষা দেশরক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি ঝিলামের তীরে এককভাবে বিদেশী আক্রমণকারীর গতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। সম্মুখ সমরে পুরুকে পরাজিত করা সহজ হইবে না মনে করিয়া আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদীর অপর তীরে শিবির স্থাপন করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তারপর এক অন্ধকার রাত্রিতে গোপনে ঝিলাম নদীর গতিপথ ধরিয়া সতর মাইল দূরে এক স্থানে উহা অতিক্রম করিয়া অতর্কিতে পুরুর শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন।* পরে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছিল বুকিফালা। অতর্কিত আক্রমণ এবং পূর্বরাত্রের বারিপাতে কর্দমাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুর অশ্বারোহী তীরন্দাজগণ ও তাঁহার যুদ্ধরথগুলি আশানুরূপ যুদ্ধ করিতে পারিল না। ফলে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। পুরু শরীরের নয়টি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। এমতাবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করা সম্ভব হইল। (আলেকজাণ্ডার পুরুকে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন প্রশ্ন করিলে বীর পুরু রাজোচিত সম্মান দাবি করিলেন। আলেকজাণ্ডার পুরুর বীরত্ব ও স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় পূর্বেই পাইয়াছিলেন। একবার যুদ্ধে পরাজিত করিলেও পুরুর রাজ্য অধিকার করিয়া রাখা সহজ হইবে না একথা দূরদর্শী বীর আলেকজাণ্ডারের উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি পুরুকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। তদুপরি পার্শ্ববর্তী অপরাপর রাজ্য যাহা তিনি জয় করিয়াছিলেন সেগুলিও পুরুর রাজ্যভুক্ত করিয়া দিলেন।)

তক্ষশিলারাজ অম্ভি কর্তৃক বশ্যতা স্বীকার

বীর রাজা পুরু

ঝিলামের যুদ্ধ

পুরু-আলেকজাণ্ডার মৈত্রী



গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার

পুরুর সহিত যুদ্ধের পর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেনাবাহিনী আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। পুরুর সহিত যুদ্ধে ভারতীয়দের সামরিক দক্ষতার যে পরিচয় গ্রীকগণ পাইয়াছিল এবং মগধের সামরিক শক্তির যে সংবাদ তাহাদের নিকট পৌছিয়াছিল তাহার ফলেই গ্রীকগণ আর অগ্রসর

* Vide V. A. Smith : *Early History of India*, pp. 68-69, 82-89.

হইতে রাজী হয় নাই। বস্তুত, পুরুর সহিত যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধ-ক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় গ্রীকগণ পায় নাই। বাধ্য হইয়াই আলেকজাণ্ডার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যকে স্থলপথে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন। অপর একদলকে জলপথে প্রেরণ করিলেন। ফিরিবার পথে আলেকজাণ্ডার মালব, ক্ষুদ্রক, অর্জুনায়ন, শিবি প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক দলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ব্যাবিলনে পৌছিবার পর আলেকজাণ্ডার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই অসুস্থতার ফলে ব্যাবিলন নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩)। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। সেনাপতি সেলুকাসের অংশে সীরিয়া এবং ভারতবর্ষের বিজিত অঞ্চল পড়িয়াছিল। সেলুকাস ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

তাঁহার মৃত্যু (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩)

ম্যাসিডনের রাজা ভিন্ন ব্যাকৃট্রীয় বা বাহ্লিক দেশের গ্রীকগণও ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ব্যাকৃট্রীয় বা বাহ্লিক দেশের গ্রীকগণ, পার্থিয়া বা পহ্লব দেশের পহ্লবগণ, শকস্তান হইতে আগত শকগণ এবং সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া অঞ্চল হইতে কুষাণগণ পর পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই সকল বৈদেশিক জাতির মধ্যে কুষাণগণই ছিল সর্বাধিক ক্ষমতাশালী।

বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির আক্রমণ

ব্যাকৃট্রীয় বা বাহ্লিক গ্রীকগণ কর্তৃক ভারত আক্রমণ (Invasion of India by the Bactrian Greeks) : ব্যাকৃট্রীয়—অর্থাৎ বাহ্লিক দেশ ও পার্থিয়া বা খোরাসান সেলুকাসের উত্তরাধিকারীদের আমলে সীরিয়ার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া যায়। সীরিয়ার রাজা তৃতীয় এ্যাণ্টিয়োকোস বহু চেষ্টা করিয়াও এই দুই অঞ্চল পুনরায় নিজ অধিকারে আনিতে অকৃতকার্য হন। বাহ্লিক গ্রীক রাজা প্রথম ডায়োডটাসের অধীনে ব্যাকৃট্রীয়া সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই বংশেরই রাজা ডেমেট্রিয়স্ (Demetrios) আফগানিস্তানের একাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু-উপত্যকা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডেমেট্রিয়স্ যখন ভারতবর্ষে রাজ্যজয়ে ব্যস্ত সেই সময়ে ইউক্রেটাইডিস্ (Eukratides) ব্যাকৃট্রীয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। ডেমেট্রিয়সের মৃত্যুর পর ইউক্রেটাইডিস্ সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল নিজ অধিকারভুক্ত করেন। অল্পকাল পরে ব্যাকৃট্রীয়া পার্থিয়ান বা পহ্লব নামে এক যাযাবর জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইলে ব্যাকৃট্রীয়ার গ্রীকগণ কেবল ভারতবর্ষে তাঁহাদের বিজিত রাজ্যাংশের উপর রাজত্ব করিতে থাকেন। ঐ সময় হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ ভারতীয় রাজায় পরিণত হন। ব্যাকৃট্রীয় গ্রীক রাজগণের মধ্যে মিনাণ্ডার ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ধর্মাচার্য নাগসেনের নিকট মিনাণ্ডার বা মিলিন্দ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিনাণ্ডার পাঞ্জাবের সাকল—অর্থাৎ শিয়ালকোট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

ডেমেট্রিয়স্

ইউক্রেটাইডিস্

মিনাণ্ডার

শক-পহ্লব ও কুষাণ আক্রমণ (Scythian, i.e., Saka-Parthian and Kushan Invasions) : উত্তর-ভারতে গ্রীকগণ কর্তৃক স্থাপিত রাজ্য পরবর্তী কালে শক-পহ্লব ও কুষাণ জাতির আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়। মধ্য-এশিয়ার যাযাবর শক জাতি ইউ-চি নামে অপর এক জাতি কর্তৃক মধ্য-এশিয়া হইতে বিতাড়িত হয়। তাহারা খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক একশত বৎসর পূর্বে কাবুল নদীর উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হয়। শক জাতি কর্তৃক অধিকৃত স্থানসমূহ শকস্তান (বর্তমানে শিস্তান) নামে পরিচিতি লাভ করে। কালক্রমে শকগণ সিন্ধু-উপত্যকা ও পশ্চিম-ভারতে অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশের শকদের মধ্যে প্রথম পরাক্রমশালী রাজা হিসাবে মোয়েস্ বা মোগের নাম পাওয়া যায়। তিনি পশ্চিম-ভারতে এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। পুষ্করাবতী, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া মোগ রাজাধিরাজ উপাধি ধারণপূর্বক রাজত্ব করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজগণ ছিলেন অয় বা অজেস্, অজিলিস্ ও দ্বিতীয় অয়।

শক আক্রমণ : মোয়েস বা মোগ, অয়, অজিলিস্

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শকরাজগণ ক্ষহরত ও কার্দমক এই দুই শাখায় বিভক্ত ছিলেন। ক্ষহরত শাখার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নহপান। কার্দমক শাখার শকরাজগণ উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে চস্টন ও রুদ্রদামন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পহ্লবগণ হিরাট, কান্দাহার প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পহ্লবগণ গন্ধারের একাংশ শক অধিকার হইতে জয় করিয়া লইয়াছিল। ক্রমে পহ্লবগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাব অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। পহ্লবরাজগণের মধ্যে গণ্ডোফার্নিস্ (Gondophernes) ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রমশালী। তাঁহারই আমলে খ্রীষ্ট ধর্মযাজক সেণ্ট্ টমাস (St. Thomas) তাঁহার রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কুষাণবংশের হস্তে পহ্লব শাসনের অবসান ঘটে।

পহ্লব আক্রমণ : গণ্ডোফার্নিস্

চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রাচীন কালে ইউ-চি (Yue-chi) নামক এক খর্ব যাযাবর জাতি বাস করিত। হিউং-নু নামে অপর এক জাতির লোক তাহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করে (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক)। ইউ-চি জাতি নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া, শেষ পর্যন্ত সিরদরিয়া নদীর এবং পরে অক্ষু নদীর (আমুদরিয়া) অববাহিকা অঞ্চলে আসিয়া বসতি বিস্তার করে। এখানে বসবাসকালে তাহারা পাঁচটি অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল শাখার মধ্যে কুষাণগণই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং তাহারা ইউ-চি জাতির পাঁচটি শাখাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

কুষাণ আক্রমণ

কুষাণ শাখার মধ্যে সর্বপ্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন কুজল-কারা কদ্‌ফিসিস্ (প্রথম)। ইনি প্রথম কদ্‌ফিসিস্ নামেই সমধিক পরিচিত। প্রথম কদ্‌ফিসিস্ পারস্যের সীমা হইতে সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত কুষাণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

কুষাণরাজগণ : কুজল-কারা কদ্‌ফিসিস (প্রথম)

পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বা বীম কদ্‌ফিসিসের আমলে কুষাণ রাজ্য গন্ধার অঞ্চল হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মালব ও পশ্চিম-ভারতের শক ক্ষত্রপগণ দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌কে তাঁহাদের অধিরাজ হিসাবে স্বীকার করিয়াছিলেন।

কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণকাল এবং দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিসের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি ছিল সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই।

কণিষ্ক

কণিষ্ক কুষাণ রাজ্যের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য খোটান ও খোরাসান হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার ও কোঙ্কণ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। কাবুল, পাঞ্জাব, বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, মালব, রাজপুতানা, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল।

হূণ নেতা তোরমান ও মিহিরগুলের ভারত আক্রমণ

হূণ আক্রমণ (Huna Invasion) : খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে উত্তর-পশ্চিম চীনের ইউ-চি জাতিকে বিতাড়িত করিয়া হূণগণ পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তাহাদের এক শাখা ইওরোপে ও অপর শাখা অক্ষু নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে। হূণদের এই শাখাই গুপ্ত বংশের রাজা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে হূণ নেতা তোরমান ও মিহিরগুল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ জয় করিয়া প্রায় মালব পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুপ্ত সম্রাট ভানুগুপ্ত তাঁহাদের এই অগ্রগতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। গুপ্ত সম্রাট বলাদিত্য মধ্যভারত হইতে হূণ আধিপত্যের অবসান ঘটান। মিহিরগুল পুনরায় বিজয় অভিযানে অগ্রসর হইলে মালবরাজ যশোধর্মন তাঁহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তথাপি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মালবের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হূণ দল তাহাদের নেতাদের অধীনে স্বাধীনভাবে বসবাস করিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

(২) ভারত কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার ধরন

(Nature of Resistance to Foreign Invasions)

বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তির মূল উৎস

বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি দেশবাসীর একতা, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প এবং দেশের সামরিক শক্তি ও কৌশলের উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে আক্রমণকারীর সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, দেশজয়ের গৌরবলিপ্সা, সম্পত্তি লাভের উন্মাদনা, বসতি বিস্তারের অথবা নিছক লুণ্ঠনের মনোবৃত্তি আক্রমণকারীকে আক্রান্ত দেশের অধিবাসীদের তুলনায় অধিকতর দুর্ধর্ষ করিয়া তোলে। বিভিন্ন সময়তরঙ্গে যখন

বিভিন্ন বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল সেই সময়ে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে তাহাদের সাফল্য এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে।

আর্য জাতির ভারত আক্রমণ হইতে শুরু করিয়া ইওরোপীয়দের ভারত আগমনের পূর্বাবধি বহিরাগত সকল জাতি ও আক্রমণকারীই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। তিন দিক সমুদ্র পরিবেষ্টিত এবং উত্তর সীমান্ত হিমালয় পর্বতমালায় সুরক্ষিত ভারতে স্থলপথে প্রবেশ করিবার একমাত্র সহজ উপায়ই ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিবর্ত্ম। অথচ এই অঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য প্রাচীন কালে বিদ্যমান না থাকিবার ফলে এবং বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার কোন সুচিন্তিত পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টার অভাব হেতু আক্রমণকারীদিগকে এই পথে ভারতে প্রবেশ করিবার সুযোগ দিয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে বৈদেশিক আক্রমণের সুযোগ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারসীক আক্রমণের কালে উত্তর-পশ্চিম ভারত উত্তরাপথ নামে অভিহিত হইত। সেই সময়ে ঐ অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে গন্ধার, কম্বোজ, মদ্র প্রভৃতি ছিল অন্যতম প্রধান। কিন্তু এই সকল রাজ্যের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ এগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্বুদ্ধ করে নাই। ব্যক্তিগত সাহস, জীবন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন প্রভৃতিতে ভারতীয় সৈনিক পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। গন্ধার রাজ্য আক্রমণকালে জনৈক ভারতীয় সৈনিকের অস্ত্রাঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত পারসীক সম্রাট সাইরাসের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কিন্তু সংঘবদ্ধতার অভাব, সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতা, সর্বোপরি সমরকৌশলের অপকৃষ্টতা ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাগণের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।

পারসীক আক্রমণের সাফল্যের কারণ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবদমান উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজাগণ ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশরক্ষার চেষ্টা করা দূরের কথা, গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে নিজ নিজ স্বাধীনতা উপঢৌকন দিয়া এবং বিদেশী আক্রমণকারীকে সামরিক সাহায্যদান করিয়া অথবা রসদ যোগাইয়া নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সময়ে পৌরব রাজ্যের রাজা পুরু এককভাবে দেশরক্ষার জন্য আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাস্পৃহার এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কেবল নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার মত দৃঢ়তা ও মর্যাদাবোধ প্রদর্শন করিয়া পুরুরাজ ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। রাজা পুরু ভিন্ন মালব, ক্ষুদ্রক, অর্জুনায়ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক দেশও নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষার্থ আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করিতে ত্রুটি করে নাই। তক্ষশিলার রাজা অম্ভির নীচ স্বার্থপরতার পার্শ্বে পুরুরাজ ও প্রজাতান্ত্রিক দেশগুলির দেশাত্মবোধ তাঁহাদিগকে ভারতবাসীর শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ভারতীয়দের চেষ্টা

রাজনৈতিক ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিজ্ঞা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিতে যে সমর্থ হয় তাহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে। চাণক্য নামক তক্ষশিলার জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সমরকৌশল ও রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষালাভের পর চন্দ্রগুপ্ত দুর্বল অথচ অত্যাচারী নন্দবংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারের বিজিত রাজ্যের গ্রীক শাসনকর্তাদিগকে পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চল বিদেশী শাসনমুক্ত করেন। এদিকে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস সীরিয়া ও ভারতে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিজিত রাজ্যের সর্বেসর্বা হন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের অধিকার হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অভিযানে অগ্রসর হন। কিন্তু এইবার তাঁহাকে এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের সম্মুখীন হইতে হয়। তিনি চন্দ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত হইয়া কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট নামক চারিটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে দান করিতে এবং তাঁহার সহিত এক বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। দেশরক্ষার তথা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ঐক্য ও দেশাত্মবোধ যে প্রধান উপায় তাহা সেলুকাসের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভে প্রমাণিত হইয়াছিল।

সেলুকাসের আক্রমণ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক প্রতিহত

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা ও দুর্বলতার সুযোগে বাহ্লিক বা ব্যাকট্রীয় (Bactrian) গ্রীকগণ, পার্থিয়া (Parthians) বা পহ্লবদেশের পহ্লবগণ, শকস্তান হইতে শকগণ এবং সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া অঞ্চল হইতে আগত কুষাণগণ পর পর ভারত আক্রমণ করে। এই সকল বিভিন্ন জাতির আক্রমণকালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও দুর্বলতা আক্রমণকারীদের সাফল্যের জন্য দায়ী ছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক দুর্বলতার কালেও স্বাধীনচেতা রাজাগণের দেশাত্মবোধ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য জীবনমরণ সংগ্রামের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। সাতবাহন বংশের গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে মালব ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলের শকগণকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজ্যের অপহৃত অংশ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতার কালে বৈদেশিক আক্রমণ: গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর বিজয়

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য বহিরাগত জাতিকে ভারত আক্রমণের যেমন সুযোগ দান করিয়াছিল তেমনি তাহাদিগকে ভারতের কতকাংশ, এমনকি কুষাণ আমলে এক বিশাল অংশ জয় করিয়া এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প ও দেশরক্ষার অঙ্গীকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজাগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু পুরুরাজ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর ন্যায় স্বাধীনচেতা, দেশাত্মবোধসম্পন্ন নৃপতির অভাবও সেই যুগে ছিল না।

উপসংহার

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব (Impact of Foreign Inroads on the Social and Cultural Life): আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বে সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে যে সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল উহা ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। সেই যুগের সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা দ্রাবিড় জাতির লোক ছিল বলিয়া মনে করা হয়। সিন্ধু-সভ্যতা যে কেবল সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল এমন নহে, অনুরূপ সভ্যতার চিহ্নাদি উত্তর-ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য সভ্যতার উৎকর্ষের তারতম্য থাকিলেও মোটামুটিভাবে সিন্ধু-সভ্যতার মৌলিক ধরন উত্তর-ভারতে আবিষ্কৃত চিহ্নাদিতে পরিলক্ষিত হয়। আর্যদের আগমনের পূর্বে কৃষিকার্যে ভারতীয়রা, যাহাদিগকে অনার্য নামে ব্যাপকার্থে অভিহিত করা হয়, যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল।* সিন্ধু-সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হরপ্পার অধিবাসীরা সর্বপ্রথম তুলার চাষ শুরু করিয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।** সিন্ধু-সভ্যতার যুগে সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না, তবে বর্তমান হিন্দু ধর্মের রীতি-নীতি ও দেব-দেবীর অনেক কিছুরই মূল সিন্ধু-সভ্যতার আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি

আর্য আক্রমণের ফলে পূর্বতন সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আর্য-অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা ও ধর্মব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিবার পরও বর্তমান কাল পর্যন্ত মূল কাঠামোর দিক দিয়া অপরিবর্তিতই রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিভাগে সমাজকে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এই শ্রেণী-বিভাগ জাতিবিভাগে রূপান্তরিত হইয়া অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটাইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ যুগ-যুগান্তের ইতিহাস অতিক্রম করিয়া আজিও হিন্দু সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বর্তমানে বহুলাংশে শিথিল হইয়াছে বলা যাইতে পারে। বিদ্যাচর্চা, শাস্ত্র রচনা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা বৈদিক যুগের সমাজের সংস্কৃতির এক অভাবনীয় উৎকর্ষের পরিচায়ক। বেদ-উপনিষদের ন্যায় উচ্চাঙ্গের এবং দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত সাহিত্য পৃথিবীর কোন অংশের আর্যগণ সেই যুগে রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। বেদ-উপনিষদের চিন্তাধারা অদ্যাবধি ভারতীয়দের এক বিশাল অংশের জীবনযাত্রার নির্দেশক, বলা বাহুল্য। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ইহা অন্যতম প্রধান।

আর্যদের আগমনের ফলে সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন

পারসীক বা গ্রীক আক্রমণের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের রাজনৈতিক ভাগ্যের তারতম্য ঘটিলেও ভারতীয় সমাজের উপর এই সকল আক্রমণের কোন প্রভাব

* Vide A. L. Basham : *The Wonder that was India,* pp. 25-26.
** *Ibid*, p. 26.

পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এই সকল আক্রমণ, বিশেষভাবে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভেদের প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া ভারত ও পাশ্চাত্য জগতের সহিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। এই সংযোগের মাধ্যমে পরবর্তী কালে গ্রীক ও রোমান শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব পাশ্চাত্য দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। কুষাণ আমলে গন্ধার শিল্প গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রীষ্টধর্মের উপরও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভারতীয় বিজ্ঞান, মুদ্রানীতি প্রভৃতির উপর যেমন গ্রীক প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল তেমনি ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব

আর্যদের পরবর্তী বৈদেশিক জাতির ভারত আগমনের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে কতক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মুসলমানদের ভারত আগমনের পূর্বাবধি ভারতীয় সমাজের তথা ভারতবাসীর পরকে আপন করিয়া লইবার মত প্রতিভা ছিল। ফলে শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বহিরাগত জাতি ভারতের সমাজদেহে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। গ্রীকদেরও কেহ কেহ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল এই প্রমাণও আছে। গ্রীক রাষ্ট্রদূত হেলিওডরাস (Heliodoros) বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বেসনগর নামক স্থানে দেবাদিদেব বাসুদেবের নামে একটি গরুড়-স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উপরি-উক্ত উদাহরণ প্রাচীন কালে ভারতীয় সমাজের উদারতা ও পরকে আপন করিয়া লইবার মত বলিষ্ঠতা প্রমাণ করে।

আর্যদের পরবর্তী কালে সমাজের উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অব্যবস্থা এবং বহিরাক্রমণের ফলে ভারত-ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ কালের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু এই সূত্রে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ জাতির ভারত প্রবেশের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে সেই যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ, ধর্মের প্রসার, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, নাগসেন, গুণাঢ্য ; চিকিৎসা ক্ষেত্রে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতির অবদান সেই যুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির উপর প্রভাবের ফলাফল

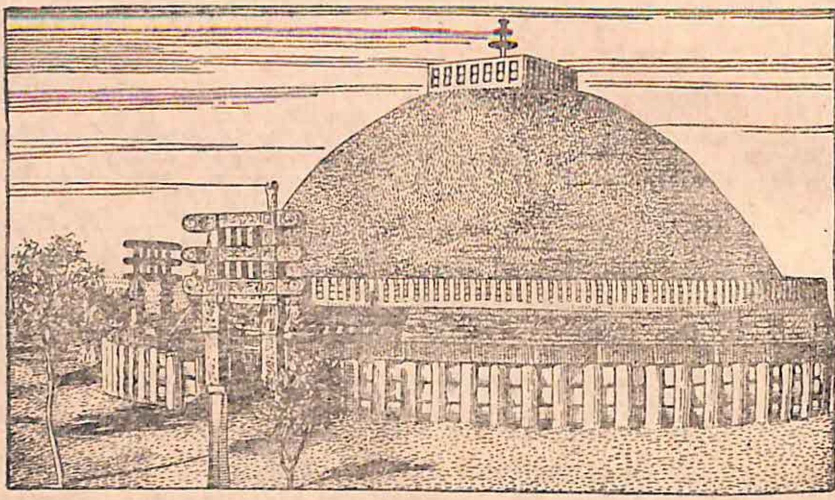
তক্ষশিলা সে-যুগে বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

শিক্ষা

বৈদেশিক প্রভাব গন্ধার শিল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক দেব-দেবী এ্যাপেলো, জিউস প্রভৃতি মূর্তির অনুকরণে গন্ধারের শিল্পীগণ বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া যায় সে-যুগের অমরাবতী ও মথুরার শিল্পরীতিতে।

শিল্প

পুরুষপুরে কণিষ্ক-নির্মিত চৈত্য, সাঁচী স্তূপের তোরণদ্বারের আলঙ্কারিক কারুকার্য, কান্‌হেরী, নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের গুহাচৈত্য, বরহুত, ভাজা, বুদ্ধগয়ার মঠ প্রভৃতি সে-যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।



সাঁচী স্তূপ ও তোরণ

মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে বৈদেশিক যোগাযোগের ফল হিসাবে ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রীক, পারসীক ও শক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শক 'স্যাট্রাপে'র (Satrap) অনুকরণে ভারতের শক রাজাগণ 'ক্ষত্রপ', 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করিতেন। গ্রীক 'স্ট্রাটিগোস' (Strategos)—অর্থাৎ সামরিক শাসনকর্তার অনুকরণে 'মহাসেনাপতি' উপাধি ভারতীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও গ্রহণ করিতেন।

রাজনীতি

কুষাণ আমলে সভ্যতা-সংস্কৃতির যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল উহার চরম অভিব্যক্তি গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

A.E. **রাজপুত জাতির মূল পরিচয় ও অভ্যুত্থান (The Origin and Rise of the Rajputs):** কাহিনী-কিংবদন্তীতে রাজপুত জাতি কোন কোন স্থলে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, কোন কোন স্থলে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুত, তাহাদের আদি পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। রাজপুতদের বিভিন্ন শাখা রামায়ণ-মহাভারতে উল্লিখিত বীরগণের বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতগণ মূলত ভারতীয় জাতির লোক। ইহার যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, রাজপুতগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা প্রাণপণ

রাজপুত জাতির মূল পরিচয় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা

যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া রাজপুতগণ যে মূলত ভারতীয় জাতির লোক এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হইবে না। কারণ সে-যুগের হিন্দু সমাজের পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তি ছিল। ফলে মূলত বিদেশী হইলেও রাজপুতগণ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতির সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বহু আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করিয়া থাকেন। শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির ন্যায়ই ইহারা হিন্দু সমাজের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছিল। রাজপুত জাতির কোন কোন শাখা—যেমন মধ্য-ভারতের চন্দেল্ল বংশ ভারতীয় গোন্দ জাতি-সম্ভূত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা হউক রাজপুত জাতির মূল পরিচয় সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট কিছু বলা ঠিক হইবে না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত জাতি ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। রাজপুত জাতির মধ্যে চৌহান্, পরমার, তোমর, চন্দেল্ল, গাহড়বাল, কলচুরি, গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখা

ভারত-ইতিহাসের দশম শতকে উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্যের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। গুর্জর-প্রতিহারদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া যে-সকল স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাজপুত রাজ্য।

বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যের উদ্ভব

গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলে চৌলুক্য (ইহারা সোলাঙ্কি নামেও পরিচিত) রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল 'অন্‌হিলবারা'। এই বংশের রাজাগণের মধ্যে প্রথম ভীম (১০২২-৬৪ খ্রীঃ), জয়সিংহ (১০৯৪-১১৪৪ খ্রীঃ), কুমার পাল (১১৪৪-৭৩ খ্রীঃ) ও দ্বিতীয় ভীমের (১১৭৮-১২৪১ খ্রীঃ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চৌলুক্য বংশ প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। ইহার পর (খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে) এই বংশেরই এক শাখা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। এই নূতন রাজবংশ 'বাঘেলা বংশ' নামে পরিচিত। বাঘেলা বংশের রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেবের রাজত্বকালে আলা-উদ্দিন খল্‌জী গুজরাট জয় করিয়াছিলেন।

চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি বংশ

রাজপুত জাতির মধ্যে চৌহান্ বংশ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল। আজমীর ও দিল্লী অঞ্চল লইয়া চৌহান্ বংশের রাজ্য গঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে প্রায় তিনশত বৎসর—অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চৌহান্ বংশ প্রতিপত্তি সহকারে রাজত্ব করিয়াছিল। গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা অঞ্চলে চৌহান্ রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছিল তাহাদের বিশেষ দায়িত্ব। তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে তৃতীয় পৃথ্বীরাজের দেশরক্ষার চেষ্টা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

চৌহান বংশ

বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল বংশ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে প্রাধান্য অর্জন করে। এই বংশের সমরবিজয়ী বীর রাজা ধঙ্গ (৯৫৪-১০০২ খ্রীঃ) ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দেল্ল বংশের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল খজুরাহো। এই বংশের রাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় খজুরাহোর মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল মন্দির সে-যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

চন্দেল্ল বংশ

জব্বলপুর অঞ্চলে কলচুরি বা কলস্থুড়িগণ রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ত্রিপুরি ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। এই বংশের রাজাগণের মধ্যে বিক্রমাদিত্য (১০৩০-৪১ খ্রীঃ) ও লক্ষ্মীকর্ণ (১০৪১-৭০ খ্রীঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত এই বংশ শক্তি ও প্রতিপত্তি সহকারে রাজত্ব করিয়াছিল।

কলচুরি বা কলস্থুড়ি বংশ

মালবের পরমার বংশ ছিল রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখার অন্যতম প্রধান। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর এই বংশ রাজত্ব করিয়াছিল। পরমার বংশের রাজা বাক্‌পতি প্রতিবেশী রাজাগণের রাজ্যের কতক অংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন রাজা ভোজ (১০১০-৫৫ খ্রীঃ)। রাজা ভোজ ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

পরমার বংশ

গাহড়বাল বংশ-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্র বারাণসীতে রাজত্ব শুরু করেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি কনৌজ পর্যন্ত সকল স্থান নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এই বংশের রাজাগণের মধ্যে গোবিন্দ চাঁদ (১১১৪-৫৪ খ্রীঃ), জয়চাঁদ বা জয়চন্দ্র (১১৭০-৯৩ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চাঁদের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া জয়চাঁদ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীঃ) পৃথ্বীরাজের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তিনি অবশ্য নিজে মোহম্মদ ঘুরীকে বাধাদানে ত্রুটি করেন নাই। মোহম্মদ ঘুরীর সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন।

গাহড়বাল বংশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাম্রাজ্যিক ঐক্যের পথে
(Towards Imperial Unity)

মগধের অধীনে (Under Magadha):

A.E. **(১) বিম্বিসার হইতে অশোক (From Bimbisara to Asoka):**

প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে মগধ রাজ্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনে অগ্রসর হইয়াছিল সেই কথা উল্লিখিত আছে। (বিহার প্রদেশের দক্ষিণাংশ লইয়া মগধ রাজ্য গঠিত ছিল।) বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিবার (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ) সঙ্গে সঙ্গে মগধ রাজ্যের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিম্বিসার মাত্র পনর বৎসর বয়সে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।) রাজ্যাভিষেকের অল্পকাল পরেই তিনি অঙ্গ রাজ্যটি জয় করেন। অঙ্গ রাজ্য জয়ের সময় হইতেই মগধ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। বিম্বিসার বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেও নিজ শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কোশল-কাশী রাজ্যের রাজা প্রসেন্‌জিতের ভগিনী কোশল দেবী, লিচ্ছবি দলপতির কন্যা চেল্লনা, বিদেহ রাজ্যের রাজকন্যা বাসবী এবং মদ্র রাজ্যের রাজকন্যা ক্ষেমা ছিলেন যথাক্রমে তাঁহার প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থা পত্নী। এই সকল বিবাহ-সূত্রে বিম্বিসার মগধের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। জৈন গ্রন্থাদিতে বিম্বিসারকে জৈন ধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ, উভয়ের সহিত বিম্বিসারের সাক্ষাৎকারের কথা উল্লিখিত আছে।

বিম্বিসার

বিম্বিসার কর্তৃক মগধের প্রাধান্যের সূচনা

বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু সিংহাসনলাভ করিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি পিতাকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনিও মগধের সাম্রাজ্য বিস্তারে পিতার ন্যায়ই উৎসাহী ছিলেন। কোশল রাজ্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে কোশল রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি কোশল রাজ্যের উপর কতক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব-ভারতের শক্তিশালী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সঙ্ঘগুলি জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (তাঁহার আমলেই গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে মগধের একটি বিকল্প রাজধানী—পাটলিপুত্র নগর স্থাপিত হইয়াছিল।) তাঁহাকেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যাহা হউক গৌতম বুদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের পর হইতে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

অজাতশত্রু

পাটলিপুত্র নগর বিকল্প রাজধানী হিসাবে নির্মিত

অজাতশত্রুর পরবর্তী রাজাগণের দুর্বলতা এবং তাঁহাদের পারিবারিক কলহ প্রভৃতিতে অতিষ্ঠ হইয়া জনসাধারণ মন্ত্রী শিশুনাগকে মগধের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিল, একথা সিংহলী বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশে উল্লিখিত আছে।

বিম্বিসারীয় বংশের পতন : শিশুনাগের সিংহাসনলাভ

শিশুনাগ বহিরাক্রমণ হইতে মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবন্তী রাজ্যকে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। বৎস ও কোশল রাজ্যও তাঁহার আমলে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। শৈশুনাগ বংশের পরবর্তী রাজাগণ খুব শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে মগধের সিংহাসন নন্দ বংশের অধিকারে চলিয়া যায়। নন্দ বংশের স্থাপয়িতা নীচকুল-সম্ভূত ছিলেন একথা পুরাণ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। মহাপদ্মনন্দ এই বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন। বিম্বিসার ও অজাতশত্রু গঠিত মগধ সাম্রাজ্যকে মহাপদ্মনন্দ বিশালতর ও অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। নন্দ বংশে মোট নয়জন রাজা রাজত্ব করেন। এই বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইলেও নন্দরাজগণ জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারেন নাই। বিশেষত, সর্বশেষ নন্দরাজ ধননন্দ তাঁহার স্বার্থ-লোলুপতার জন্য জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ধননন্দ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলেকজাণ্ডার অবশ্য মগধ আক্রমণ করেন নাই, কিন্তু নন্দ বংশের ভাগ্যে আর অধিককাল রাজ্যভোগ ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং চাণক্য নামে তক্ষশিলার জনৈক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের হস্তে নন্দ বংশের পতন ঘটিয়াছিল।

শিশুনাগ কর্তৃক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

শৈশুনাগ বংশের পতন—নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা : মহাপদ্মনন্দ

'নব নন্দ' ('Nine Nandas')

ধননন্দ—নন্দ বংশের শেষ রাজা

মৌর্য বংশের উত্থান

A.E **চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, খ্রীঃ পূঃ ৩২০-৩০০ (Chandragupta Maurya)**: মগধের নন্দ বংশের অবসান ঘটাইয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থাদিতে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ বংশ-সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিকদের মতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন নীচ বংশ-সম্ভূত। হিন্দু কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের মাতা 'মুরা' ছিলেন শূদ্রাণী। মুরার নাম অনুসারেই চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'মৌর্য বংশ' নামে অভিহিত হইয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুত, পিপ্পলীবনের ময়ূরপোষক প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সন্তান বলিয়া চন্দ্রগুপ্তের বংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মৌর্য বংশকে ক্ষত্রিয় বংশ বলিয়াই মনে করেন।

চন্দ্রগুপ্তের পরিচয়

বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের পিতা যুদ্ধে প্রাণ হারাইলে তাঁহার মাতা শিশু চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একবার নন্দরাজসভায় চাণক্য নামে তক্ষশিলার জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রকাশ্যে অপমান করা হইয়াছিল। এজন্য তিনি নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তকে তিনি

চাণক্য

রাজসদৃশ লক্ষণযুক্ত দেখিয়া তাঁহার মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

চাণক্যের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন করিলেন। ইহার অল্পকাল পরে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক শাসনকর্তাদের পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চল বৈদেশিক অধিকার হইতে মুক্ত করিলেন।

নন্দ বংশের উচ্ছেদ—গ্রীক প্রভুত্বের অবসান

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। সীরিয়া ও ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিজিত অঞ্চল সেনাপতি সেলুকাসের অংশে পড়িয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকৃত হইলে সেলুকাস সেই অংশ পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট এই কয়টি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তদুপরি উভয় পক্ষে এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। সাধারণ্যে একথাই অবশ্য প্রচলিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে শুরু করিয়া সীরিয়া তথা গ্রীক দেশগুলির সহিত মৌর্য বংশের সৌহার্দ্য দীর্ঘকাল অটুট ছিল। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক গ্রীক দূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণটি অবশ্য সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

সেলুকাসের ভারত আক্রমণ ও পরাজয়

সেলুকাস-চন্দ্রগুপ্ত মৈত্রী

মেগাস্থিনিস

চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে আফগানিস্তান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কুখ্যাত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন, বৈদেশিক অধিকার হইতে দেশের একাংশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, সেলুকাসের আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতে সর্বপ্রথম শক্তিশালী ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

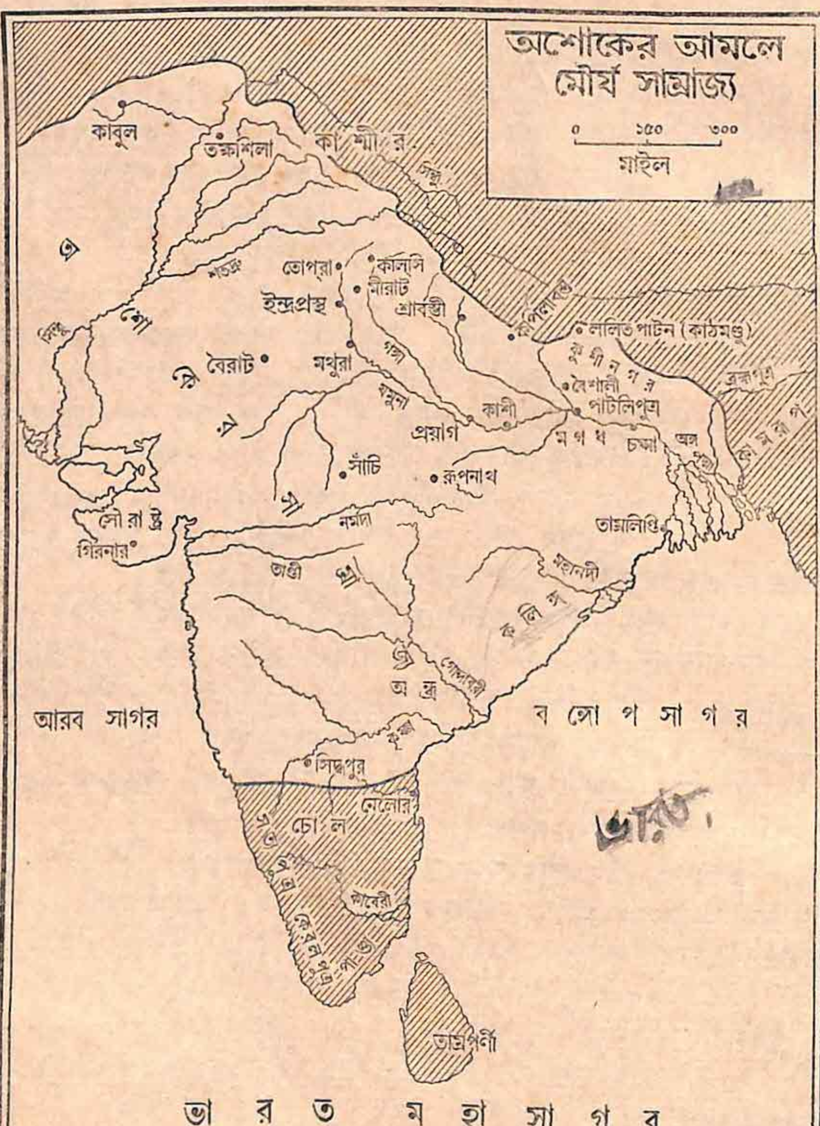
চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

বিন্দুসার, খ্রীঃ পূঃ ৩০০-২৭৩ (Bindusara): চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলে একবার তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। যুবরাজ অশোককে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিন্দুসারের রাজত্বকাল সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নাই। গ্রীক গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে তাঁহার আমলেও গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত ভারতবর্ষের সৌহার্দ্য পূর্বের ন্যায় বলবৎ ছিল।

গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত সৌহার্দ্য

সম্রাট অশোক, খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩৬ (Emperor Asoka): বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

সেই সময়ে সিংহাসন অধিকার লইয়া এক তীব্র ভ্রাতৃবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ কাহিনী-কিংবদন্তীতে উল্লিখিত আছে। অশোক তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের অনেকের প্রাণনাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই সকল তথ্য কতদূর সত্য সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে



করিয়া থাকেন। অশোকের অভিষেকক্রিয়া চারি বৎসর পর (খ্রীঃ পূঃ ২৬৯) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর এক ভ্রাতৃবিরোধ দেখা দিয়াছিল একথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়ত ঠিক হইবে না। ভ্রাতৃহত্যার নির্মমতার কথা বাদ দিলেও ভ্রাতৃবিরোধ যে ঘটিয়াছিল একথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অযৌক্তিক হইবে না।

সিংহাসনলাভ—ভ্রাতৃবিরোধ

অশোক মৌর্য সম্রাটসুলভ মনোবৃত্তি লইয়াই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় সাম্রাজ্য বৃদ্ধিতে তাঁহার স্বভাবতই আগ্রহ ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বেই তিনি তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন সেই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজ্যাভিষেকের (খ্রীঃ পূঃ ২৬৯) নয় বৎসর পরে—অর্থাৎ সিংহাসনলাভের ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি কলিঙ্গ নামক প্রতিবেশী রাজ্যটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন। কলিঙ্গরাজের সৈন্যসংখ্যা রাজ্যের আয়তন বা লোকসংখ্যার অনুপাতে অত্যধিক ছিল। প্রতিবেশী কলিঙ্গ রাজ্যের এরূপ সামরিক শক্তি এবং সামরিক আস্ফালন স্বভাবতই মৌর্য সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক হইতে কাম্য ছিল না। এজন্য সম্রাট অশোক কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে অশোক জয়লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের মর্মান্তিক দৃশ্য অশোকের অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। এক লক্ষ সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল এবং কয়েক লক্ষ লোক যুদ্ধের আনুষঙ্গিক লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির ফলে মারা গিয়াছিল। বহু স্ত্রী স্বামীহারা, বহু জননী পুত্রহারা হইয়াছিলেন।

সম্রাটসুলভ মনোবৃত্তি

কলিঙ্গ যুদ্ধ—যুদ্ধের মর্মান্তিকতা

কলিঙ্গ যুদ্ধের মর্মান্তিকতা অশোকের অন্তরে এক বিরাট পরিবর্তনসাধন করিল। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া চিরকালের জন্য দিগ্বিজয় ত্যাগ করিলেন। (সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব দ্বারা অপরের হৃদয় জয় করাই হইল তাঁহার জীবনের ব্রত।) অশোক পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলিকে আশ্বাসবাণী শুনাইলেন যে তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি কোন দিনই অস্ত্রধারণ করিবেন না। দিগ্বিজয়ের পন্থা ত্যাগ করিয়া অশোক ধর্মবিজয়ের পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই মানসিক পরিবর্তন মৌর্য সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি সর্বক্ষেত্রেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

অশোকের মর্মবেদনা ও মানসিক পরিবর্তন

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর জনকল্যাণকর করিয়া তুলিলেন। প্রত্যেক তিন এবং পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর তিনি রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলের শাসন ও বিচার কার্যাদি পরিদর্শনের জন্য এক এক দল রাজকর্মচারী প্রেরণের নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি সকল মানুষের এমনকি জীবমাত্রেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। রাজকর্তব্যের আদর্শ তিনি পরিবর্তন করিয়া জনগণের কল্যাণসাধনই একমাত্র কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় মৌর্য শাসন-ব্যবস্থা মানবধর্মী ও জনকল্যাণকামী হইয়া উঠিল। বিচার বিভাগের সংস্কার, রাজুক

আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

মানবধর্মী ও জনকল্যাণকামী শাসনব্যবস্থা

নামক রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়া অশোক শাসনব্যবস্থাকেও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জনমঙ্গলকর করিয়া তুলিলেন। তিনি সকল মানুষকে নিজ সন্তান বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং পিতৃসুলভ দায়িত্ব লইয়া প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মঙ্গল কেবল পার্থিব মঙ্গলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরবর্তী জীবনেও প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন করা তাঁহার দায়িত্ব বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

পিতৃসুলভ দায়িত্ববোধ

পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রেও অশোক এক নূতন নীতির প্রবর্তন করিলেন। তিনি দিগ্বিজয়ের স্থলে ধর্মবিজয় শুরু করিয়াছিলেন সেই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল দেশের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনে ব্রতী হইলেন। তিনি পররাষ্ট্রের প্রতি যুদ্ধনীতি নিজে ত্যাগ করিয়াছিলেন এমনকি নিজ পুত্র ও পৌত্রদেরও যুদ্ধনীতি ত্যাগের উপদেশ দিয়াছিলেন।

পররাষ্ট্র-নীতি : সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব

সম্রাট অশোক তাঁহার মানবতা ও রাজকর্তব্যের আদর্শের জন্য পৃথিবীর সর্বকালের রাজাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনলাভ করিয়াছেন। প্রজার মঙ্গলসাধনই যদি রাজার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় এবং মানবিকতাই যদি মনুষ্যত্ব বিচারের মানদণ্ড হয় তাহা হইলে এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সম্রাট অশোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন রাজা বা সম্রাট কোন কালেই আবির্ভূত হন নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জাতির রাজাগণের সহিত সম্রাট অশোকের তুলনা করিয়াছেন। সকলেই সম্রাট অশোককে সর্বকালের রাজাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান দান করিয়াছেন।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট

কলিঙ্গ যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড দেখিয়া অশোকের অন্তরে যে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি হইয়াছিল উহার ফলে তাঁহার রাজকর্তব্যের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। দিগ্বিজয়ী মৌর্য সম্রাট অশোক মানবধর্মী রাজর্ষি অশোকে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। অশোক এক নূতন আদর্শে—জনকল্যাণের তথা জীবজগতের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ও কার্যে কোনপ্রকার ব্যবধান ছিল না। সম্রাট অশোকের এই পরিবর্তন ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের এক বিরাট পরিবর্তন বলিয়া বিবেচ্য।

অশোকের মানবতা

প্রজাবর্গের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের উন্নয়নসাধন করা অশোক ভিন্ন অপর কোন সম্রাট কর্তব্য হিসাবে কল্পনায়ও আনেন নাই। অশোক রাজপদকে ভোগবিলাসের সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। উপরন্তু তিনি মনে করিতেন যে, তিনি প্রজাবর্গের নিকট ঋণী। প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন দ্বারা তিনি সেই ঋণ শোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। 'সব মানুষ আমার সন্তান'* এইরূপ উদার বাণী পৃথিবীর অপর কোন রাজার বা সম্রাটের মুখে উচ্চারিত হয় নাই। পররাষ্ট্রের প্রতি সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের নীতি অনুসরণ করিয়া

প্রজাবর্গের পার্থিব ও পারলৌকিক উন্নয়ন

* 'সব মুনিসে পজা মমা'।

তিনি যে-পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন আজ বিংশ শতাব্দীতেও আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য সেই পথ ভিন্ন অপর কোন শ্রেষ্ঠতর পথ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই মানবতার বাণীই হইল রাজর্ষি অশোকের বাণী—ইহাই হইল ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। অপরকে আপন করিয়া লইয়া যে বিরাট সমন্বয়সাধন করা সম্ভব তাহাই সম্রাট অশোক নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই আদর্শ ই ভারতবাসীর জীবনাদর্শ।)

সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী

(২) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত (From Chandragupta I to Skandagupta): মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও বৈদেশিক আক্রমণ-জনিত অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল কুষাণ যুগের শাসনদক্ষতায় উহা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছিল। ইহার পর প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশ গুপ্তদের উত্থান ঘটে। এই বংশের আদি রাজাগণের মধ্যে মহারাজ শ্রীগুপ্ত (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগ), ঘটোৎকচগুপ্ত প্রভৃতি রাজার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহারা মগধের—অর্থাৎ দক্ষিণ-বিহারের কোন স্থানীয় রাজা ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশ

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (Chandragupta I): (গুপ্ত বংশের সর্বপ্রথম শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে (৩২০ খ্রীঃ) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।) তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত বংশের ইতিহাসের তথা ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়ের সূচনা হয়। (পাটলিপুত্র নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল এবং তাঁহার রাজ্য অযোধ্যা ও এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।) (বৈশালীর লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন গুপ্ত রাজবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা।)

গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা

সমুদ্রগুপ্ত (Samudragupta): (মৃত্যুর পূর্বেই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ পুত্রগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন কুমারদেবীর সন্তান।) সমুদ্রগুপ্ত পিতার প্রথম পুত্র ছিলেন না, তথাপি পিতার ইচ্ছা অনুসারে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। (প্রথমে তিনি আর্যাবর্তের রুদ্রদেব, নাগদত্ত, মতিল, অচ্যুত, গণপতি, নাগসেন, চন্দ্রবর্মণ, বলবর্মণ প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করিয়া সমগ্র আর্যাবর্ত নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন।) ইহার পর তিনি মধ্য-ভারতের আটবিক বা অরণ্য রাজ্যগুলি জয় করিলেন। (তারপর শুরু হইল তাঁহার দাক্ষিণাত্য বিজয় অভিযান। আর্যাবর্তের রাজাগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্ত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।) (কিন্তু

দিগ্বিজয়: উত্তর-ভারত তথা আর্যাবর্ত

মধ্য-ভারত

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি সম্পর্কে তিনি ভিন্ন নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই অঞ্চলের রাজাগণের মধ্যে মহেন্দ্র, ব্যাঘ্ররাজ, দমন, বিষ্ণুগোপ, উগ্রসেন, ধনঞ্জয় প্রভৃতি বহু রাজাকে পরাজিত করিয়া এবং তাঁহাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্য ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। দূরদর্শী সমুদ্রগুপ্ত হয়ত বুঝিয়াছিলেন যে, মগধ হইতে দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যগুলির উপর অধিকার রক্ষা করিবার একমাত্র পথ ছিল সেই সকল অঞ্চলের রাজাগণকে স্থানীয় শাসনাধিকার দান করা।

দাক্ষিণাত্য



সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযানের সাফল্য প্রতিবেশী, বিশেষভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজাগণের মনে ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল। সমতট—অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের একাংশ, কামরূপ, দাভক (ঢাকা ?) প্রভৃতি স্থানের রাজাগণ সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মদ্রক, আভির, প্রার্জুন, যৌধেয় প্রভৃতি উপজাতীয় দলও সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। পশ্চিম-ভারতের মালব, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ-ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য সিংহল প্রভৃতির রাজাগণও সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য মানিয়া চলিতেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের অনুমতিক্রমে বোধগয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে কুষাণ বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারাও সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইভাবে সমুদ্রগুপ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত, পশ্চিমে যমুনা হইতে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল।

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির আনুগত্য

সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্বিজয়ী বীরই ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ, সুদক্ষ শাসনক্ষমতা প্রভৃতির জন্য তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয় শেষ করিয়াই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ থাকিলেও তিনি অপরাপর ধর্মের প্রতিও পরম শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি স্বয়ং কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি তদানীন্তন বিদ্বজ্জন সমাজে 'কবিরাজ'—অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবি নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে যে তাঁহার অনুরাগ ছিল তাহা তাঁহার বীণাবাদনরত মুদ্রা হইতেই অনুমিত হইয়া থাকে। সমুদ্রগুপ্তের রাজসভা তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত হরিষেণ কর্তৃক অলঙ্কৃত ছিল। হরিষেণ-রচিত 'এলাহাবাদ-প্রশস্তি'তে সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালের এবং সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এলাহাবাদে একটি পাথরের স্তম্ভে এই প্রশস্তিটি খোদাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু সমুদ্রগুপ্তের অযাচিত সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত চরিত্রের ক্ষমতা, বীরত্ব, সাহিত্যশিল্প প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা—এই সকল বিভিন্ন দিক দিয়া সমুদ্রগুপ্ত ভারতীয় রাজাগণের অন্যতম প্রধান হিসাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। চতুর্থ শতকের শেষভাগে (৩৭৫ ও ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

ভারতীয় রাজাগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' (Chandragupta II 'Vikramaditya'): সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতামহ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বৈবাহিক সূত্রে নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাগ ও কদম্ব বংশের

বৈবাহিক সূত্রে শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

রাজকন্যাদের বিবাহ করিবার ফলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শক্তি ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বাকাটকরাজ রুদ্রসেনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি শকদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের পথ সহজ করিয়াছিলেন।

মালব, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয়

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বীয় সেনাপতি বীরসেন সাবের সহিত যুগ্মভাবে মালব, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয় করিয়াছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীতে একটি বিকল্প রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। গুপ্ত শাসনকালেও পাটলিপুত্র ছিল সাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী।

পাটলিপুত্র নগরের সৌন্দর্য

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে পাটলিপুত্র নগর এবং বিশেষত মৌর্যসম্রাটগণ-নির্মিত প্রাসাদের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা সমসাময়িক কালের বহু বিদ্বান মনীষী কর্তৃক অলঙ্কৃত ছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা

কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কাহিনী-কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য কি না সে-বিষয়ে কতক মতদ্বৈধ থাকিলেও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই দুইজন এক ও অভিন্ন একথা মনে করেন। চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে।

ফা-হিয়েনের বিবরণ (Fa-hien's Account): চীনে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের পর হইতে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি সংগ্রহের জন্য পর পর বহু চৈনিক পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ফা-হিয়েন ছিলেন অন্যতম প্রধান। তিনি প্রায় দশ বৎসর (৪০১-৪১০ খ্রীঃ) এদেশে বাস করিয়াছিলেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর তিনি বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যে অতিবাহিত করেন। বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দরে তিনি দীর্ঘ তিন বৎসর ছিলেন।

উদার শাসনব্যবস্থা: শান্তি ও সমৃদ্ধি

ফা-হিয়েনের বিবরণে গুপ্ত শাসনের ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। গুপ্তরাজগণ এক অতি উদার শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশের সর্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি সেই সময়ে একপ্রকার ছিলই না। দণ্ডবিধির উদারতায় ফা-হিয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে অপরাধীর প্রাণদণ্ড দেওয়ার কোন প্রয়োজন হইত না। কঠোর অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা ছিল।

রাজস্ব

শাসনকার্যের দক্ষতা

ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজকর্মচারিগণ নিয়মিত বেতন পাইতেন। শাসনকার্যের দক্ষতা ও রাজকর্মচারিগণের কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া ফা-হিয়েন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগরীতে মৌর্য প্রাসাদ দেখিয়া তিনি এরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন যে উহা মানুষের দ্বারা নির্মিত নহে—এই মন্তব্য তিনি করিতে বাধ্য

হইয়াছিলেন; মথুরায় তিনি বহু বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন, এগুলিতে তখন বহু সংখ্যক (৩ হাজার) বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। দেশের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল। মদ, মাংস তখন কেহ স্পর্শ করিত না। পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতিও কেহ খাইত না। জনসাধারণ কোন বিচারালয়ের ধার ধারিত না। জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয়ে রেজিষ্ট্রি করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। জনসাধারণ রাত্রিতে ঘরের দরজা-জানালা খোলা রাখিয়া নিদ্রা যাইত। রাস্তায় সোনা ফেলিয়া রাখিলেও কেহ তাহা লইত না। এই সকল উক্তি হইতে সে-যুগের জনসাধারণ যে অত্যন্ত সন্তোষপূর্ণ জীবন যাপন করিত সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না।

বৌদ্ধ ধর্ম-প্রভাবিত জীবনযাত্রা

জনসাধারণের সন্তোষ

পরধর্মসহিষ্ণুতা

পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল সেই সময়কার সমাজ-জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গুপ্তরাজগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁহাদের পরম উদারতা প্রদর্শনের কথা ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে জাতিভেদ-প্রথা কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির লোকদের অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করা হইত।

জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। তাহাদের সততা ও সৎকার্যে কালাতিপাতের কথাও ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেশের বিভিন্ন অংশ রাজপথ দ্বারা সংযোজিত ছিল। রাজপথের পার্শ্বে পান্থশালা প্রভৃতিও স্থাপন করা হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল। ফা-হিয়েন পাটলিপুত্র নগরে একটি বিরাট দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিতে পাইয়াছিলেন।

আর্থিক অবস্থা

পরিবহণব্যবস্থা

দাতব্য চিকিৎসালয়

পরবর্তী গুপ্তরাজগণ (The Later Guptas): দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পর প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনকাল সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ জানা যায় নাই। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং পরধর্মের প্রতি পরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার রাজত্বকালে পুষ্যমিত্র জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা। তিনি পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন গুপ্ত সাম্রাজ্য পুনর্গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তিনি সীমান্ত রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তই ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশেষ পরাক্রমশালী রাজা। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত বংশের পতন শুরু হয়। ক্রমে দুর্বল হইতে দুর্বলতর রাজাগণের অধীনে গুপ্ত বংশের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে জীবিতগুপ্তের (দ্বিতীয়) আমলে উহার বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তী কালেও গুপ্ত উপাধিধারী স্থানীয় রাজাগণের পরিচয় পাওয়া

প্রথম কুমারগুপ্ত

স্কন্দগুপ্ত

জীবিতগুপ্ত (দ্বিতীয়)

যায় বটে, কিন্তু গুপ্ত সম্রাট বংশের পতন জীবিতগুপ্তের (দ্বিতীয়) আমলেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

কনৌজের অধীনে (Under Kanauj) :

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে-সকল রাজ্যের উত্থান ঘটিয়াছিল সেগুলির মধ্যে কনৌজ, বঙ্গদেশ বা গৌড় রাজ্য, কাশ্মীর, বলভী, বাকাটক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পুষ্যভূতি হর্ষবর্ধন হইতে প্রতিহার মহেন্দ্রপাল (From Pushyabhuti Harshavardhana to Pratihara Mahendrapala) : কনৌজের মৌখরি বংশ গুপ্ত সম্রাটদের সামন্তরাজ ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে এই বংশ উত্তর-ভারতে অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন হরিবর্মন। ঈশ্বরবর্মন, ঈশানবর্মন, সর্ববর্মন, অবন্তীবর্মন, গ্রহবর্মন প্রভৃতি ছিলেন এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা। গ্রহবর্মন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে তিনি নিহত হইলে কনৌজ থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের অধীন হইয়া গিয়াছিল।

গ্রহবর্মন—দেবগুপ্ত কর্তৃক নিহত

পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নরপতি। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ হইতে পুষ্যভূতি বংশ থানেশ্বর নামক স্থানে ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। গুপ্ত বংশের সহিত পুষ্যভূতি বংশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। প্রভাকরবর্ধন কনৌজের মৌখরি বংশের সহিতও সম্পর্কিত ছিলেন। মৌখরি বংশের রাজা গ্রহবর্মনের সহিত তিনি নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন ইতিহাস-বিখ্যাত হর্ষবর্ধন।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যবর্ধন (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৬০৫ খ্রীঃ)। সেই সময়ে মালব ও কনৌজের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা চলিতেছিল। মালবরাজ দেবগুপ্ত গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং কনৌজরাজ গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন। এমনকি তাঁহার রাণী রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করিয়া রাখেন। রাজ্যবর্ধন ভগিনীপতিহন্তা দেবগুপ্তকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত হইলেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইলেন।

রাজ্যবর্ধন

হর্ষবর্ধন, ৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ (Harshavardhana) : রাজ্যবর্ধনের আকস্মিক মৃত্যুতে (৬০৬ খ্রীঃ) তাঁহার ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। গ্রহবর্মনের মৃত্যুতে কনৌজের সিংহাসনও শূন্য হইয়া গিয়াছিল। তথাকার সভাসদ্‌গণের ইচ্ছানুক্রমে কনৌজ রাজ্য থানেশ্বর রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হর্ষবর্ধন ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার

হর্ষবর্ধনের সিংহাসন লাভ

পূর্বেই সংবাদ পাইলেন যে রাজ্যশ্রী বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া বিন্ধ্য পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হর্ষবর্ধন কাল বিলম্ব না করিয়া ভগিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বিন্ধ্য পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্বত্য জাতির লোকদের সাহায্যে তিনি শেষ পর্যন্ত ভগিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইলেন। রাজ্যশ্রীকে লইয়া তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার কিছুকাল পরই তিনি থানেশ্বর হইতে কনৌজে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন।

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার

ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে তখনও শাস্তি দেওয়া হয় নাই। এজন্য তিনি প্রথমে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন, কিন্তু ভাস্করবর্মনের সহায়তা গ্রহণ করিয়াও তিনি গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের অনিষ্টসাধন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা

হর্ষবর্ধন দীর্ঘ ছয় বৎসর অবিরত যুদ্ধ করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলভীর রাজা ধ্রুবসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সাময়িক-ভাবে বলভী রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেশী দিন তিনি এই প্রাধান্য বজায় রাখিতে সমর্থ হন নাই। বলভীরাজ ধ্রুবসেন নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। ধ্রুবসেন ও হর্ষবর্ধনের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হওয়ার পর এই দুই রাজ্যের পরস্পর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। সিন্ধুদেশেও সাময়িকভাবে হর্ষবর্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বাণভট্টের হর্ষচরিতে উল্লিখিত আছে। হর্ষবর্ধন 'তুষারশৈল'—অর্থাৎ কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের দিকে হর্ষবর্ধনের বিজয় অভিযান চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক প্রতিহত হইয়াছিল। হর্ষবর্ধন মগধ, কঙ্গোদ প্রভৃতি স্থানও নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধনের দিগ্বিজয়

দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে পরাজয়



হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধন কেবল বীরযোদ্ধা হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এমন নহে। সুশাসক হিসাবেও তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু শাসনকার্য বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন। শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে তাঁহার এই অক্লান্ত চেষ্টার কথা চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায়ও পাওয়া যায়।

শাসনব্যবস্থা

ধর্ম-বিষয়ে হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতীয় সহিষ্ণুতা-নীতি অনুসরণ করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন, কিন্তু অপরাপর ধর্মের প্রতিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি শিব এবং সূর্যেরও উপাসনা করিতেন।*

ধর্ম-নীতি

* Vide *An Advanced History of India* (3rd Edn., 1967), p. 152.

প্রজাবর্গের সুবিধার্থ রাস্তাঘাট নির্মাণ করাইয়া উহার পার্শ্বে সরাইখানা, বিশ্রামাগার তিনি স্থাপন করাইয়াছিলেন। তিনি চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের সম্মানার্থ কনৌজে এক ধর্মসভার আয়োজন করেন। এই ধর্মসভায় ভাস্করবর্মন, বলভীর ধ্রুবসেন প্রভৃতি মোট আঠার জন করদ-মিত্র রাজা উপস্থিত ছিলেন।

জনকল্যাণকর কার্যাদি

কনৌজের ধর্মসভা

কনৌজের ধর্মসভার পর হর্ষবর্ধন প্রয়াগে গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে তাঁহার পঞ্চবার্ষিক মেলার আয়োজন করেন। হিউয়েন সাঙকেও এই মেলায় আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। দীর্ঘ ৭৫ দিন ধরিয়া এই মেলার অনুষ্ঠান চলিয়াছিল। বুদ্ধ, সূর্য ও শিবের উপাসনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধু-সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুদের তিনি নানাবিধ মূল্যবান সামগ্রী দান করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের রাজস্বের উদ্বৃত্ত সম্পূর্ণভাবে দান করিয়া এমনকি একখানি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার নিজের মূল্যবান রাজকীয় বস্ত্রখানিও তিনি দান করিয়া দিতেন।

প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিক মেলা

হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কালে কনৌজের সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। গৌড়ের পাল বংশের রাজা ধর্মপাল কনৌজের সিংহাসনে তাঁহার তাঁবেদার রাজা চক্রায়ুধকে স্থাপন করেন। কিন্তু কনৌজের উপর গৌড়ের অধিকার দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রতিহার বংশের আধিপত্য কনৌজের উপর স্থাপিত হয়। শুধু তাহাই নহে, প্রতিহার বংশের আধিপত্য পাঞ্জাব হইতে মধ্য-ভারতের দেওগড়, এবং কাথিয়াবাড় হইতে উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগভট্ট সিন্ধু হইতে অন্ধ্র পর্যন্ত এবং কাথিয়াবাড় হইতে বাংলাদেশের সীমা পর্যন্ত তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। বাংলার পালবংশীয় রাজা ধর্মপাল তাঁহার হস্তে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিলেন। নাগভট্ট ধর্মপালের তাঁবেদার রাজা চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র প্রথম ভোজ ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের সিংহাসনে নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন এবং প্রতিহার সাম্রাজ্য বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল পিতার সাম্রাজ্য সীমা যে কেবল অপরিবর্তিত রাখিয়াছিলেন তাহাই নহে পূর্ব দিকে তিনি সাম্রাজ্য সীমা আরও বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রতিহার সাম্রাজ্য

গৌড়ের অধীনে (Under Gauda):

শশাঙ্ক হইতে দেবপাল (From Sasanka to Devapala): গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে প্রথমে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশ লইয়া 'বঙ্গ' নামে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফরিদপুরের

কোটালিপাড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে এই রাজ্যের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে—যথা, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। ইহাদের পরস্পর সম্পর্ক কি ছিল তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তাঁহাদের মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ হইতে মনে হয় যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা ছিলেন। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলে সম্ভবত বঙ্গ রাজ্য তাঁহার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল।

বঙ্গ : গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব

গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শশাঙ্ক। সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে গুপ্ত বংশের শেষ রাজা মহাসেনগুপ্তের শাসনকালে শশাঙ্ক নামে তাঁহারই এক বাঙালী সামন্তরাজ গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক কেবল স্বাধীন গৌড় রাজ্যের স্থাপয়িতাই ছিলেন না, তিনি গৌড়কে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি নামক স্থানটি সে-যুগে কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ছিলেন সম্রাট হর্ষবর্ধনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। কনৌজের মৌখরি বংশের সাম্রাজ্য-স্পৃহা হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করাই ছিল শশাঙ্কের মূল উদ্দেশ্য। মালবরাজ দেবগুপ্তকে তিনি সপক্ষে টানিয়া মৌখরি বংশের বিরুদ্ধে নিজ শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই দেবগুপ্ত মৌখরিরাজ গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন। রাজ্যবর্ধন এজন্য দেবগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দেবগুপ্তের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। কিন্তু এই বিজয়ের অব্যবহিত পরেই দেবগুপ্তের মিত্ররাজা শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইলেন। রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ভ্রাতৃহন্তা গৌড়রাজ শশাঙ্ককে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন বা ভাস্করবর্মন তাঁহার কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়, উৎকল, মগধ ও কঙ্গোদ শশাঙ্কের অধীনে ছিল বলিয়াই জানিতে পারা যায়।

গৌড় : শশাঙ্ক

মালবরাজ দেবগুপ্ত ও শশাঙ্কের মিত্রতা

শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধন নিহত

হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে শশাঙ্কের আত্মরক্ষার সামর্থ্য

শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিনি তেমন উদারতা প্রদর্শন করেন নাই। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছিল ; পাল বংশের উত্থানের পূর্বাবধি এই অরাজকতা অপ্রতিহতভাবে চলিতেছিল।

শশাঙ্কের পরবর্তী কালে অরাজকতা

গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন গৌড় রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। নিধনপুর তাম্রশাসনে ভাস্করবর্মন বঙ্গ রাজ্যের রাজা জ্যেষ্ঠভদ্রকে সামন্তরাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ভাস্করবর্মন সাময়িক কালের জন্য বঙ্গ রাজ্যেরও আনুগত্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গ রাজ্য স্বাধীন হইয়া

জ্যেষ্ঠভদ্র

পড়িয়াছিল মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু ইহার পর অধিককাল জ্যেষ্ঠভদ্রের বংশধরগণ বঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করিবার সুযোগ পান নাই। খড়্গ বংশ নামে অপর এক বংশ কর্তৃক ভদ্র বংশ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল। খড়্গ বংশের রাজা ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে কনৌজের যশোবর্মন বঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করিয়া উহার আনুগত্য আদায় করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার এই প্রাধান্য অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। খড়্গ বংশের রাজা ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্গ রাজ্যে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছিল।

খড়্গ বংশ—ললিতচন্দ্র

যাহা হউক, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্য রক্ষা করিবার মত আর কোন ক্ষমতাশালী শাসকের উদ্ভব ঘটে নাই। শশাঙ্কের পরবর্তী কালে বাংলাদেশের সর্বত্র এক ব্যাপক অরাজকতা ও অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে বাংলাদেশের অবস্থাকে 'মাৎস্য-ন্যায়' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে সেইরূপ ধনী দরিদ্রের উপর, শক্তিশালী দুর্বলের উপর অপ্রতিহতভাবে অত্যাচার চালাইতেছিল। ক্ষত্রিয়, অভিজাত শ্রেণী, বণিক সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিবার ফলে বাংলাদেশে এক ঘোর দুর্দিন দেখা দিয়াছিল। এই দুর্বলতার সুযোগে শৈলোদ্ভব বংশের রাজাগণ, চন্দেলরাজ যশোবর্মন, জয়াপীড় প্রভৃতি বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে স্বভাবতই সাহসী হইয়াছিলেন।

'মাৎস্য-ন্যায়'

বৈদেশিক আক্রমণ

দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ অরাজকতা চলিতে থাকিলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বাংলার নেতৃবর্গ দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া সম্মিলিতভাবে গোপাল নামে জনৈক প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় রাজাকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন (৭৫০ খ্রীঃ)। দেশ ও দশের স্বার্থের কথা ভাবিয়া বাংলার নেতৃবর্গের গণতান্ত্রিক উপায়ে গোপালকে সিংহাসনে স্থাপন সেই যুগের বাঙালী জাতির জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত, বলা বাহুল্য। গোপালের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর বাংলার শাসনভার অর্পণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষ ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

গোপালের নির্বাচন (৭৫০ খ্রীঃ)

বাঙালীর দেশাত্মবোধ

গোপাল, ৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ (Gopala): ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের সিংহাসনে গোপালের নির্বাচন বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা, সন্দেহ নাই। সিংহাসনে নির্বাচিত হইয়াই গোপাল বাংলাদেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার উদ্দেশ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার রাজত্বকাল প্রধানত শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। খালিমপুর তাম্রশাসনে গোপালের পত্নীকে চন্দ্র, অগ্নি, কুবের, ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পত্নীদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে

খালিমপুর তাম্রশাসন

গোপাল ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, কুবের প্রভৃতি দেবতার ন্যায় ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন, একথা অনুমান করা ভুল হইবে না। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনে গোপালের রাজ্য 'সমুদ্র পর্যন্ত' বিস্তৃত ছিল একথা উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নহে। যাহা হউক গোপাল বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দূর করিয়া বঙ্গ রাজ্যকে সংহতি দান করিয়াছিলেন একথা অনায়াসে স্বীকার করা যায়। গোপাল ঠিক কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না।* মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বকাল শেষ হইয়াছিল।

গোপাল কর্তৃক শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন

ধর্মপাল, ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ (Dharmapala) : গোপালের পুত্র ধর্মপাল আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলেই বাংলার পাল রাজ্য উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিল। তিনি বাংলাদেশকে উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের রচনায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মপাল উত্তরে বঙ্গোপসাগর হইতে জলন্ধর, দিল্লী প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কনৌজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং কনৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে (বা ইন্দ্রায়ুধ) পরাজিত করিয়া কনৌজের সিংহাসনে নিজ মনোনীত প্রার্থী চক্রায়ুধকে স্থাপন করিয়াছিলেন। খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, অবন্তী, গন্ধার প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণ ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন সমর্থন করিয়াছিলেন। চক্রায়ুধের সিংহাসনে আরোহণকালে এই সকল রাজা উপস্থিত ছিলেন, একথা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মপাল উত্তর-ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জনৈক গুজরাটী কবি ধর্মপালকে 'উত্তরাপথস্বামী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাংলা ও বিহার ছিল ধর্মপালের সরাসরি শাসনাধীনে ; কিন্তু উত্তর-ভারতের কনৌজ ও উহার নিকটবর্তী অপরাপর বহু দেশ ধর্মপালের আনুগত্যাধীনে ছিল। ধর্মপাল বাংলাদেশকে একটি সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। তিনি 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। অল্পকালের মধ্যেই প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া কনৌজ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নাগভট্টের হস্তে ধর্মপাল পরাজিত হইয়াছিলেন মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় নাগভট্ট স্বয়ং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয়

ধর্মপালের সাম্রাজ্যের সীমা

কনৌজের উপর প্রাধান্য

'পরমেশ্বর পরমভট্টারক' উপাধি ধারণ

দ্বিতীয় নাগভট্টের হস্তে পরাজয়

* Vide : *History of Bengal* (D. U.) Vol I, P. 103.

গোবিন্দের হস্তে পরাজিত হওয়ায় ধর্মপালের সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই বলিয়াই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

ধর্মপালের ব্যক্তিগত প্রতিভা

ধর্মপাল যে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। পিতার নিকট হইতে তিনি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যের সিংহাসন উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সাহায্যে তিনি সেই ক্ষুদ্র রাজ্যকে সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।

বিক্রমশীলা মহাবিহার বা বিশ্ববিত্থালয়

ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আদেশে মগধে বিক্রমশীলা মহাবিহার বা বিশ্ববিত্থালয় নির্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, সে-সময়কার শিল্পী ধীমান ও বীতপাল এই মহাবিহারের নির্মাণ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছয়টি মহাবিত্থালয়-সমন্বিত এই মহাবিহারটির ব্যয় নির্বাহের জন্য ধর্মপাল প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। মহাবিহারের সংলগ্ন একটি উচ্চ সমতলখণ্ডে একই সঙ্গে আট হাজার লোক বসিবার ব্যবস্থা ছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারে তিন হাজার বিত্থার্থী অধ্যয়ন করিত। এই মহাবিহারের মধ্যস্থলে একটি মন্দির ছিল এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে মোট ১০৭টি ছোট ছোট মন্দির ছিল। এখানে ছয়টি মহাবিত্থালয়ে মোট ১৪৪ জন অধ্যাপক ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করিতেন। নেপাল ও তিব্বত হইতে বহু বিত্থার্থী এই মহাবিহারে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে যোগদান করিত। এই মহাবিহার বা বিশ্ববিত্থালয়ে তন্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত। এই বিশ্ববিত্থালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে রত্নাকর শান্তি, আচার্য শ্রীধর, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, অভয়াকরগুপ্ত, শুভাকরগুপ্ত, অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, রত্নবজ্র প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আচার্যগণ রাজার নিকট হইতে 'পণ্ডিত' উপাধিলাভ করিতেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের প্রতিকৃতি বিশ্ববিত্থালয়ের গৃহের প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত থাকিত। এই বিশ্ববিত্থালয়টি মোট চারিশত বৎসর উহার কীর্তি ও যশঃ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মপাল ওদন্তপুরী মহাবিহারটিও স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর অনেকের মতে উহা গোপাল ও দেবপাল কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

ওদন্তপুরী মহাবিহার

ওদন্তপুরী মহাবিহার বা বিশ্ববিত্থালয়ে দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সুযোগ ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনার কেন্দ্র হিসাবেই ওদন্তপুরী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। মেধাবী বিত্থার্থীদিগের নিকট হইতে কোনপ্রকার দক্ষিণা না লইয়াই এই মহাবিহারে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হইত। অতীশ দীপঙ্কর এই বিশ্ববিত্থালয়েই বিত্থাভ্যাস করিয়া 'শ্রীজ্ঞান' উপাধিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতরাজের অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার ও প্রচারার্থে তিব্বত গিয়াছিলেন।

সোমপুরী মহাবিহার

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে ধর্মপাল সোমপুরী মহাবিহার

স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কয়েকটি সীলমোহর হইতে জানা গিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে এই মহাবিহারটির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধ-সাহিত্যিক হরিভদ্র ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় সমগ্র রাজত্বকাল যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত করিলেও ধর্মপাল ধর্ম-বিষয়ক ও শান্তিমূলক কার্যাদিতেও অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই, ইহা তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হইলেও ধর্মপাল পরধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। হিন্দু দেবতার উপাসনার ব্যয়-সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে তিনি জমি দান করিয়াছিলেন, এই প্রমাণও পাওয়া যায়।

মন্তব্য

দেবপাল, ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ (Devapala): দেবপাল পিতা ধর্মপালের ন্যায়ই ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাল সাম্রাজ্যের বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি উৎকল, হূণ, গুর্জর ও দ্রাবিড়দের সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক লিপিতে উল্লিখিত আছে। উৎকলের রাজা জয়পাল দেবপালের সামরিক অভিযানের সংবাদ পাইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা বিনা যুদ্ধে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দেবপাল উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সামরিক অভিযান



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ

দেবপাল দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আমলে সাম্রাজ্যের গৌরব চরমে পৌঁছিয়াছিল। আসাম হইতে কাশ্মীরের সীমা, হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। দেবপালের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া সুবর্ণভূমি—অর্থাৎ সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সেই অঞ্চলের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া দেবপালের

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

বালপুত্রদেবের দূত প্রেরণ

নিকট এক রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বহির্দেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ মাত্রেরই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানা ছিল। দেবপাল বালপুত্রদেবের অনুরোধ অনুযায়ী পাঁচখানি গ্রাম তাঁহাকে দিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দেবপালের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। নগরহার (জালালাবাদ) নামক স্থানের ইন্দ্রগুপ্ত নামে জনৈক বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা

সপ্তম অধ্যায়

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি

(Society and Culture from the 4th Century B. C. to 14th Century A. D.)

সমাজ (Society): খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। চারি বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি ভাগে সমাজ বিভক্ত ছিল। বৈদিক যুগে জীবনযাত্রা যেমন চতুরাশ্রম—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি ভাগে বিভক্ত ছিল সেরূপ চতুরাশ্রমের উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস অবশ্য ভারতীয় সমাজকে সাতটি ভাগে ভাগ করিয়া এগুলিকে সাতটি জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেরূপ সাতটি জাতি তখন ছিল না। এগুলি ছিল বৃত্তি অনুসারে সমাজের সাতটি ভাগ। মেগাস্থিনিস এই বৃত্তিমূলক ভাগকেই 'জাতি' বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

সমাজের চারি ভাগ: চারি বর্ণ ও চতুরাশ্রম

জীবনের চারিটি আশ্রমেই কতকগুলি সদাচারের কথা কৌটিল্য উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বজীবে অহিংসা, সত্যবাদিতা, শুচিতা, অপরের গুণগ্রাহীতা, সহিষ্ণুতা এবং ঈর্ষা-পরায়ণতা ও নৃশংসতা ত্যাগ করা ছিল অবশ্যপালনীয় আদর্শ। সহজ ও সরল জীবন যাপন এবং উন্নত ধরনের চিন্তা করা (plain living and high thinking) ছিল সমাজ-জীবনের আদর্শ। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীনতা, আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কার্যকলাপে মনোযোগ, নির্ভীকতা, মৃত্যুভয়-শূণ্যতা প্রভৃতিও সেই সময়কার অনুসরণীয় আদর্শ ছিল। সম্রাট অশোকের কাল হইতে শুরু করিয়া আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত এই সকল আদর্শ ভারতীয়দের জীবনাদর্শ রূপে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে।

সমাজ-জীবনাদর্শ

পরিবার সমাজের ভিত্তি

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এবং পরবর্তী কালেও পরিবারই ছিল সমাজের মূল ভিত্তি। যৌথ পরিবার প্রথা প্রাচীন যুগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অতি আধুনিক কালে অবশ্য যৌথ পরিবার প্রথা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। অবশ্য সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান ছিল উচ্চে। বৈদিক যুগ ও উহার পরবর্তী কালে স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা লাভ, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। উচ্চ শিক্ষা ভিন্ন সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতিতেও স্ত্রীজাতির পারদর্শিতার কথা উল্লিখিত আছে। মৌর্য যুগে স্ত্রীলোক-প্রহরীরা রাজার দেহরক্ষীর কাজ করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির শাসনকার্যে অংশগ্রহণেরও প্রমাণ পাওয়া যায়। মেগাস্থিনিস দক্ষিণ-ভারতের পাণ্ড্য জাতির শাসনকার্য স্ত্রীজাতি দ্বারা পরিচালিত হইত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। ক্রীতদাসদের প্রতি উদার ব্যবহার করা হইত। মেগাস্থিনিস সেই সময়কার ভারতীয় সমাজে মিতব্যয়িতা, শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয়গণ তখন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিত।

মৌর্যোত্তর যুগ

মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে বাহ্লিক, পহ্লব, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির লোক ভারতে প্রবেশ করিবার ফলে চতুর্বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কে কতক পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। তখনকার ভারতীয় সমাজ ছিল অত্যন্ত উদার। পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা তখন ভারতীয় সমাজের ছিল। বাহ্লিক, পহ্লব, শক প্রভৃতি বিদেশী জাতির লোককে ভারতীয় সমাজ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। সাতবাহন আমলের ঐতিহাসিক তথ্য হইতে জানা যায় যে, সাতবাহন রাজপরিবারের সহিত বিদেশী রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে সমাজের চারি বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি ভাগ বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মনুর ধর্মশাস্ত্রে যবন, শক, পহ্লব প্রভৃতি জাতিকে 'নীচ-ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তখনকার সমাজে 'নীচ-জাতি' নামেও নূতন নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

নূতন নূতন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

মনুর ধর্মশাস্ত্র: জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা

গুপ্ত আমলের প্রারম্ভে মনুর ধর্মশাস্ত্র চতুর্বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভাগকে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ করে। এই শ্রেণীবিভাগ জাতিভেদ প্রথায় রূপান্তরিত হয়। প্রথমে অবশ্য উচ্চতর জাতির পুরুষ অপেক্ষাকৃত নীচ জাতির স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলে জাতিভ্রষ্ট হইত না। কিন্তু ক্রমে ইহাও নিষিদ্ধ হইয়া যায়। মনু তাঁহার ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহারের যে সঙ্কীর্ণ নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা বহুলাংশে অনুসৃত হওয়ায় পূর্বে স্ত্রীজাতির প্রতি যে উদার ব্যবহার ভারতীয় সমাজে করা হইত

তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারিণী হইলেও স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল। সমাজ-জীবনাদর্শ পূর্বের মতই সত্যবাদিতা, সংযম, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গুণের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সমাজ তখন পিতৃতান্ত্রিক ছিল—অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই ছিলেন পরিবারের কর্তা। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ও তাঁহার আদেশ পরিবারস্থ অপরাপর সকলকে মানিয়া চলিতে হইত। দক্ষিণ-ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজও বিদ্যমান ছিল। সেইখানে বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকই ছিলেন পরিবারের কর্ত্রী।

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ

গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকাল এবং উহার পরবর্তী যুগে ভারতীয় সামাজিক অবস্থার দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন বর্ণ, অর্থাৎ জাতির নির্ধারিত বৃত্তি অনুসরণ আর তখন আবশ্যিক ছিল না। বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের বা জাতির লোকগণকে যেমন বড় বড় রাজ্যের রাজা হিসাবে শাসন করিতে দেখা যায়, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ জাতির লোকগণকে ব্যবসায়ীর বৃত্তি গ্রহণে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের স্ত্রীলোককে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে এবং রাজ-মহিষীকে রাজার সহিত সম-মর্যাদার আসন গ্রহণ করিতে দেখা যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে গুপ্ত যুগের সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের কথা জানিতে পারা যায়। অতিথির প্রতি সেবা-পরায়ণতা, বিবাদ-বিসংবাদ ও মামলা-মকদ্দমা হইতে নিরস্ত থাকা, প্রভৃতি সদ্‌গুণ সেই সময়কার ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন। চুরি, মিথ্যাবাদিতা, অসদ্ব্যবহার তখনকার ভারতীয়দের জানা ছিল না।

গুপ্ত যুগ ও পরবর্তী যুগের ভারতীয় সমাজ

বাংলাদেশের পাল ও সেন যুগে সমাজের চারি জাতি বিদ্যমান ছিল। তদুপরি আরও বহু শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীর উদ্ভব তখন ঘটিয়াছিল। বিভিন্ন জাতির লোকের সংমিশ্রণে বহু সঙ্কর শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়াতে সেই যুগের বাঙালী সমাজ আধুনিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। বৈদ্য, কায়স্থ, সৎ-শূদ্র বা গন্ধবণিক, মোদক প্রভৃতি নূতন নূতন শ্রেণী পাল ও সেন যুগ হইতে শুরু হইয়াছিল। সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করিয়া হিন্দু সমাজকে নূতনভাবে গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করিয়া বিবাহ, সামাজিক আচার-আচরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কতকগুলি বাঁধা-ধরা নিয়ম ও রীতি মানিয়া চলিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন।

পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজব্যবস্থা

মুসলমান আক্রমণের পূর্বাবধি যে-সকল বহিরাগত জাতি ভারতে বসবাস শুরু করিয়াছিল তাহাদের সকলেই হিন্দু সমাজের অংশরূপে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন হিন্দু সমাজের উদারতা এবং পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতার ফলেই এরূপ ঘটিয়াছিল, বলা বাহুল্য। মুসলমান আক্রমণকারীদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ভারতে প্রবেশকারী মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ এবং সে সম্পর্কে তাহাদের সচেতনতা, মুসলমান আক্রমণকালে ভারতীয়দের

উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং ধর্মোন্মত্ত ব্যবহার মুসলমান ও হিন্দু সমাজের সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতের অ-মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ ছিল 'যবন' এবং মুসলমানদের কাছে অ-মুসলমানগণ ছিল 'জিম্মি'। এই সকল কারণে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজে নানা প্রকার কঠোর বিধি-নিষেধ চালু করা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। মুসলমান সমাজের ন্যায় হিন্দু সমাজেও পর্দা প্রথার প্রচলন শুরু হয়। এই যুগে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা অত্যধিক মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছিল।

মুসলমান আমলে সমাজ

কিন্তু মুসলমানদের আগমনে ভারতীয় সমাজে এক নূতন শ্রেণীর সূত্রপাত ঘটে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে এই দুই শ্রেণী, অর্থাৎ হিন্দু তথা অ-মুসলমান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক প্রভাব ও যোগাযোগ উভয় সমাজেরই আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। একটি অপরটির প্রভাবে প্রভাবিত হয়। পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে এক নূতন ধারার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই এই ধারণা হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যেই জাগিয়া উঠে। পরস্পর পরস্পরের সহিত এই ঐক্যবোধ সেই সময়কার ভক্তিবাদ ও সুফী ধর্মমতের প্রসারে পরিলক্ষিত হয়। উভয় ধর্মমতেই ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে ভগবান প্রাপ্তি এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃভাবের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের ধর্মমতের উদারতা হিন্দু সমাজে সেই সময়ে যে সঙ্কীর্ণতা দেখা দিয়াছিল তাহা বহুলাংশে দূর করিয়া সমাজ-সংস্কারের কাজ করিয়াছিল।

মুসলমান আমলে সমাজ : হিন্দু-মুসলমান সমাজে পারস্পরিক প্রভাব

সংস্কৃতি (Culture) : খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রীক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। আলেকজাণ্ডারের ভারত-আক্রমণের সূত্র ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতের সহিত যে সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার ফলাফল পরবর্তী কালে গ্রীক ও রোমান শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

মৌর্য যুগের সংস্কৃতি

ভারতীয় বিজ্ঞান, মুদ্রা নীতির উপর যেমন গ্রীক ও রোমান প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল সেইরূপ ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারকে প্রভাবিত করিয়াছিল। মৌর্য যুগের শিল্পকলার উৎকর্ষের কথা সেই যুগের কয়েক শতক পর চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায়। মৌর্য প্রাসাদের নির্মাণকৌশল দেখিয়া ফা-হিয়েন বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। সেই যুগের নির্মিত গুহা, স্তম্ভশীর্ষে পশুমূর্তির নিখুঁত গঠন ও আলঙ্কারিক কারুকার্য সে-যুগের ভাস্কর্য শিল্পে উৎকর্ষের পরিচয় আজিও বহন করিতেছে।

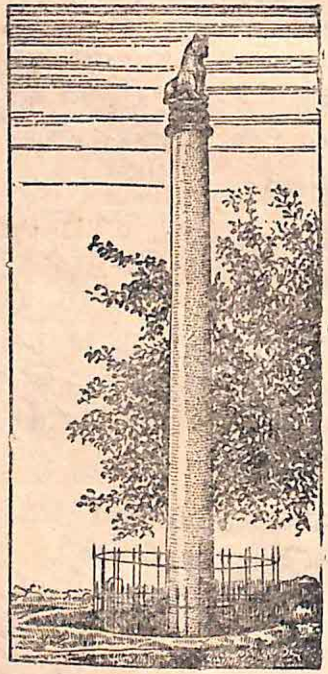
প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পারস্পরিক সংস্কৃতির প্রভাব

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও বহিরাগত আক্রমণে ভারতীয় ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ কালের স্থচনা হইয়াছিল। কিন্তু এক স্থত্রে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতির ভারত-প্রবেশের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের স্থযোগ ঘটিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্য ও চীন সাম্রাজ্যের সহিতও সেই যুগে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই স্থত্রে যে বিরাট সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল তাহার ফল সে-যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ, ধর্মের প্রসার, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতিতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাব



অশোক স্তম্ভশীর্ষ



অশোক স্তম্ভ

কুষাণ আমলে গন্ধার শিল্প গ্রীক, রোমান ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক দেবতাদের প্রতিকৃতির অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে এই সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, গন্ধার শিল্পে বৈদেশিক শিল্পরীতির প্রভাব কতকটা অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। বস্তুত, গন্ধার শিল্প-নিদর্শনগুলিতে প্রধানত ভারতীয় শিল্পী মনেরই অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে অমরাবতী উপত্যকায় বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অমরাবতীতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-পদক এবং মথুরায় প্রাপ্ত কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

কুষাণ আমলের শিল্প

পুরুষপুরে কণিষ্ক-নির্মিত চৈত্য, সাঁচী স্তূপের তোরণদ্বারের আলঙ্কারিক কারুকার্য, কান্‌হেরি, নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের গুহাচৈত্য, বরহুত বা ভারুত, ভাজা, বুদ্ধগয়ার মঠ প্রভৃতি সেই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।



কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি

সাহিত্য

সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে কুষাণ যুগে নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অশ্বঘোষ-রচিত 'বুদ্ধ-চরিত', 'সৌন্দরনন্দ', 'সূত্রালঙ্কার'(?),'বজ্রসূচী' প্রভৃতি; নাগসেন-রচিত 'মিলিন্দপঞ্‌হো; নাগার্জুন-রচিত 'মাধ্যমিক সূত্র' বা 'মধ্যমক কারিকা' ও 'সুহৃল্লেখ'; বসুমিত্র-রচিত 'মহাবিভাষা'; গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'; আর্যশূরের 'চর্যা-পিটক' প্রভৃতি সেই যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চরকের 'চরক সংহিতা', সুশ্রুতের 'সুশ্রুত সংহিতা', কাত্যায়নের 'বিভাষা', পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' প্রভৃতিও সে-যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা। 'রামায়ণ-মহাভারত', বাৎসায়নের 'কামসূত্র', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', যাজ্ঞবল্ক্যের 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি', মনুর 'মনু-সংহিতা' প্রভৃতি সে-যুগেই সঙ্কলিত হয়।

শিক্ষা

তক্ষশিলা সেই যুগে বিদ্যা শিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

গুপ্ত যুগ

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত-ইতিহাসে গুপ্ত যুগকে এক স্বর্ণ যুগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বস্তুত, এই যুগের ব্যাপক উৎকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে গুপ্ত যুগকে স্বর্ণ যুগ হিসাবে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত। এই উৎকর্ষ শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, শিল্পকলা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগ

গুপ্ত যুগের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পশ্চাতে দীর্ঘকালের বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগ এবং গুপ্ত শাসনব্যবস্থার দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন কাল হইতে বহির্জগতের সহিত ভারতের যে যোগাযোগ হইয়াছিল উহা মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই যোগাযোগের ফলে যে নূতন সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল উহার পরোক্ষ

ফল দেখা গেল গুপ্ত যুগের বলিষ্ঠ সৃজনী শক্তিতে। সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাহা পরিলক্ষিত হইল। রাজনৈতিক শান্তি এই সৃজনী শক্তির প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

সুবর্ণ যুগের আলোচনায় গুপ্তরাজগণের সুদক্ষ, পরধর্মসহিষ্ণু শাসনব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, এই দক্ষতা ও উদারতার ফলেই সুবর্ণ যুগের রচনা সম্ভব হইয়াছিল। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় গুপ্ত যুগের শাসনব্যবস্থার দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল বলিয়াই সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুপ্ত-রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা প্রভৃতি

সাহিত্য

অমর কাব্য এবং নাট্যগ্রন্থ-রচয়িতা কালিদাস, বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু এবং শূদ্রক, বিশাখদত্ত, হরিষেণ প্রভৃতি বিদ্বান মনীষী সে-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাস, শূদ্রক, অমর, বিশাখদত্ত, বসুবন্ধু প্রভৃতি মনীষীর সাহিত্য-সেবায় সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার বহু গুণে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এই যুগকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথের যুগ এবং গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে।

গুপ্ত যুগে সঙ্গীতশাস্ত্রেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত নিজেও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বীণাবাদনরত মুদ্রার

সঙ্গীতশাস্ত্র

প্রতিকৃতি হইতে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—যথা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিতে গুপ্ত যুগ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। আর্যভট্ট ছিলেন গুপ্ত আমলের শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্র-বিশারদ। বরাহমিহির ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্। কাহিনী-কিংবদন্তীর নবরত্নের সকলেই বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উপস্থিত

বিজ্ঞান

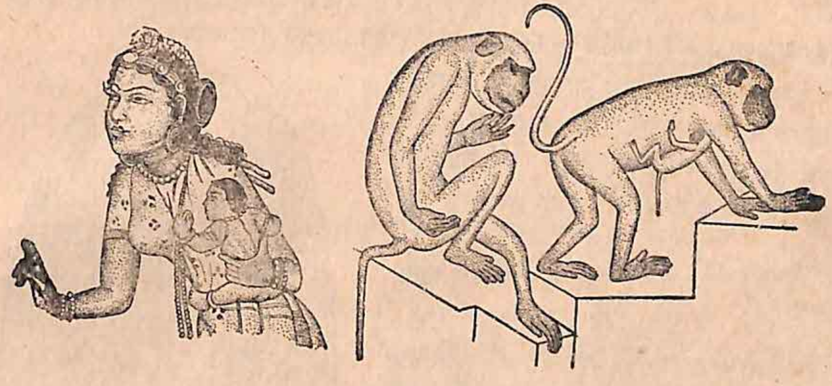
ছিলেন কি না সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে এই সকল মনীষীর অনেকে গুপ্ত যুগের বিভিন্ন কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা মনে করা ভুল হইবে না। গুপ্ত যুগের চিকিৎসাশাস্ত্র অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অস্ত্রোপচার সে-যুগে জানা ছিল। ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান আরব, পারস্য, গ্রীস প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

ধর্মের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগের পরধর্মসহিষ্ণুতা গুপ্ত শাসনব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে। গুপ্তরাজগণ নিজেরা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা নিজেদের উন্নত মনের পরিচয় দিয়াছিলেন। গুপ্ত যুগে বিষ্ণু, শিব ও বুদ্ধ এই তিনের উপাসনারই ব্যাপক প্রচলন ছিল।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

গুপ্ত যুগে ভাগবত ধর্মের প্রাধান্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক 'পরম ভাগবত' উপাধি ধারণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পূর্ণ-মাত্রায় সহিষ্ণুতা প্রদর্শিত হইলেও উহার অবনতির সূত্রপাত হইতে থাকে।

গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগের শিল্প নিদর্শনের প্রায় সবকিছুই মুসলমান আক্রমণকালে



অজন্তার চিত্র



চৈত্য গৃহ (অজন্তা)



অজন্তার দেওয়াল চিত্র

বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেওগড় (উত্তরপ্রদেশ) ও ভিটারগাঁওয়ে আবিষ্কৃত দুইটি মন্দির হইতে গুপ্ত যুগের স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায়। স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম ও অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখা যায় সে-যুগে নির্মিত অজন্তার গুহাগুলিতে। কয়েকটি গুহা গুপ্ত যুগে নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলির দেওয়ালের মসৃণতা আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই সকল গুহার দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র সে-যুগের চিত্রশিল্প উৎকর্ষের অপূর্ব নিদর্শন। গুপ্ত যুগের দেবদেবীর মূর্তি, পশু-মূর্তি ও বৃক্ষলতাদি সে-যুগের ভাস্কর্য ও আলঙ্কারিক শিল্পকৌশলের পরিচয় বহন করে। বরহুত, সাঁচী, মথুরা ও

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প

চিত্রশিল্প

সারনাথে সে-যুগের ভাস্কর্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গুপ্ত যুগে নির্মিত চন্দ্ররাজ্যের লৌহস্তম্ভ ঐ যুগে ধাতুশিল্পের উন্নতির নিদর্শনস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। গুপ্ত যুগের মুদ্রা এবং নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্র-নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তিও সে-যুগের ধাতুশিল্পের নিদর্শন বহন করে।

ধাতুশিল্প

পরবর্তী কালে পাল সাম্রাজ্যের আমলে উত্তর-ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। পাল যুগে সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের এক অভূত-পূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়া-ছিল। পাল বংশের রাজাগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ও দন্তপুরী, বিক্রমশীলা ও সোমপুরী মহাবিহারগুলি নির্মিত হইয়াছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারে মোট ১০৭টি মন্দির ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (কলেজ) ছিল। পাল যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পুনরায় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এই সকল মঠের নির্মাণ-পদ্ধতি সে-যুগের স্থাপত্য কৌশলের পরিচায়ক। সোমপুরী মহা-বিহারের ভগ্নাবশেষ রাজসাহী জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে-যুগের স্তূপ, মঠ ও মন্দিরের নির্মাণকৌশল ছিল বিভিন্ন ধরনের। পাল যুগে নির্মিত কয়েকটি মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির গড়ন দৃষ্টে পাল যুগের ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের ধারণা লাভ করা যায়। ধীমান এবং তাঁহার পুত্র বীতপাল ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, চিত্রশিল্পী ও ধাতুমূর্তি-নির্মাতা। তাঁহাদের শিল্পকৌশলের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান।

পাল যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প



পাল যুগের ভাস্কর্য নিদর্শন

ধীমান ও বীতপাল

পাল যুগ শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পাল যুগের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ চক্রপাণি দত্ত, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রভৃতি তাঁহাদের রচনার দ্বারা সে-যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় আদি রচনা বৌদ্ধ চর্যাপদ পাল যুগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। ঐ যুগের বহু বাঙালী মনীষী বাংলাদেশের বাহিরে বিভিন্ন দেশের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সুমাত্রা অঞ্চলের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের কুলগুরু ছিলেন বাঙালী পণ্ডিত কুমার ঘোষ। নানা বিষয়ে শিক্ষার্জনের জন্য বাঙালী শিক্ষার্থীদের ভারতের অপরাপর স্থানে যাইবার প্রমাণ পাওয়া

সাহিত্যসেবিগণ

যায়। কাশ্মীরে বহু বাঙালী শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে যাইবার কথাও জানা যায়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া বাংলাদেশ সেই যুগে এশিয়া মহাদেশের এক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। বাংলাদেশের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব ব্রহ্মদেশ, নেপাল, তিব্বত, যবদ্বীপ তথা সুবর্ণভূমি, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্তি হইতে নানা প্রকার পণ্যদ্রব্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র প্রেরিত হইত। বাঙালী

বহির্জগতের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

আচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আচার্য শীলভদ্রের নিকট ওদন্তপুরী মহাবিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ধর্মমত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয়ের আচার্য নিযুক্ত হন। পরে তিনি তিব্বতের রাজার অনুরোধে তথাকার বৌদ্ধ ধর্মের ত্রুটি সংশোধন ও ব্যাপক প্রচারের জন্য তিব্বত গিয়াছিলেন।

অতীশ দীপঙ্কর



অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

সেনবংশীয় রাজাগণও শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বল্লাল সেন 'আচার্যসাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর', 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে চারিখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অদ্ভুতসাগর গ্রন্থখানি সম্ভবত তিনি নিজে শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতী পুত্র লক্ষ্মণ সেন উহার অসম্পূর্ণ অংশ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে শেষোক্ত দুইখানি এখনও বিদ্যমান। বল্লাল সেনের গুরুদেব অনিরুদ্ধ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

সেন যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি

গুণবিষ্ণু, ধোয়ী, জয়দেব, হলায়ুধ, উমাপতিধর, ঈশান, পশুপতি প্রভৃতি ছিলেন সে-যুগের বিদ্বান মনীষী। ধোয়ী-রচিত 'পবনদূত' এবং জয়দেবের 'পদাবলী' তদানীন্তন সাহিত্য ভাণ্ডারের অপূর্ব রত্নস্বরূপ।

ধোয়ী, জয়দেব প্রভৃতি

সেন বংশের রাজাগণ ছিলেন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এই ধর্ম-প্রচারের জন্য তাঁহারা চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম

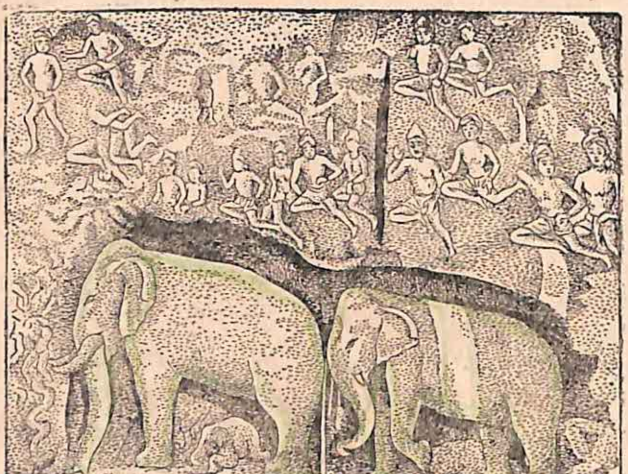
সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন শূলপানি। পালবংশীয় রাজাগণের আমলে বাঙালী মনীষার যে প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল উহা সেন যুগেও অব্যাহত ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি—

শিল্প

সর্বক্ষেত্রে পাল ও সেনবংশীয় রাজাগণের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল যুগ, বলা বাহুল্য।

স্থাপত্য শিল্প

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তী ছয়শত বৎসর, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ১২০০ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প স্থাপত্য শিল্পের মধ্যেই প্রধানত নিবদ্ধ ছিল। এই শিল্পরীতি উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয়—এই প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই দুই শিল্পরীতিতে নির্মাণকৌশলের পার্থক্য ছিল। দেব-দেবীর মন্দিরই ছিল সেই সময়ের প্রধান স্থাপত্য শিল্পকার্য। উত্তর-ভারতের মন্দিরগুলির চূড়া বা শিখর ছিল দেখিতে কতকটা কলসীর ন্যায় এবং উহার উপরিভাগ ছুঁচালো। পক্ষান্তরে দক্ষিণ-ভারতীয় শিখর ছিল ধাপে ধাপে পিরামিডের ন্যায় নির্মিত। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দির, মধ্য-ভারতের খাজুরাহো মন্দির, রাজস্থানের দিলওয়ারা মন্দির এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।



পর্বতগাত্রে খোদিত শিল্পকার্য (মহাবলীপুরম)

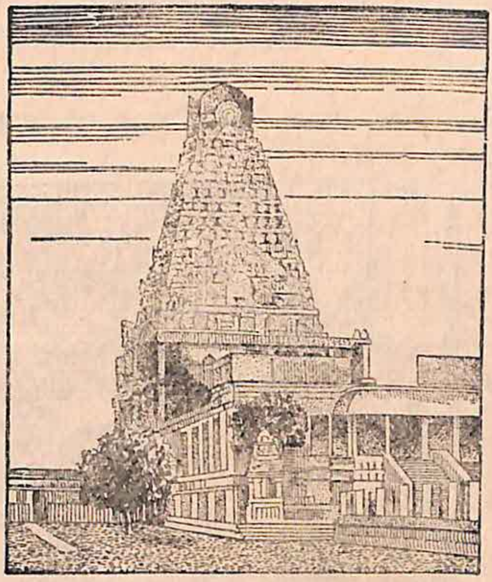
উত্তর-ভারতের স্থাপত্যরীতি

ভুবনেশ্বরের রাজরাণী মন্দির, লিঙ্গরাজের মন্দির, কোণারকের সূর্য মন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, খাজুরাহোর মহাদেব মন্দির প্রভৃতি সেই যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে আজিও সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। রাজস্থানের মাউণ্ট আবুতে দিলওয়ারা মন্দিরের নির্মাণকৌশল, উহার স্তম্ভ ও ছাদের কারুকার্য অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। তেজপাল মন্দিরও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ-ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প সেই যুগে এক অত্যাশ্চর্য শিল্পকীর্তি। দক্ষিণ-ভারতের শিল্পকলা পল্লব রাজত্বকাল হইতে শুরু হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

এখানে দ্রাবিড় শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কাঞ্চী নগরের মন্দিরসমূহ, মহাবলীপুরম বা মামল্লপুরমে পাথরের পাহাড় কাটিয়া নির্মিত রথ আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। এই স্থানে সাতটি রথ—ধর্মরাজরথ, ভীমরথ, দ্রৌপদীরথ প্রভৃতি পাণ্ডবদের নামে নির্মিত হইয়াছে। এগুলি পল্লব শিল্পের অমর কীর্তি হিসাবে আজিও বিদ্যমান।

সুদূর দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য ও শিল্পরীতি



চোল স্থাপত্য শিল্প (তাঞ্জোর)

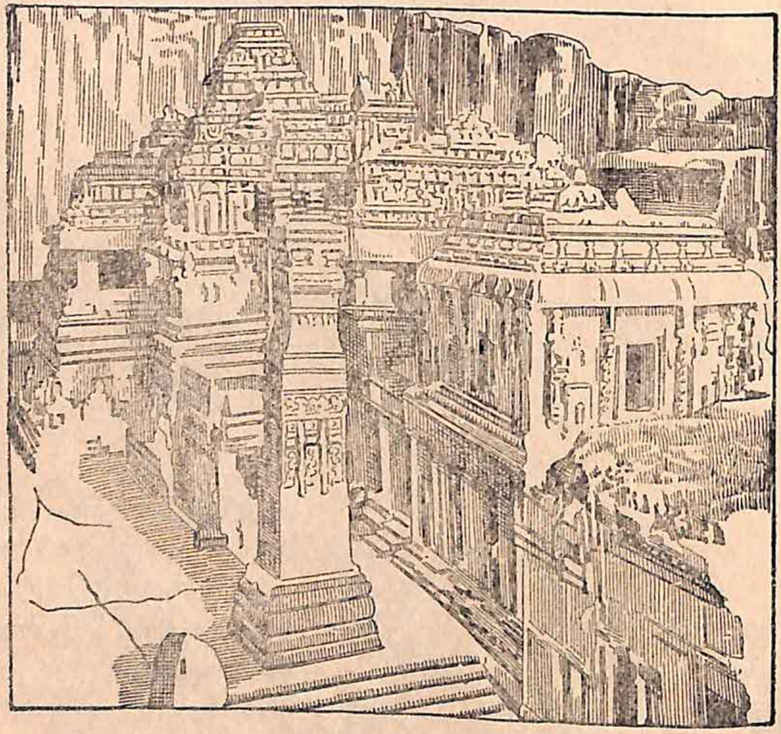
দক্ষিণ-ভারতের গোঙ্গইকোণ্ড চোলপুরমে বৃহদাকার বহু মন্দির রাজেন্দ্র চোল নামক চোল রাজা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই শহরটি তিনি নূতন রাজধানী হিসাবে নির্মাণ করাইয়া তাহাতে একটি অতি সুন্দর রাজপ্রাসাদ নির্মাণ এবং পনর মাইল দীর্ঘ একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। চোল স্থাপত্য শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শিল্পীরা বড় বড় পাথর হইতে মন্দির নির্মাণ করিলেও মণিকারের সূক্ষ্মতা সেই সকল মন্দিরের আলঙ্কারিক কারুকার্যে পরিলক্ষিত হয়। চোল শিল্পে কিছুকাল পরে একটি নূতন রীতি চালু হইয়াছিল। প্রত্যেক মন্দিরের প্রবেশ পথে একটি বিশাল গোপুরম, অর্থাৎ তোরণ নির্মাণ করা হইত। এই সকল তোরণের কারুকার্য ছিল যেমন নিখুঁত তেমনি



নটরাজের মূর্তি (চোল শিল্প)

সুন্দর। কুম্ভকনমের গোপুরম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, রামেশ্বরম এবং অন্যান্য স্থানে নির্মিত সেই যুগের মন্দির এবং সেগুলির স্তম্ভ প্রভৃতি শিল্পকীর্তির বিস্ময় হিসাবে আজিও বিদ্যমান। চোল শিল্পীগণ ধাতু দ্বারা মূর্তি নির্মাণে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। ব্রোঞ্জ-নির্মিত নটরাজের মূর্তি চোল শিল্পিগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দক্ষিণ-ভারতের স্থাপত্য নিদর্শন



ইলোরার কৈলাস মন্দির

দাক্ষিণাত্যের চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট শিল্পের উৎকর্ষের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। চালুক্যদের রাজধানী বাদামী বা বাতাপি নামক স্থানে বহু গুহা-মন্দির সেই যুগে নির্মিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে ইলোরার কৈলাস মন্দির পাথরের পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের সন্নিকটে এলিফ্যান্টা গুহাগুলিও নির্মাণকৌশলের অপূর্ব কীর্তি। পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূটদের ন্যায় হোয়সলরাজগণও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করিয়াছিলেন। দোরসমুদ্রের হোয়সলেশ্বরের মন্দির হোয়সল শিল্পরীতির নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। এই মন্দিরের স্তরে স্তরে হাতী, ঘোড়া ও নানা প্রকার পশুমূর্তি নিখুঁতভাবে খোদাই করা ছিল।

দাক্ষিণাত্যের শিল্প

চিত্রশিল্পেও সেই যুগ সমৃদ্ধ ছিল। কৈলাস মন্দির, বাঘ গুহা, অজন্তার গুহা মন্দির, তাঞ্জোরের শিব মন্দির প্রভৃতির গাত্রে চিত্রশিল্প অত্যন্ত উন্নত ধরনের চিত্রকলার পরিচায়ক। সেই সময়কার পূর্ব-ভারত, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলেও চিত্রশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়।

চিত্রশিল্প

মুসলমানদের আগমন ভারতীয় সমাজের উপর যেমন কতকটা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ভারতীয় সমাজ কর্তৃক তাহারা নিজেরা প্রভাবিত হইয়াছিল, সেরূপ শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই পারস্পরিক প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ভক্তিবাদের উপর রচনা এবং অনুবাদ সাহিত্য ও বিবরণী ছিল তখনকার সাহিত্যকার্যের নিদর্শন। শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দেশীয় চিরাচরিত রীতির সহিত মুসলমানদের নিজস্ব শিল্প ও স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ তখনকার মসজিদ ও অপরাপর স্থাপত্য কার্যে দেখা যায়। (দশম অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।)

হিন্দু মুসলমান শিল্প-রীতির সংমিশ্রণ

অষ্টম অধ্যায়

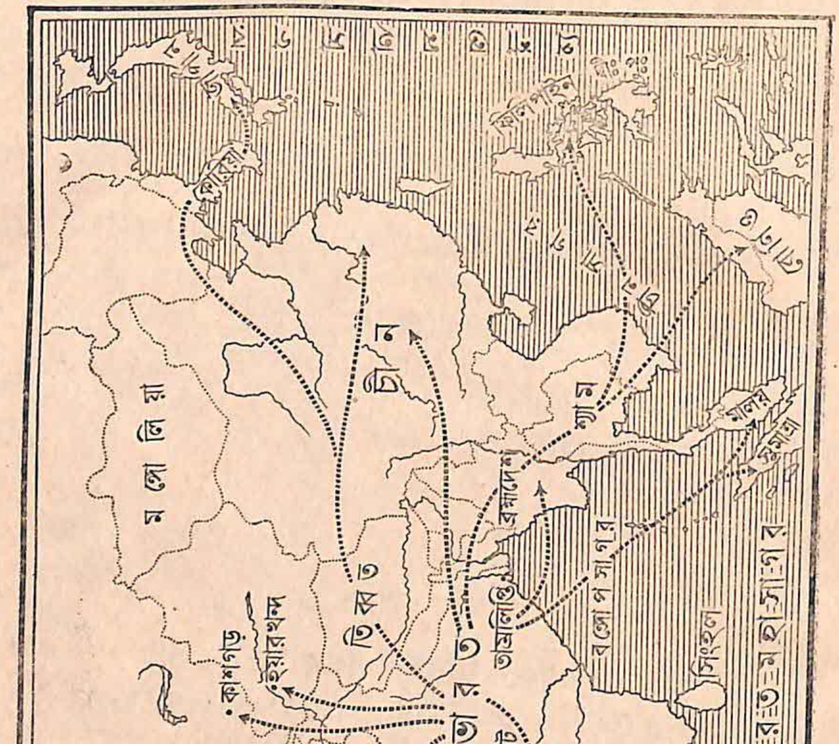
ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি

(Indian Culture and Civilization Outside India)

বহির্জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ (India's Contacts with Outside World) : অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। রোম, মিশর, ব্যাবিলন হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল (বর্তমানে শ্রীলঙ্কা), সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সহিত কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে জনৈক গ্রীক নাবিক জলপথে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'পেরিপ্লাস' (The Periplus of the Erythraean Sea) নামক গ্রন্থে সমসাময়িক ভারতের বন্দরসমূহের এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। ভারতে সেই সময়ে সমুদ্রপথে চলাচলের জন্য বড় বড় বাণিজ্যপোত নির্মিত হইত, সেই কথারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। রোমান ঐতিহাসিক 'প্লিনি'র (Pliny) রচনায়ও পেরিপ্লাস গ্রন্থের বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়।* বাণিজ্যের মাধ্যমে উপরি-উক্ত দেশসমূহের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান স্বভাবতই চলিত। মৌর্য সম্রাট

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য অঞ্চলের সহিত প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

* Vide Majumdar, Raychaudhuri and Datta : *An Advanced History of India* (3rd Edn., 1967), p. 203.


বহির্জগতের সহিত
ভারতের যোগাযোগ
ভারত
আরব
আরব-সাগর
সুরাট
কাবুল
কাশগড়
ইয়ারখন্দ
তিব্বত
চীন
তাম্রলিপ্তি
ব্রহ্মদেশ
শ্যাম
মালয়
সুমাত্রা
সিংহল
বঙ্গোপসাগর
ভারত-মহাসাগর
মঙ্গোলিয়া
কৃষ্ণসাগর

অশোকের ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা এবং সেজন্য বিদেশে দূত প্রেরণ সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার ও যোগাযোগের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ

কুষাণ আমলে কুষাণরাজগণের রাজনৈতিক প্রাধান্য ও ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা মধ্য-এশিয়াকে ভারতীয় উপনিবেশে রূপান্তরিত করিয়াছিল। বর্তমান খোটান অঞ্চলে স্যার অরেল স্টাইনের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে সেই অঞ্চলে যে ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল (শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারতের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপরি-উক্ত দেশসমূহের অনেকগুলি হইতেই বিদ্যার্থীরা বিশেষভাবে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসিতেন। ধর্ম, সংস্কৃতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া যে যোগাযোগ শুরু হইয়াছিল তাহা মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক ও পঞ্চম শতকের অন্তর্বর্তী কালে এই সকল দেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, একথা এই অঞ্চলে প্রাপ্ত সংস্কৃত লিপি ও চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতীয় উপনিবেশ মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ

(১) মধ্য-এশিয়া (Central Asia): (প্রাচীন কাল হইতে মধ্য-এশীয় অঞ্চলসমূহের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব সেই সকল অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল।) কিন্তু কুষাণ যুগে কুষাণরাজগণের মধ্য-এশীয় অঞ্চলের সহিত জন্মগত যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক প্রাধান্যের ফলে কাস্পিয়ান সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের প্রাচীরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। (মধ্য-এশিয়ার খোটান, কুচা, তুর্ফান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ যুগে যে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।) মধ্য-এশিয়ার পথে ভারত পরিভ্রমণে আসিবার কালে এবং সেই পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কালে হিউয়েন সাঙ সেই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। (মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়াই চীনে, চীন হইতে কোরিয়া, এবং কোরিয়া হইতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। স্যার্ অরেল স্টাইন কর্তৃক মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ, বুদ্ধমূর্তি ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে।) এই অঞ্চলে যে ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল সে-সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত।

মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশসমূহ

(স্যার্ অরেল স্টাইন মধ্য-এশিয়ায় খননকার্য সম্পর্কে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত শহরের ধ্বংসাবশেষগুলির মাঝখানে চলাফেরা করিবার কালে একথাই মনে হইয়াছে যে, তিনি কোন প্রাচীন ভারতীয় নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছেন।*) এই সকল অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

স্যার্ অরেল স্টাইনের মন্তব্য

(২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (South-East India): ভারতীয় উপনিবেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চল—অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলেই বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতেই ভারতীয় নামধারী রাজাগণ এই সকল অঞ্চলের কোন কোন অংশে রাজত্ব করিতেছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল ভারতে সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল এবং বহু ভাগ্যবিড়ম্বিত ক্ষত্রিয় রাজকুমার ও বণিক স্বদেশে রাজ্যচ্যুত হইয়া বা পৈতৃক সিংহাসন হইতে বঞ্চিত অথবা সর্বস্বান্ত হইয়া সুবর্ণ দ্বীপে ভাগ্যান্বেষণে যাইবার বহু কাহিনী প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, এই অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশসমূহের ইতিহাস এই সকল দেশে প্রাপ্ত সংস্কৃত লিপি এবং চৈনিক ঐতিহাসিক রচনায় পাওয়া গিয়াছে।

ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তারের অঞ্চলসমূহ: মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি

(দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপদ্বীপ ও দ্বীপগুলিতে স্থাপিত ভারতীয় উপনিবেশগুলি বিশাল রাজ্য হিসাবে শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল। এগুলির মধ্যে কয়েকটি রাজ্য হাজার বৎসরেরও অধিক কাল, এমনকি ভারতে হিন্দুশাসন অবসানের পরও—পরাক্রম বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।(ইন্দো-চীনে চম্পা ও কম্বোজ নামে দুইটি রাজ্য এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান ভিয়েৎনামের প্রায় সমগ্র অঞ্চল (আনাম) লইয়া চম্পা রাজ্যটি গঠিত ছিল।) (খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত চম্পা রাজ্যের রাজাগণ যথেষ্ট পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন।) (কম্বোজ রাজ্যের আক্রমণ এবং মোঙ্গল নেতা কুবলাই খানের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া এই রাজ্যটি নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই রাজ্যের রাজাগণের মধ্যে জয়পরমেশ্বরবর্মন, হরিবর্মন, জয়ইন্দ্রবর্মন, জয়সিংহ-বর্মন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, একদল ভারতীয় বণিক এই রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং

চম্পা রাজ্য

জয়পরমেশ্বরবর্মন, হরিবর্মন, জয়ইন্দ্রবর্মন, জয়সিংহবর্মন—শ্রেষ্ঠ রাজাগণ

---

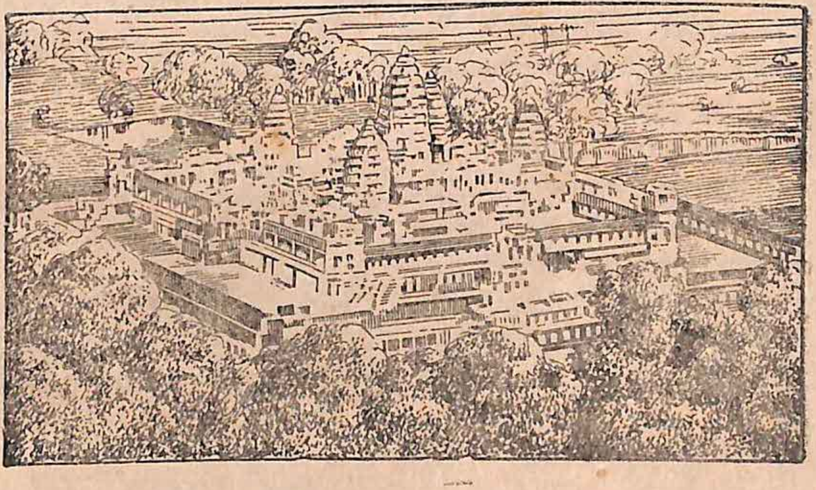
* "Sir Aurel Stein has remarked that whilst he moved in these excavated areas under the ground he could have believed himself to be in the familiar surroundings of an ancient Indian city in the Punjub, so complete was the Indianisation of these out-of-the-way colonies." Vide *An Advanced History of India* (3rd Edn., 1967), p. 204.

তাঁহাদের নিজ অঞ্চলের নাম 'চম্পা'র (বর্তমানে বিহার রাজ্যে অবস্থিত) অনুকরণে এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটির নাম দিয়াছিলেন চম্পা। এই রাজ্যে প্রাপ্ত সে-যুগের বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরসমূহের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় আজিও বহন করিতেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে চম্পা রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

পতন

(ইন্দো-চীনে স্থাপিত অন্যতম হিন্দু ঔপনিবেশিক রাজ্য ছিল কম্বোজ। কাহিনী-কিংবদন্তীতে কোণ্ডিণ্য নামে জনৈক ভারতীয় এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। আবার অপর এক কাহিনীতে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা আদিত্য বংশের পুত্র এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকেই যে এই রাজ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত। চৈনিকগণ এই রাজ্যটির নাম দিয়াছিল ফুনান।) জনৈক চৈনিক ঐতিহাসিকের রচনা হইতে জানা যায় যে, ভারত হইতে আগত সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ এই দেশে বাস করিতেন এবং দিবারাত্র শাস্ত্র-গ্রন্থ অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। (কম্বোজ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজাগণের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম জয়বর্মন, যশোবর্মন, দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।) (এই

কম্বোজ রাজ্য



আঙ্কোরভাটের মন্দির

রাজ্যটি বর্তমান ক্যাম্বোডিয়া, কোচিন-চীন, লাওস, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের একাংশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল।) বহু সংখ্যক সংস্কৃত লিপি হইতে এই রাজ্যের রাজাগণ সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। (ইহা ভিন্ন আঙ্কোরভাট ও আঙ্কোরথোম নামক দুইটি মন্দির কম্বোজ রাজ্যের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।) খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনাম ও থাই জাতির আক্রমণে এই রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

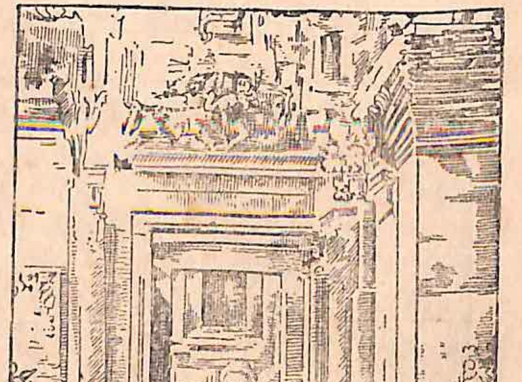
জয়বর্মন, যশোবর্মন, দ্বিতীয় সূর্যবর্মন—শ্রেষ্ঠ রাজাগণ

আঙ্কোরভাট মন্দিরটি মূলত বিষ্ণুর উপাসনার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ২১৩ ফুট উচ্চ, পূর্ব-পশ্চিমে ⅔ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ½ মাইল প্রশস্ত এই মন্দিরটি পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহের অন্যতম সন্দেহ নাই। ৭০০ ফুট চওড়া একটি পরিখা দ্বারা এই নগরটি পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরটির ধাপে ধাপে বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য করা হইয়াছে। শিব, অর্জুন, যম প্রভৃতি দেবতার মূর্তি এই মন্দিরটির গাত্রে খোদিত আছে।

আঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির

কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী ছিল আঙ্কোরথোম। রাজা সপ্তম জয়বর্মন কর্তৃক এই রাজধানীটি স্থাপিত হইয়াছিল। এই নগরটি দুই মাইল দীর্ঘ এবং দুই মাইল প্রশস্ত ছিল। ৩৩০ ফুট চওড়া একটি পরিখা দ্বারা এই নগরটি পরিবেষ্টিত। আঙ্কোরথোম নগরটির কেন্দ্রস্থলে পিরামিড আকারে নির্মিত তিন ধাপযুক্ত বেয়ন মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটিতে প্রায় চল্লিশটি গম্বুজ আছে। প্রত্যেকটি গম্বুজের শীর্ষদেশে একটি করিয়া চতুর্মুখবিশিষ্ট ধ্যানরত মূর্তি আছে। আঙ্কোরথোম শহরে ১০০ ফুট প্রশস্ত পাঁচটি রাজপথ আছে। ইহা ভিন্ন, বহু সংখ্যক প্রাচীর-বেষ্টিত জলাশয় এই নগরের শোভাবর্ধনের জন্য খনন করা হইয়াছিল। আঙ্কোরথোম নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে উহা যে একটি অতি সুন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত নগরী ছিল সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আঙ্কোরথোম—কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী : বেয়ন মন্দির



বেয়ন মন্দির

মালয় উপদ্বীপে একাদিক্রমে দুইটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের অধীনে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি যাবতীয় দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় ঔপনিবেশিক অঞ্চল লইয়া গড়িয়া উঠে। শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাটগণ 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিতেন। আরব বণিকদের বর্ণনা হইতে শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাটগণের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। ভারত ও চীনের রাজাগণও শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাটগণকে যথাযোগ্য সম্মানদানে ত্রুটি করিতেন না। শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট বালপুত্রদেব বাংলার পাল

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য

বংশীয় রাজা দেবপালের অনুমতি গ্রহণ করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মঠ নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে দেবপাল এই মঠের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতাবলম্বী। ধর্মের ব্যাপারে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ বাংলাদেশের সহিত সর্বদা সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। বস্তুত, ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহারা বাংলাদেশের প্রভাবাধীনে ছিলেন। কুমার ঘোষ নামে জনৈক বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণের ধর্মগুরু।

বালপুত্রদেব ও দেবপালের সৌহার্দ্য

শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মগুরু কুমার ঘোষের নির্দেশক্রমে শৈলেন্দ্র সম্রাট তারা মন্দির নামে একটি অতি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বরবুদুরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্তূপটি শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণের আমলে যবদ্বীপে নির্মিত হইয়াছিল। যবদ্বীপ সেই সময়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। বরবুদুরের মন্দিরটির কয়েকটি স্তর ছিল এবং প্রায় ৪০০ × ৪০০ বর্গ ফুট ছিল ইহার মোট আয়তন। এই মন্দিরের স্তরে স্তরে এবং মন্দিরগাত্রে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি ভারতীয় ও যবদ্বীপের ভাস্কর্য শিল্পকলার এক অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। প্রধানত জাতকের বিভিন্ন কাহিনীকে দেওয়ালগাত্রের ভাস্কর্যে রূপদান করা হইয়াছে।

শিল্পকলা : তারা মন্দির, বরবুদুরের মন্দির

শৈলেন্দ্র বংশের রাজাগণের এক বিশাল নৌবাহিনী ছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিবার পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলদেব কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজেন্দ্র চোলদেব শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরই শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজাগণ তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া লন। কিন্তু ইহার পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের গৌরব আর বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমেই স্তিমিত হইতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের জনৈক রাজা সিংহলের বিরুদ্ধে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযান সম্পূর্ণ বিফল হইলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে যবদ্বীপে ভারতীয় হিন্দু উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। কিন্তু শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বীপও শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। নবম শতক পর্যন্ত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবার পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া ক্রমে যবদ্বীপও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। বিজয় নামে জনৈক রাজা ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে তিক্ত-বিল্ব নামক স্থানে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া যবদ্বীপ রাজ্যটিকে শক্তি ও সম্মানের পথে ধাবিত করেন। ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে—অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে, যবদ্বীপ সমগ্র মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লয়। এই রাজ্যের জনৈক স্থানীয় নেতা দেশত্যাগ করিয়া গিয়া মলাক্কা দ্বীপে এক নূতন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মলাক্কার রাজা ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইলে ক্রমে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের আক্রমণে যবদ্বীপের হিন্দু শাসনের অবসান ঘটে এবং

যবদ্বীপ

মলাক্কা

এই রাজ্যে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারিত হয়। সেই সময়ে একদল হিন্দু বলি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখানে একটি হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইস্‌লাম ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও অদ্যাবধি বলি দ্বীপটি হিন্দু ধর্মের অনুরাগী রহিয়াছে।

বলি

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুগণের যে সাহসিকতা, উদ্যমশীলতা ও কর্মপ্রচেষ্টার অভাব ছিল না এবং তাহারা বহির্দেশে উপনিবেশ স্থাপনে পশ্চাদ্‌পদ ছিল না একথা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়।

নবম অধ্যায়

(ক) তুর্কী-আফগান শক্তির উথান, প্রসার ও পতন

(Rise, Growth and Decline of Turco-Afghan Power)

আরবগণ : সিন্ধু-উপত্যকা অঞ্চলে আরব অধিকার স্থাপিত হওয়ার সময় হইতে ভারতে মুসলমানদের আগমন ঘটে। ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রীঃ) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আরব রাজ্য এক দুর্ধর্ষ শক্তি লইয়া চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। অষ্টম শতকের শেষ দিকে ভারতের সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত আরব রাজ্য বিস্তার লাভ করে। সেই সময়ে উত্তর-ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য দূরের কথা, সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। খ্রীষ্টায় নবম শতকে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে কতকগুলি রাজপুত রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যেও সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। এই রাজনৈতিক অনৈক্য উত্তর-ভারতের বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য : আরব অধিকার

সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাজিত করিয়া আরবগণ ক্রমে সমগ্র সিন্ধুদেশ দখল করিল। কিন্তু তাহারা যখন আরও দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা শুরু করিল তখন চালুক্য, গুর্জর-প্রতিহার ও কার্কটদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধিল। এই কারণে এবং বিশেষভাবে আরবদের মধ্যে শিয়া-সুন্নী ধর্ম-দ্বন্দ্বে আরবদের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘুরীর হস্তে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকায় আরব শাসনের শেষ চিহ্নটুকুও লোপ পাইল।

সিন্ধু-উপত্যকায় আরব অধিকারের অবসান

গজনী সুলতানদের ভারত আক্রমণ : ভারতে মুসলমানদের স্থায়ী শাসনের সূত্রপাত হয় দশম শতকের শেষ দিক হইতে। আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে গজনী রাজ্যের সহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহীয়া বংশের রাজা জয়পালের যুদ্ধ বাধে (৯৭৫ খ্রীঃ)। জয়পাল ছিলেন স্বাধীনচেতা রাজা। তাঁহার রাজ্য চিনাব নদী হইতে কাবুলের লঘমান্ নামক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল উদভাণ্ডপুর।

গজনী রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি জয়পালের রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইবে না, এজন্য জয়পাল গজনী রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়পাল সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় আক্রমণও ব্যর্থ হইল। ইহার পর গজনীর সুলতান সবুক্তিগীন একাধিকবার জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া শেষ পর্যন্ত কাবুল এবং উহার নিকটবর্তী অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর সবুক্তিগীন আর ভারত অভিযানে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু তিনি ভারত আক্রমণের যে ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছিলেন পরবর্তী কালে উহা অনুসরণ করিয়াই তাঁহার পুত্র সুলতান মামুদ পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

গজনী কর্তৃক ভারত আক্রমণ

সুলতান মামুদ ঠিক কতবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও তিনি মোট সতর বার আক্রমণ করিয়াছিলেন এই সংখ্যা ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

১৭ বার আক্রমণ

সুলতান মামুদ পিতৃশত্রু জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রু জয়পালের প্রতি অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করায় জয়পাল নিজপুত্র আনন্দপালের হস্তে রাজ্যভার দিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। আনন্দপাল উজ্জয়িনী, কালিঞ্জর, গোয়ালিওর, দিল্লী, কনৌজ, আজমীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজাগণের সাহায্য লইয়া এক সম্মিলিত বাহিনীসহ সুলতান মামুদকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। নিশ্চিত জয়ের মুখে আনন্দপালের হস্তী আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলে আনন্দপালের সেনাবাহিনী আনন্দপাল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন মনে করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিল। সুলতান মামুদ জয়ী হইলেন। ইহার পর নগরকোট, বর্তমান কাংড়া দুর্গ আক্রমণ করিয়া প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেলেন। সুলতান মামুদের অভিযানের মধ্যে মথুরা লুণ্ঠন, কনৌজ লুণ্ঠন এবং সোমনাথের মন্দির আক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সোমনাথের মন্দিরটি অপবিত্র করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থিত দুই কোটি মুদ্রা লইয়া সুলতান মামুদ চলিয়া গেলেন। সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধনরত্ন লুণ্ঠন। ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করা তাঁহার তেমন ইচ্ছা ছিল না। পুনঃ পুনঃ পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করিবার এবং ফিরিয়া যাইবার ফলে সেই অঞ্চলে গজনীর অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। সুলতান মামুদের সভায় সদ্ব্যবহার না পাইয়া সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ মনীষীর অন্যতম অলবিরুণী ভারতে চলিয়া আসিয়া সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার রচিত 'তহ্‌কিক্-ই-হিন্দ, সমসাময়িক কালের ভারতীয় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিন্দু-রীতিনীতি সম্পর্কে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ

ঘুর বংশ : ভারতে স্থায়ী রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ভারত অভিযান করিয়াছিলেন ঘুর রাজ্যের সুলতান গিয়াস-উদ্দিনের ভ্রাতা মহম্মদ ঘুরী। তিনি কাবুল ও গজনী রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে (১১৭৫ খ্রীঃ) তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরব শাসনের অবসান ঘটাইলেন। ইহার পর তিনি ক্রমে

উচ্ ও পেশোয়ার জয় করিলেন। লাহোরও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। রাজপুত জাতি তাঁহার অগ্রগতিতে ভীত সন্ত্রস্ত হইল এবং ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী চৌহান্ বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের রাজ্যাংশ ভাতিন্দা জয় করিলে পৃথ্বীরাজ উত্তর-ভারতের রাজাগণের সাহায্য লইয়া মহম্মদ ঘুরী অধিকৃত ভাতিন্দা পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি মহম্মদ ঘুরীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। কিন্তু পলায়মান শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া মহম্মদ ঘুরীকে শক্তি সঞ্চয় করিবার এবং পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হইবার সুযোগ দিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দু রাজাগণ পরাজিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। মহম্মদ ঘুরী নব-বিজিত ভারতীয় রাজ্যের ভার তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ও ক্রীতদাস কুতব-উদ্দিনের উপর ন্যস্ত করিয়া (১১৯২ খ্রীঃ) স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

মহম্মদ ঘুরীর ভারত বিজয়

দিল্লী সুলতানি : কুতব-উদ্দিন অইবক্ : কুতব-উদ্দিন অইবক্ শাসনভার গ্রহণ করিয়া দিল্লী, অন্‌হিলবার, কনৌজ, গোয়ালিওর প্রভৃতি জয় করিলেন। তিনি তাঁহার সহকর্মী ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খল্‌জীকে বিহার ও বাংলাদেশ জয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন। বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর পুত্র ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ খল্‌জী বিহার জয় করিয়া বাংলাদেশের সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য আক্রমণ করেন। আকস্মিক আক্রমণের প্রতিরোধ অসম্ভব বিবেচনায় লক্ষণ সেন নিজ রাজধানী নদীয়া ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান (১১৯৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১২০২ খ্রীঃ)। ইহার পর ঢাকার নিকট রাজধানী স্থাপন করিয়া তাঁহার বংশধরগণ কিছুকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুতব-উদ্দিন দিল্লীর সুলতান হইয়া বসিলেন। তাঁহার রাজ্য দিল্লী, পাঞ্জাব, বিহার, বাংলাদেশের একাংশ, গুজরাট ও কালিঞ্জর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কুতব-উদ্দিন অইবক্ (১২০৬-১০ খ্রীঃ)

আরাম শাহ্ : ইল্‌তুৎমিস্ : পরবর্তী সুলতান আরাম শাহ্ ছিলেন কুতব-উদ্দিনের পোষ্য পুত্র। তিনি ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমনি আরামপ্রিয়। দিল্লীর আমীর-ওম্‌রাহ্‌গণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কুতব-উদ্দিনের জামাতা ইল্‌তুৎমিস্‌কে সিংহাসনে বসাইলেন। আরাম শাহের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানি প্রায় টলমল করিতেছিল। রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। দিল্লীর আমীর-ওম্‌রাহ্‌দের একাংশ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইল্‌তুৎমিস্‌কে বাধা দিতে শুরু করিয়াছিলেন। ইল্‌তুৎমিস্ কঠোর হস্তে এই সকল ষড়যন্ত্রকারীকে দমন করিয়া এবং রাজ্যের যে-সকল অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া দিল্লী সুলতানিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খাঁ পশ্চিম-এশিয়ার খারিজম রাজ্য আক্রমণ করিলে সেখানকার শাহ্ জালাল-উদ্দিন পাঞ্জাবে উপস্থিত হন। সেই সূত্রে চিঙ্গিজ খাঁর সহিত যাহাতে দিল্লী সুলতানির সংঘর্ষ উপস্থিত না হয় সেজন্য ইল্‌তুৎমিস্ জালাল-উদ্দিনকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। এই দূরদর্শিতার ফলে তিনি মোঙ্গল

আরাম শাহ্ (১২১০-১১ খ্রীঃ)

ইল্‌তুৎমিস (১২১১-৩৬ খ্রীঃ)

আক্রমণ এড়াইয়া গিয়াছিলেন। কুতব-উদ্দিন দিল্লী সুলতানির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাকে সুদৃঢ় করিয়া উহার স্থায়িত্ব দান করিয়াছিলেন ইল্‌তুৎমিস্।

রাজিয়া (১২৩৬-৪০ খ্রীঃ) ও পরবর্তী বিশৃঙ্খলা

রাজিয়া : ইল্‌তুৎমিস্ তাঁহার কন্যা রাজিয়াকে সুলতানিপদে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পুত্রগণ ছিলেন অলস ও অকর্মণ্য। প্রথম পুত্র অবশ্য পূর্বেই মারা গিয়াছিলেন। সুলতানা রাজিয়া ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী ও বুদ্ধিমতী রমণী। কিন্তু দিল্লীর আমীর-ওম্‌রাহ্‌গণ স্ত্রীলোকের শাসন মানিবেন না স্থির করিয়া ইল্‌তুৎমিসের শেষ নির্দেশ অমান্য করিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্র রুকন্-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতা ও অলসতায় বিরক্ত হইয়া তাঁহারা রাজিয়াকেই সিংহাসনে পুনরায় স্থাপন করিলেন। রাজিয়ার শাসনদক্ষতা অনেক আমীর-ওম্‌রাহের পছন্দ হইল না। ফলে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র এবং রাজিয়াকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পর পর সুলতান পরিবর্তন করিয়া শেষ পর্যন্ত ইল্‌তুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ্দিন মামুদকে তাঁহারা সিংহাসনে বসাইলেন (১২৪৬ খ্রীঃ)। নাসির-উদ্দিন ছিলেন উদার, নির্বিরোধী, ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু সুলতান। তিনি তাঁহার শ্বশুর ও মন্ত্রী উলুঘ্ খাঁর উপর সম্পূর্ণ শাসনভার ছাড়িয়া দিলেন। উলুঘ্ খাঁর মন্ত্রিত্বকালে রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ফিরিয়া আসিয়াছিল। অপুত্রক অবস্থায় নাসির-উদ্দিনের মৃত্যু (১২৬৬ খ্রীঃ) হইলে উলুঘ্ খাঁ গিয়াস-উদ্দিন বলবন নামে দিল্লীর সুলতান হইলেন।

গিয়াস-উদ্দিন বলবন (১২৬৬-৮৭ খ্রীঃ)

গিয়াস-উদ্দিন বলবন : গিয়াস-উদ্দিন বলবন উদ্ধত আমীর-ওম্‌রাহ্‌দের দমন করিয়া এবং সেনাবাহিনী সংগঠন করিয়া দিল্লী সুলতানির শক্তি বৃদ্ধি করেন। ইহার পর মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া এবং মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া রাজ্যের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করেন। মেওয়াটি দস্যুদের দমন, বাংলাদেশের বিদ্রোহী স্বাধীন সুলতান তুঘ্‌রিল খাঁকে দমন প্রভৃতি কাজ করিয়া বলবন দিল্লী সুলতানির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং দিল্লী সুলতানির ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।


গিয়াস-উদ্দিন বলবন্

বলবনের সুদক্ষ শাসনাধীনে দিল্লীর স্বার্থান্বেষী আমীর-ওম্‌রাহ্ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দিল্লীর সুলতানি নিজেদের প্রভাবে আনিতে চাহিলেন। বলবন তাঁহার পৌত্র কাইখস্‌রুকে পরবর্তী সুলতান মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমীর-ওম্‌রাহ্ তাঁহার অপর এক পৌত্র কাইকোবাদকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কাইকোবাদ

ছিলেন অত্যন্ত অকর্মণ্য ও অলস ব্যক্তি। তিনি বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া দিলেন। তুর্কী অভিজাতগণ ও খল্‌জী অভিজাতগণ সেই সুযোগে প্রাধান্য অর্জনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিলে দিল্লীতে এক দারুন বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সুযোগে খল্‌জী বংশের জালাল-উদ্দিন নামে জনৈক ব্যক্তি কাইকোবাদকে হত্যা করাইয়া নিজে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

বলবনের পরবর্তী কালের দুর্বলতা : কাইকোবাদ (১২৮৭-৯০ খ্রীঃ)

খল্‌জী বংশ : জালাল-উদ্দিন ফিরোজ খল্‌জী : জালাল-উদ্দিন ফিরোজ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বৃদ্ধ বয়স। তিনি কাইকোবাদকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও ক্ষমাশীল ব্যক্তি। তিনি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র আলা-উদ্দিনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। শাসক হিসাবে জালাল-উদ্দিন দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগকে বিনা বাধায় ফিরিয়া যাইতে দিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন! ইহা ভিন্ন একদল মোঙ্গল দিল্লীর সন্নিকটে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে চাহিলে তিনি সেই অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহারা ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'নব-মুসলমান' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলা-উদ্দিনকে তিনি কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উদ্দিন মালব জয় করিলে তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনকর্তার পদও দান করেন। আলা-উদ্দিন বৃদ্ধ জালাল-উদ্দিনকে সরাইয়া কিভাবে নিজে সুলতান হইতে পারেন সেই পরিকল্পনা করিতে লাগিলেন। এজন্য কিছু ধনদৌলত হাতে থাকা প্রয়োজন মনে করিয়া সুলতানের বিনা অনুমতিতে দেবগিরির যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। রামচন্দ্র প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া আলা-উদ্দিনের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। দেবগিরি অভিযানে আলা-উদ্দিন কেবল প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এমন নহে, এই অভিযান বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিকে মুসলমান অভিযানের পথও প্রশস্ত করিয়াছিল। ইহাই ছিল আলা-উদ্দিনের দেবগিরি অভিযানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

খল্‌জী-বংশ : জালাল-উদ্দিন ফিরোজ (১২৯০-৯৬ খ্রীঃ)

আলা-উদ্দিন খল্‌জী : আলা-উদ্দিন দেবগিরি হইতে আনীত ধনরত্ন দিল্লীর রাজকোষে জমা দিলেন না। কিন্তু স্নেহশীল জালাল-উদ্দিন ইহা দোষের কারণ বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি আমীরদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে অভিনন্দন জানাইতে গিয়া আলা-উদ্দিনেরই ইঙ্গিতে প্রাণ হারাইলেন। আলা-উদ্দিন আমীর-ওমরাহ্‌দের প্রচুর অর্থ উৎকোচ প্রদান করিয়া সকলকে নিজ পক্ষে টানিয়া লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

আলা-উদ্দিন খল্‌জী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)

আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালের প্রথম কয়েক বৎসরে মোঙ্গলগণ মোট পাঁচ বার হানা দিয়াছিল। কিন্তু আলা-উদ্দিনের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রতিবারই তাহারা পরাজয়

স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহার পর মোঙ্গলগণ আলা-উদ্দিনের আমলে আর ভারত আক্রমণ করে নাই। আলা-উদ্দিন ছিলেন দূরদর্শী শাসক। মোঙ্গল আক্রমণের স্থায়ী প্রতিরোধের জন্য তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়া এবং পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার সাধন করিয়া দেশকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। তিনি সামান ও দীপালপুর নামক স্থানে স্থায়ী সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিলেন।

মোঙ্গলদের প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা



আলা-উদ্দিন খল্‌জী

আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানির রাজ্যসীমা বহু দূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর, মালব, পাণ্ডু, ধার, চন্দেরী জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে মুসলমান অধিকার দক্ষিণ ভারতের বরঙ্গল, হোয়সল রাজ্য, মাদুরা এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পূর্বে দিল্লী সুলতানি রাজ্য এইরূপ বিশালতা লাভ করে নাই। আলা-উদ্দিনের সমর বিজয়ের প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সৈনিকদের স্বল্প বেতনে দৈনন্দিন ব্যয়-সঙ্কুলান সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সর্বপ্রথম আলা-উদ্দিন খল্‌জীই ভারতে চালু করিয়াছিলেন। আমীর-ওম্‌রাহ্‌গণ অত্যধিক বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহাদের অবাধ আমোদ-প্রমোদ, মদ্যপান প্রভৃতি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ সৃষ্টি করে এই বিবেচনা করিয়া আলা-উদ্দিন সরকারী অনুমতি ভিন্ন আমীর-ওম্‌রাহ্‌ বিবাহ বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হিন্দুদের হাতে যে পরিমাণ অর্থ ছিল তাহা হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ভিন্ন নানা প্রকার করভার স্থাপন করিয়াছিলেন। এইভাবে বিদ্রোহ করিবার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু—অর্থ, তিনি কাহারও হস্তে রাখিতে দেন নাই। আলা-উদ্দিন শিল্পানুরাগ, সাহিত্য ও সাহিত্যকারদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও উল্লেখযোগ্য। নৃশংসতা দোষে দুষ্ট হইলেও আলা-উদ্দিন শাসনকার্য পরিচালনায় অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

রাজ্য জয়

শাসনব্যবস্থা

আলা-উদ্দিনের পরবর্তী খল্‌জী সুলতানগণ দিল্লী সুলতানির উপর তাঁহাদের অধিকার বজায় রাখিতে পারিলেন না। আলা-উদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর নিজ ইচ্ছামত আলা-উদ্দিনের নাবালক পুত্র শিহাব্-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজে প্রকৃত শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। কিন্তু তিনিও বেশী দিন সেই ক্ষমতা ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া আলা-উদ্দিনের কয়েকজন বিশ্বস্ত

ক্রীতদাস মালিক কাফুরকে হত্যা করিল। তাহারা আলা-উদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মোবারক শাহ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিল। ইহাতেও ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিল না। দিল্লীতে এক দারুন বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পর পর সুলতান পরিবর্তন এবং ফলে অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা দিলে আমীর-ওম্‌রাহ্‌ গাজী মালিককে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। গাজী মালিক গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান হইলেন। এইভাবে খল্‌জী বংশের অবসান ঘটিল (১৩২০ খ্রীঃ)।

আলা-উদ্দিনের পরবর্তী কালে দুর্বলতা: খল্‌জী বংশের অবসান (১৩২০ খ্রীঃ)

তুঘ্‌লক বংশ: গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক: গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাসনকার্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাঁহার ছিল। তিনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া এবং সুবিচারের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি আলা-উদ্দিনের কঠোর নীতিরও তিনি কতকটা হ্রাস করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে বাংলাদেশের শাসক পদ লইয়া নানা প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি হইলে গিয়াস-উদ্দিন স্বয়ং বাংলাদেশে আসিয়া নাসির-উদ্দিনকে বাংলার শাসনকর্তার পদে স্থাপন করিয়া দিল্লী ফিরিয়া যান। দিল্লী প্রবেশ কালে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে তোরণ নির্মিত হইয়াছিল উহা ভাঙিয়া পড়ে এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ-ই এজন্য দায়ী ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

তুঘ্‌লক বংশ: গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক (১৩২০-২৫ খ্রীঃ)

মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক: জুনা খাঁ মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার চরিত্রে নানা পরস্পর-বিরোধী গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। নিজে কবি, সুসাহিত্যিক, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারঙ্গম ছিলেন। দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ধর্মান্ধতা, ব্যভিচার, মদ্যাসক্তি, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতি সবকিছুর তিনি ঊর্ধ্বে ছিলেন। আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এদিক দিয়া বিচার করিলে তিনি ছিলেন মুসলমান সুলতান-বাদশাহ্‌দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও গুণসম্পন্ন। কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা এবং বিভিন্নমুখী প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাব হেতু তিনি নিজ পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করিয়া তুলিতে পারেন নাই। একবার কোন কার্যে অকৃতকার্য হইলে তিনি ধৈর্যহীন হইয়া পড়িতেন ফলে পরবর্তী পদক্ষেপে তাঁহার ভুলভ্রান্তি ঘটিত।

মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক (১৩২৫-৫১ খ্রীঃ)

দিল্লী হইতে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করা অযৌক্তিক ছিল না। কারণ উহা ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কিন্তু স্থানান্তরের কাজ কিভাবে করা উচিত ছিল তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি দিল্লীর সকল লোককে দেবগিরি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং সেখানে যাইবার পর সেই স্থানটি ভাল না লাগায় তিনি

তাঁহার পরিকল্পনার ব্যর্থতা

পুনরায় সকলকে দিল্লী ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি একথা উপলব্ধি করেন নাই যে, তাঁহার রাজসভা ও দপ্তর, বিচারালয় প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিলে দিল্লীর জনসাধারণ আপনা হইতেই দেবগিরি যাইতে বাধ্য হইত। অনুরূপ তাঁহার কারাজল অভিযান, খোরাসান ও ইরাক জয়ের পরিকল্পনাও যুক্তির দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য ছিল। মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লক তামার নোট প্রচলন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। চীনের অনুকরণে তামার নোট চালু করিতে গিয়া উহা যাহাতে কেহ নকল না করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। রাজ্যের সর্বত্র উহা নকল করা শুরু হওয়ায় তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের পরিকল্পনাগুলি যুক্তিগ্রাহ্য হইলেও এগুলির ব্যর্থতা, তাঁহার নিজের অব্যবস্থিত চিত্ততা প্রভৃতি তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দক্ষিণ-ভারত স্থলতানি সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেখানে বিজয়নগর ও বহ্‌মনী রাজ্য নামে দুইটি রাজ্য গড়িয়া উঠিল। বাংলাদেশে ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ্ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সিন্ধু অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দিল। সেই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়াই মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লক মৃত্যুমুখে পতিত হন। দিল্লীর তুর্ক-আফগান সুলতানির পতনের সূত্রপাত তাঁহার রাজত্বকালেই হইয়াছিল।



মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লক

সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহ: সুলতানির পতনের সূত্রপাত

ফিরোজ তুঘ্‌লক: পরবর্তী তুঘ্‌লক সুলতান ছিলেন মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের পিতৃব্য ফিরোজ তুঘ্‌লক। বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়া তিনি তেমন সামরিক দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের রাজত্বকালের শেষ দিকে সিন্ধু ও বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশ তিনি পুনর্দখল করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। সিন্ধু অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তিনি বাংলাদেশ হইতে ফিরিবার পথে উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন কাংড়া দুর্গটিও তিনি জয় করিয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ্ তুঘ্‌লক প্রজাহিতৈষণার জন্য বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সেচব্যবস্থা, রাজস্বভার লাঘব প্রভৃতি করিয়াছিলেন। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য একটি 'নিয়োগ পরিষদ' (Employment Bureau), চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন

ফিরোজ তুঘ্‌লক (১৩৫১-৮৮ খ্রী:)

করিয়াছিলেন। হিন্দুদের উপর তিনি জিজিয়া কর ধার্য করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার কর স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্মের প্রতি তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধাবশত তিনি ধর্মান্ধনীতি অনুসরণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। নিজে তিনি ছিলেন স্থন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান। স্থন্নী সম্প্রদায় ভিন্ন অপরাপর সম্প্রদায়ের বিশেষভাবে শিয়া সম্প্রদায় এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতেও তিনি পশ্চাদ্পদ হন নাই। ধর্মান্ধতাই ছিল তাঁহার চরিত্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ত্রুটি।

দিল্লী স্থলতানির পতনের জন্ম তাঁহার দায়িত্ব

ফিরোজ তুঘ্লকের শাসন কতক পরিমাণে জনপ্রিয় হইলেও দিল্লী স্থলতানির ভিত্তি তিনি দুর্বলতর করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। রাজনীতিতে উলেমাদের প্রভাব বিস্তার, পদস্থ কর্মচারীদের অক্ষমতা ও অদক্ষতা, সামরিক কর্মচারীদের ও অভিজাতবর্গের প্রতি তাঁহার অযৌক্তিক ঔদার্য এবং সর্বোপরি জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন দিল্লী স্থলতানির পতনের পথ সহজতর করিয়া দিয়াছিল।

সৈয়দ বংশ : লোদী বংশ : মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের রাজত্বকালে দিল্লী স্থলতানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে দিল্লী স্থলতানিকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা ফিরোজ শাহ্ তুঘ্লক বা তাঁহার পরবর্তী স্থলতানদের ছিল না। দিল্লী স্থলতানির শাসন যখন ক্রমেই শিথিল এবং দিল্লী সাম্রাজ্য যখন ক্রমেই ক্ষুদ্র পরিসর হইয়া পড়িতেছিল সেই সময়ে তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠন (১৩৯৮ খ্রীঃ) দিল্লী স্থলতানিকে চরম আঘাত হানিয়াছিল। দিল্লী স্থলতানি সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশ এই দুর্বলতার স্থযোগে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তুঘ্লক বংশের শাসনকালের শেষে এবং মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্তর্বর্তীকালে দিল্লী স্থলতানি সাম্রাজ্যের যে অংশ টিকিয়াছিল উহার উপর সৈয়দ ও লোদী বংশের স্থলতানগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহাদের শাসনব্যবস্থা যেমন ছিল শিথিল তেমনি অকর্মণ্য। ফলে লোদী বংশের ইব্রাহিম লোদী পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) বাবরের হস্তে পরাজিত হইলে দিল্লীর তুর্কী-আফগান স্থলতানির অবসান ঘটে।

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-৫১ খ্রীঃ)

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ)

দিল্লী স্থলতানির পতন : দিল্লী স্থলতানি সাম্রাজ্য স্থলতানদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ভরশীল ছিল। জনসাধারণের আনুগত্য বা সহযোগিতার উপর উহা গড়িয়া উঠে নাই। এজন্য দিল্লী স্থলতানির ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ইহা ভিন্ন স্থলতানি শাসনব্যবস্থা ছিল সামন্ত প্রথার উপর নির্ভরশীল। ইহার প্রধান ত্রুটিই ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় শাসন সামান্ত দুর্বল হইলে সামন্তগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিত। বড় বড় জমিদার, অভিজাত ব্যক্তি, আমীর-ওম্রাহ্, জায়গিরদার প্রভৃতি দিল্লী স্থলতানি শাসনের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। স্থানীয় এলাকায় তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অত্যধিক। কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হওয়া মাত্র

দিল্লী স্থলতানির পতন

তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একইরূপ ব্যবহার করিতেন। এই সকল কারণ ভিন্ন ক্রীতদাসের সংখ্যাধিক্য ও অকর্মণ্যতা এবং সরকারের উপর তাঁহাদের জন্য খরচের চাপ শাসনব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি না করিয়া দুর্বলতর করিয়া দিয়াছিল। সুলতানি আমলের প্রথম দিকে কুতব-উদ্দিন, ইল্‌তুৎমিসের ন্যায় সুদক্ষ ক্রীতদাস আর শেষ দিকে পাওয়া যায় নাই। এদিকে রাজকর্মচারীদের ব্যভিচার, মদ্যাসক্তি, বিলাস-ব্যসন তাঁহাদের কর্মদক্ষতা লোপ করিয়াছিল। শাসনযন্ত্র অকর্মণ্য ও অচল হইয়া পড়িয়াছিল। সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং রাজস্ব অপহরণের প্রবণতাও শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার কারণ হইয়াছিল। হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, তাহাদের সম্পত্তি বিনাশ, তাহাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন প্রভৃতি হিন্দুপ্রধান ভারতে অনুসরণ করিয়া দিল্লী সুলতানগণ ভারতের জাতীয় সুলতানে পরিণত হইতে পারেন নাই। এই সঙ্কীর্ণতার ফলে প্রজাবর্গ সুলতানদের প্রতি অকপট আনুগত্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই এবং অকপট আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নহে এরূপ সাম্রাজ্য সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

তৈমুর লঙ ও বাবরের আক্রমণ : দিল্লী সুলতানির অবসান

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও দুর্বলতা যখন চরমে পৌঁছিয়াছে সেই সময়ে তৈমুর লঙ কর্তৃক ভারত আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠন সুলতানিকে চরম আঘাত হানিয়া গিয়াছিল। ইহার পর লোদী বংশের আমলে নিজেদের মধ্যে কলহ প্রশাসন বিভাগকে দুর্বলতর করিয়া দিয়াছিল। এই আত্মকলহের সর্বনাশাত্মক ফল হিসাবে আলম খাঁ ও দৌলত খাঁ লোদী বিদেশী আমীর মোগল বীর বাবরকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সুলতানি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। 5.4.82

(খ) ভারতে মোগল শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন
(Rise and decline of Mughal Power in India)

মোগলগণ : মোগল বা মুঘল কথাটি মোঙ্গল শব্দ হইতে উদ্ভূত। মধ্য-এশিয়ার বর্তমান মোঙ্গলিয়ায় মোঙ্গলদের আদি বাসভূমি ছিল। মোঙ্গল জাতি কতকগুলি উপদলে বিভক্ত ছিল। এই সকল উপদলের একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠে। এই উপদলের নেতা ছিলেন ইয়েসুকাই এবং পরে তাঁহার পুত্র চিঙ্গিস খাঁ। চিঙ্গিস খাঁর আসল নাম ছিল তেমুচিন। তিনি অসাধারণ শক্তিশালী ছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম হইয়াছিল 'চিঙ্গিজ' বা 'জিঙ্গিজ'। 'চিঙ্গিস' কথাটির অর্থ হইল 'অসাধারণ শক্তিশালী'। চিঙ্গিস

মোঙ্গলদের আদি পরিচয়

খাঁ সাইবেরিয়া হইতে জর্জিয়া পর্যন্ত এক বিশাল ভূখণ্ডে নিজ অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি একবার খারিজমের শাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধুদেশের সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। খারিজমের শাহ্ ভারতে আশ্রয় না পাইয়া ফিরিয়া গেলে চিঙ্গিস খাঁও ফিরিয়া যান। চিঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য কতকগুলি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত

হইয়া পড়ে এবং মধ্য-এশিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চাঘ্‌তাইয়ের অধিকারে আসে। এই রাজ্যের নাম হয় চাঘ্‌তাই রাজ্য এবং উহার অধিবাসীরা চাঘ্‌তাই তুর্কী নামে পরিচিত হয়। পরে চাঘ্‌তাই রাজ্যও দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং পশ্চিম অংশে তাতারদের সংখ্যা বেশী থাকায় ঐ অঞ্চলের তাতার ও মোঙ্গল জাতির মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটে। এই মোঙ্গল-তাতার জাতি হইতে তৈমুর লঙের উদ্ভব ঘটে। তৈমুর ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মোঙ্গল নেতা যিনি দিল্লী পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৈমুরের বংশধরই পরে দিল্লীতে মোঙ্গল বা মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

বাবর : জহির-উদ্দিন মহম্মদ বাবর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। পিতার দিক দিয়া তৈমুরের এবং মাতার দিক দিয়া চিঙ্গিসের তিনি বংশধর ছিলেন। এই দুই দুর্ধর্ষ বীরের রক্ত তাঁহার শিরায় প্রবাহিত ছিল ; সুতরাং তিনি নিজেও একজন অসাধারণ বীর হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য কি ? মোঙ্গল বংশের সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া তিনি নিজেকে মোগল —অর্থাৎ মোঙ্গল নামেই পরিচয় দিতেন। এজন্য ভারতে তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন উহা মোগল বংশ নামে পরিচিত। মাত্র একাদশ বৎসর বয়সে পিতা ওমর শেখকে হারাইলে, তুর্কীস্তানের ফর্‌ঘনা রাজ্যের শাসনভার তাঁহার উপর পড়িল। বালক বাবর সিংহাসনে আরোহণ করিলে আত্মীয়-স্বজন অনেকেই নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু বাবর ছিলেন প্রতিভাবান ব্যক্তি। বাবর কথাটির অর্থ হইল সিংহ। বস্তুত বাবর ছিলেন পুরুষসিংহ। তিনি শাসন-কার্যে দক্ষতার পরিচয় দিলেন, স্বার্থান্বেষীদের তিনি কোন সুযোগ গ্রহণ করিতে দিলেন না। তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ নিজ অধিকারে আনিয়া বাবর এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় উজ্‌বেগ্‌ সর্দার সাহেবানী খাঁ সমরখন্দ দখল করিয়া লইলেন। ফর্‌ঘনা হইতেও বাবর বিতাড়িত হইলেন। ভাগ্য-বিড়ম্বিতের ন্যায় তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিতে লাগিলেন। এমন সময় কাবুল রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিলে অতি অল্প সংখ্যক অনুচর লইয়া তিনি কাবুল দখল করিয়া লইলেন। কাবুলের আমীর পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি হিন্দুস্থান জয়ের কল্পনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় লোদী

বাবর (১৫২৬-৩০ খ্রীঃ)



বাবর

বংশের আত্মকলহে যখন সুলতানি রাজত্ব টলটলায়মান সেই সময়ে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ও সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খাঁ লোদী দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার আশায় বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হিন্দুস্থান জয়ের সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়াছে দেখিয়া বাবর তাহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই লাহোর অধিকার করিয়া লইলেন। দৌলত খাঁ ও আলম খাঁর তখন ভুল ভাঙিল। বাবর তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়া নিজে দেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। বাধ্য হইয়া বাবর নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু পর বৎসর (১৫২৬ খ্রীঃ) এক বিশাল বাহিনী, কামান, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পাণিপথের প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদী তাঁহাকে বাধা দিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। বাবর কামান ও বন্দুকের সাহায্যে ইব্রাহিম লোদীর এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। বাবর দিল্লী ও আগ্রা দখল করিয়া ভারতে মোগল রাজত্বের সূচনা করিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী সুলতানি শাসনের অবসান ঘটিল। কিন্তু মেবারের রাজপুত রাজ্য এবং বাংলা-বিহারের আফগান রাজ্য সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বাবরের ভীতির সঞ্চার করিল। বাবর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে আফগানদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন। হুমায়ুন কয়েক মাসের মধ্যেই এটক হইতে বিহারের সীমা পর্যন্ত যাবতীয় অঞ্চলের আফগান নেতৃবৃন্দকে বাবরের প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য করিলেন। বাবর স্বয়ং মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহকে (রাণা সঙ্গ) খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত করিলেন (১৫২৭ খ্রীঃ)। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে তদানীন্তন ভারতের সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বাবর রক্ষা পাইলেন। তাঁহার দিল্লীর বাদশাহিও সুদৃঢ় হইল। ইহার পর চন্দেরী দুর্গ অধিকার করিয়া বাবর তাঁহার সাম্রাজ্যের সামরিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করিলেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপতিগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে গোগ্‌রার যুদ্ধে বাবর তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন। ফলে বাংলাদেশের সীমা পর্যন্ত বাবরের রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইল। অল্পকালের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু হইল (১৫৩০ খ্রীঃ)। বাবর অসামান্য কর্মশক্তি, অপরিসীম উদ্যম, ধৈর্য ও অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। সামরিক সংগঠন, তুর্কী ও ফারসী ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা, সন্তানবাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। তিনি নিজ জীবনস্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন।

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬ খ্রীঃ)

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭ খ্রীঃ)

গোগ্‌রার যুদ্ধ (১৫২৯ খ্রীঃ)

হুমায়ুন : বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ্ হইলেন। বাবর যে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন উহার ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার অবকাশ তিনি পান নাই; সুতরাং সেই দায়িত্ব পড়িল তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের উপর। বাবর মৃত্যুর

পূর্বে হুমায়ুনকে নিজ ভ্রাতাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন।

হুমায়ুন (১৫৩০-৫৬ খ্রীঃ

হুমায়ুন পিতার শেষ নির্দেশ পালনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি মধ্যম ভ্রাতা কামরানকে কাবুল ও কান্দাহার, তৃতীয় ভ্রাতা হিন্দালকে মেওয়াট এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আস্‌করীকে সম্বল নামক স্থানটি দিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে কামরান সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি পাঞ্জাব, হিসারফিরোজা প্রভৃতি অঞ্চল বলপূর্বক দখল করিয়া লইলেন। হুমায়ুন ভ্রাতার এই বিদ্রোহাত্মক কাজের জন্য কোন শাস্তি দেওয়া দূরে থাকুক পাঞ্জাব ও হিসারের উপর তাঁহার অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের ঐক্য হুমায়ুন নিজেই বিনাশ করিলেন।


হুমায়ুন

আফগান দলপতিগণ বাবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুরু করিলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাজপুতদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি চিতোর অধিকার করিলেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপতিগণও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে মনোযোগী হইয়া উঠিলেন। হুমায়ুন দৌরাহের যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন বটে কিন্তু বিহারের আফগান বীর শের শাহ্ সেই সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

শের শাহ্ : শের শাহের আসল নাম ছিল ফরিদ খাঁ। তিনি ছিলেন সাসারামের জায়গিরদার হাসানের পুত্র। বিমাতার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং জোনপুরে চলিয়া যান। সেখানে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। এই দুই ভাষায় তাঁহার গভীর জ্ঞান জন্মায়। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। ইহার পর কিছুকাল তিনি সাসারামে পিতার সহিত বাস করেন এবং পিতা সাসারামের শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু বিমাতার ঈর্ষা তাঁহাকে পুনরায় গৃহত্যাগে বাধ্য করে। পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁহাকে সাসারামের জায়গির দান করেন। তারপর তিনি বিহারের শাসনকর্তা বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহার কর্মদক্ষতা অল্পকালের মধ্যেই বহর খাঁর সন্তুষ্টি বিধান করিলে শের শাহের পদমর্যাদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। বহর খাঁর অধীনে কাজ করিবার সময় তিনি একা একটি বাঘের সহিত লড়াই করিয়া বাঘটি মারিয়াছিলেন। এজন্য বহর খাঁ তাঁহাকে ‘শের’—অর্থাৎ ‘বাঘ’ উপাধি

শের শাহের পরিচয়

দিয়াছিলেন। বিহারের অভিজাতবর্গের অনেকে শের শাহের ভাগ্যোন্নতিতে ঈর্ষাকাতর হইয়া বহর খাঁর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভিযোগ করিতে লাগিলেন। ফলে শের শাহের চাকরি গেল, সাসারামের জায়গিরও বাজেয়াপ্ত হইল। ইহার পর কিছুকাল বাবরের অধীনে সৈনিকের চাকরি করিয়া তিনি বাবরের সন্তুষ্টিবিধান করিলে শের শাহকে সাসারামের জায়গির ফিরাইয়া দেওয়া হইল। এদিকে বহর খাঁ লোহানীর মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র জালাল খাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণের জন্য শের শাহ্‌কে আমন্ত্রণ জানান হইল। শের শাহের উপর শাসনভার ন্যস্ত হওয়ায় তিনি ক্রমেই বিহারের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং কর্মদক্ষতা সমরবাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপর তাঁহার প্রভাব এবং আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করিল।



শের শাহ্‌

চুণার দুর্গের অধিপতি সেই সময়ে মারা গেলে শের শাহ্‌ তাঁহার বিধবা পত্নী মালিকাকে বিবাহ করিয়া চুণার দুর্গের অধিপতি হইলেন। শের শাহের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া হুমায়ুন শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং চুণার দুর্গটি অবরোধ করিলেন। শের শাহ্‌ মৌখিকভাবে হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার নিজ শক্তিবৃদ্ধির জন্য সময় লইবার উদ্দেশ্যেই তিনি করিয়াছিলেন।

জালাল খাঁ ইতিমধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। তিনি এবং শের শাহের প্রতি ঈর্ষা-পরায়ণ অভিজাতবর্গ শের শাহ্‌কে বিহারের শাসন অধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে চাহিলে সুরযগড়ের যুদ্ধে শের শাহ্‌ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া নামে ও কাজে বিহারের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। শের শাহের আকাঙ্ক্ষা এখন স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ফলে হুমায়ুনের সঙ্গে শের শাহের সংঘর্ষ শুরু হইল।

সুরযগড়ের যুদ্ধ (১৫৩৪ খ্রী)

চুণার দুর্গ অবরোধ করিবার পর শের শাহ্‌ কূটকৌশলে হুমায়ুনের বশ্যতা মুখেই স্বীকার করিয়া নিজ শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হুমায়ুন শের শাহের মৌখিক আনুগত্য স্বীকারে সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইতিমধ্যে গুজরাটের বাহাদুর শাহ্‌ ক্রমেই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিলেন এমনকি হুমায়ুনের বিরুদ্ধবাদী আফগান দলপতিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া হুমায়ুনের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করিয়াছিলেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলে সেই সুযোগে শের শাহ্‌ বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া কিউল হইতে সকৃরিগলি পর্যন্ত স্থান দখল করিয়া লইলেন। ইহার পর অপর এক অভিযানে

তিনি বাংলাদেশের রাজধানী গৌড় অবরোধ করিলেন। হুমায়ুন শের শাহ্‌কে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু প্রথমেই তিনি কূটনৈতিক ভুল করিয়া বসিলেন। বাংলার শাসনকর্তার সহিত যুগ্মভাবে শের শাহ্‌কে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি প্রথমে চূণার দুর্গটি অবরোধ করিলেন। এই দুর্গ জয় করিতে তাঁহাকে দীর্ঘ ছয়মাস অতিবাহিত করিতে হইল। সেই সুযোগে শের শাহ্‌ গৌড় অধিকার করিলেন। হুমায়ুন যখন গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন তখন শের শাহ্‌ গৌড় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং হুমায়ুন গৌড় দখল করিয়া যখন আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত শের শাহ্‌ সেই সময়ে চূণার দুর্গটি পুনর্দখল করিয়া লইলেন এবং জৌনপুর, বারাণসী প্রভৃতি জয় করিয়া কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এইভাবে তিনি হুমায়ুনের দিল্লী ফিরিবার পথ নিজ অধিকারে লইয়া গেলেন। হুমায়ুন কালক্ষেপ না করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে চৌসা নামক স্থানে শের শাহ্‌ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন। কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া হুমায়ুন আগ্রা ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর (১৫৪০ খ্রীঃ) হুমায়ুন শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলে কনৌজের যুদ্ধে শের শাহ্‌ তাঁহাকে পুনরায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। মোগল সাম্রাজ্য শের শাহের অধিকারে চলিয়া গেল। পরাজিত হুমায়ুন ভ্রাতাদের কাহারও কাছে এই দুর্দিনে আশ্রয় পাইলেন না। অমরকোটের রাজার নিকট তিনি আশ্রয় পাইলেন। সেখানেই আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ খ্রীঃ)। কিছুকাল পর তিনি পরিবারসহ পারস্যে চলিয়া যান।

চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯ খ্রীঃ)

হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত

শের শাহ্‌ দিল্লীর বাদশাহ্‌ হইয়া রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি উহা নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। গোয়ালিওর, মালব, রায়সিন দুর্গ জয় করিয়া মেবারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাণা মালদেবও শের শাহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শের শাহ্‌ এইভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনায়ও শের শাহ্‌ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি এক সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালেও এই শাসনব্যবস্থার অনেক কিছু অপরিবর্তিত ছিল। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকার এবং প্রতি সরকারকে কতকগুলি পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নানা পর্যায়ের রাজকর্মচারী নিয়োগ করিয়া এবং কিছুকাল পর পর তাহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলির ব্যবস্থা করিয়া এক পক্ষপাতশূন্য সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজস্বব্যবস্থা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। জমির উর্বরতার ভিত্তিতে তিনি রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের শর্ত স্বীকার করিয়া কবুলিয়ত নামক দলিল গ্রহণ করিবার এবং সরকারেরও পক্ষ হইতে জমির উপর প্রজার স্বত্ব, জমির সমা রাজস্বের পরিম

শের শাহ্‌ দিল্লীর বাদশাহ্‌

শের শাহের শাসন-ব্যবস্থা

শের শাহের রাজস্ব-ব্যবস্থা

উল্লেখ করিয়া পাট্টা নামক দলিল প্রজাকে দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। (মোগল সম্রাট আকবরের আমলে শের শাহের রাজস্বব্যবস্থার অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। শের শাহ্ রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিচারব্যবস্থার সংস্কার, ডাক, সেনাবিভাগ ও গোয়েন্দা বা গুপ্তচর বিভাগের উন্নতি সাধন করিয়া শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড শের শাহ্ কর্তৃক নির্মিত রাস্তার বর্তমান নাম। ঘোড়ার পিঠে করিয়া ডাক এক স্থান হইতে অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থা তিনিই প্রচলন করিয়াছিলেন।

জাতীয় সম্রাট

শের শাহের শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুণ ছিল এই যে, উহাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ক্ষমতানুযায়ী কর্মচারীপদে নিযুক্ত হইবার সুযোগ দেওয়া হইত। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রজাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ তিনি স্বীকার করিতেন না। হিন্দুপ্রধান ভারতের জাতীয় বাদশাহ্ বা সম্রাট হইতে হইলে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ করা মূর্খতা হইবে একথা শের শাহের ন্যায় দূরদর্শী বাদশাহ্ই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।)

হুমায়ুন কর্তৃক মোগল বাদশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা

শের শাহের উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতার জন্য শের শাহ্ প্রতিষ্ঠিত আফগান বাদশাহী শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। শের শাহের পরবর্তী বাদশাহ্দের অক্ষমতা ও আত্মকলহ হুমায়ুনকে তাঁহার হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সুযোগ দান করিল। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন পারস্য সম্রাটের সাহায্য লইয়া পাঞ্জাব, দিল্লী, আগ্রা দখল করিয়া পুনরায় মোগল বাদশাহীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু মাত্র এক বৎসর পর নিজ গ্রন্থাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিল (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

আকবরের সিংহাসন লাভ (১৫৫৬ খ্রীঃ)

সম্রাট আকবর : হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র আকবর মাত্র তের বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসন আরোহণ করিলেন। বৈরাম খাঁ নামক হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধুর চতুরতায় হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে আকবরের সিংহাসন লাভে কোন অসুবিধা ঘটে নাই।


মহামতি আকবর

হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সাম্রাজ্য দিল্লী, আগ্রা ও পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। সিন্ধু, কাশ্মীর, মালব, উড়িষ্যা, গুজরাট এবং দক্ষিণ-ভারতে খান্দেশ, বেরার, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য নিজ নিজ স্বাধীন সুলতানের অধীনে ছিল। আফগান অভিজাতগণও ভারতের বিভিন্নাংশে তখনও স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করিতেছিলেন। এদিকে পোর্তুগীজ বণিকগণও গোয়া, দিউ প্রভৃতি

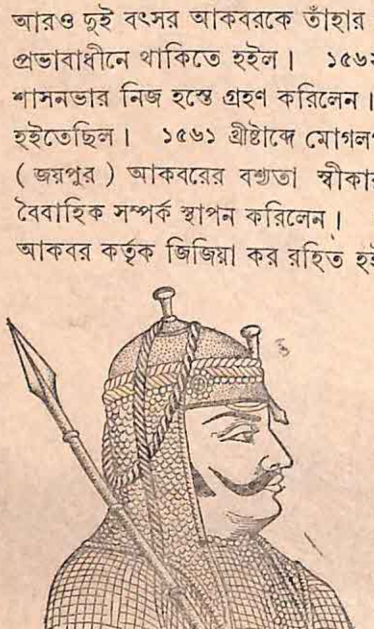
অঞ্চলে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। হুমায়ুনের যখন মৃত্যু হয় তখন আকবর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন এবং বৈরাম খাঁ ছিলেন তাঁহার অভিভাবক। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে শূরবংশীয় অর্থাৎ শের শাহের বংশের আফগানদের জনৈক আদিল শাহ্ ছিলেন খুব শক্তিশালী। তিনি আফগান প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহার সেনাপতি হিমুকে দিল্লী ও আগ্রা দখল করিতে প্রেরণ করেন। হিমু এই দুই স্থান দখল করিয়া নিজে বিক্রমজিৎ উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব শুরু করেন। এদিকে বৈরাম খাঁ আকবরকে বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া পাঞ্জাব হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। পাণিপথের প্রান্তরে হিমুর সহিত আকবরের যুদ্ধ হয়। হিমু পরাজিত হইলে, আকবর দিল্লীতে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। এই যুদ্ধ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রীঃ)

ইহার পর আকবর কিছুকাল বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বাধীনে রহিলেন। বৈরাম খাঁ আফগান দলপতি আদিল শাহ্কে পরাজিত ও নিহত করিলেন। অপরাপর আফগান নেতাও আকবরের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। বৈরাম খাঁর তত্ত্বাবধানে তিন বৎসরের মধ্যে আজমীর, গোয়ালিওর ও জৌনপুর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁর নিকট হইতে শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আরও দুই বৎসর আকবরকে তাঁহার ধাত্রীমাতা মহম্ অন্‌গা ও তাঁহার পুত্র আদম খাঁর প্রভাবাধীনে থাকিতে হইল। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর এই প্রভাব কাটাইয়া সম্পূর্ণ শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। এদিকে মোগল সাম্রাজ্যের সীমা ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছিল। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে মোগলগণ মালব অভিযান করেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে অম্বর (জয়পুর) আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিল এবং রাজা বিহারীমল্ল তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গণ্ডোয়ানা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত এবং আকবর কর্তৃক জিজিয়া কর রহিত হইল। চিতোর, রণথম্ভোর, কালিঞ্জর, বিকানীর, জয়সলমীর প্রভৃতি একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। চিতোর মেবারের হস্তচ্যুত হইলে উদয় সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপ উহা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। দেশ-প্রেমিক, স্বাধীনচেতা রাণা প্রতাপ মোগল সম্রাট আকবরের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়িয়া চলিলেন। হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে (১৫৭৬ খ্রীঃ) এই দুর্ধর্ষ রাজপুত বীরকে আকবর পরাজিত করিলেন সত্য কিন্তু প্রতাপের স্বাধীনতা স্পৃহাকে জয় করিতে পারিলেন না। রাণা প্রতাপের দুর্গগুলি একে একে আকবরের অধিকারে আসিলে

রাণা প্রতাপ

হল্‌দিঘাটের যুদ্ধ (১৫৭৬ খ্রীঃ)



রাণা প্রতাপ

রাণা প্রতাপ পর্বত-অরণ্যে আত্মগোপন করিলেন, কিন্তু আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবার হীন চেষ্টা তিনি কল্পনায়ও আনিলেন না। অনিদ্রা, অনাহার—সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াও তিনি মেবার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা চালাইলেন। তাঁহার চরম অর্থাভাবে তাঁহারই অনুগত মন্ত্রী ভাম্‌সা তাঁহার জীবনের সঞ্চিত সকল অর্থ রাণা প্রতাপের হস্তে তুলিয়া দিলেন এবং দেশ উদ্ধারের জন্য পুনরায় চেষ্টা করিতে বলিলেন। নূতন উৎসাহ লইয়া রাণা প্রতাপ মোগল বাহিনীর সহিত লড়িয়া শেষ পর্যন্ত মেবার রাজ্যের বহু স্থান পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। অবশ্য তাঁহার জীবনে মেবারের রাজধানী চিতোর উদ্ধার করা

রাণা প্রতাপের স্বদেশপ্রেম



সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, রাণা প্রতাপ দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা স্পৃহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাণা প্রতাপের মৃত্যু হইলে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র অমর সিংহ মোগলদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন এবং মানসিংহ মোগল বাহিনী লইয়া মেবার আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন। ইহার পর আকবরের জীবদ্দশায় মেবার আক্রমণের চেষ্টা আর করা হয় নাই।

আকবরের রাজ্যবিস্তার রাণা প্রতাপের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তিনি গুজরাট, সুরাট, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সুরাট অধিকারের ফলে পোর্তুগীজদের সহিত আকবরের সৌহার্দ্য জন্মে। ফলে পোর্তুগীজগণ ভারতের মুসলমানগণের নৌপথে মক্কা যাওয়া-আসার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। আকবর কাবুল, সিন্ধু, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার পর দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর, খান্দেশও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। খান্দেশের শ্রেষ্ঠ এবং সুরক্ষিত দুর্গ অসীরগড় আকবর ঘুষ দিয়া জয় করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য ও মর্যাদাকে কতকাংশে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল। অসীরগড় দুর্গ জয়ই আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের সর্বশেষ পদক্ষেপ (১৬০১ খ্রীঃ)।

আকবরের দাক্ষিণাত্য জয়

একমাত্র শের শাহ্ ভিন্ন আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান সুলতান, বাদশাহ্গণ ধর্ম বিষয়ে উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই। কেহই রাজনীতি হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া দেখিবার মত মানসিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন নাই। ফলে তাঁহাদের রাজনীতি ধর্মমতের দ্বারা আচ্ছন্ন হইত। ভারত সম্রাটের পক্ষে কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের আনুগত্য লাভ করিলেই চলিবে না, জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের আনুগত্যের উপর নির্ভর করিয়াই প্রকৃত ভারতের জাতীয় সম্রাট হইতে পারা যাইবে এই সত্য আকবর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শের শাহ্ও করিয়াছিলেন। আকবরের এই উদারতার পশ্চাতে তাঁহার মাতা হামিদাবানু ও শিক্ষক আব্দুল লতিফের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ফৈজী, আবুল ফজ্‌ল, শেখ্ মুবারক প্রভৃতির প্রভাবে আসিয়া ধর্ম সম্পর্কে আকবরের অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়া গিয়াছিল। (বিভিন্ন ধর্মের সারমর্ম জানিয়া আকবর সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয়দের এক উদার ধর্মমতে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তিনি 'দিন্-ইলাহি' নামে এক নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন।)


আবুল ফজ্‌ল

আকবরের ধর্মমত: হিন্দু, রাজপুত প্রভৃতির প্রতি তাঁহার নীতি

কিন্তু এই ধর্মমতের সূক্ষ্ম নীতি জনসাধারণের মনে তেমন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। আকবর বলপূর্বক তাঁহার এই ধর্মমত প্রচার করিবার চেষ্টাও করেন নাই, ইহা তাঁহার উদারতারই পরিচায়ক, বলা বাহুল্য। হিন্দুদের প্রতি উদারতা, রাজপুতদের প্রতি উদারতা—এমনকি রাজপুতদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আকবর তাঁহাদিগকে এক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। আকবর তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল নীতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং হিন্দু ও রাজপুতগণ তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে কার্যকর করিয়া তুলিয়াছিল। অ-মুসলমানদের উপর হইতে আকবর জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া সকল প্রজার সমান অধিকার—এই নীতি কার্যকর করিয়াছিলেন। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ, বিদ্বান মনীষীদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক ছিল।

জাহাঙ্গীর : আকবরের মৃত্যুর (১৬০৫ খ্রীঃ) পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি পুনঃ পুনঃ অভিযান প্রেরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত মেবারের রাণা অমর সিংহকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। আকবরের আমলে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে জমিদারগণ মোগল আধিপত্য অস্বীকার করিয়া চলিতেছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে ইস্‌লাম খাঁ সমগ্র বাংলাদেশের উপর মোগল আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন। আকবর আহ্‌মদনগরের একাংশের বশ্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মালিক অম্বর নামক মন্ত্রীর পরিচালনায় অপরাংশ স্বাধীন রহিয়া গিয়াছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে মালিক অম্বর সাময়িকভাবে বশ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহার মৃত্যুর পূর্বাবধি মোগল বাহিনী দাক্ষিণাত্য সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই। জাহাঙ্গীরের শাসনব্যবস্থায় তাঁহার প্রধানা মহিষী নূরজাহান অপরিসীম ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন।


জাহাঙ্গীর

জাহাঙ্গীর একাধারে অমায়িক, স্নেহশীল, উদারচেতা, এবং নৃশংস ও পরধর্ম-অসহিষ্ণু ছিলেন। পিতার ন্যায় ধর্ম সম্পর্কে উদারতা তিনি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। শিখ গুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া অদূরদর্শিতা ও অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ন্যায় বিচার, শিল্পের, বিশেষভাবে চিত্র শিল্পের, পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক মদ্যাসক্তি ও অহিফেন সেবন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। সেই সুযোগে তাঁহার মহিষী নূরজাহান শাসনব্যবস্থার উপর তাঁহার নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তার

জাহাঙ্গীরের অদূরদর্শিতা

করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে শাহ্‌জাহান ও মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহান : জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময় তাঁহার তৃতীয় পুত্র শাহ্‌জাহান (শাহ্‌জাদা খুর্‌রম) দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। নূরজাহান শাহ্‌জাহানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ারকে সিংহাসনে স্থাপন করিলে আসফ্ খাঁ শাহ্‌রিয়ারকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন এবং শাহ্‌জাহানকে দ্রুত দিল্লী পৌছিবার জন্য জানাইলেন। শাহ্‌জাহান দিল্লী পৌছিয়া ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। শাহ্‌জাহান প্রথমে বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহী রাজা যুঝর সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহী সুবাদার খাঁন জাহানকে দমন করিলেন।

শাহ্‌জাহান (১৬২৮-৫৯ খ্রীঃ)

পোর্তুগীজগণ বাংলাদেশে লুঠতরাজ, জলদস্যুতা, দেশীয় প্রজাদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় প্রভৃতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ চালাইতেছিল। শাহ্‌জাহানের পত্নী মমতাজ বেগমের জন্য প্রেরিত দুইজন পরিচারিকাকে তাহারা ধরিয়া লইয়া যায়। শাহ্‌জাহান পোর্তুগীজদের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য বাংলার শাসনকর্তা কাসেম আলিকে জানাইলে তিনি হুগলী আক্রমণ করিয়া পোর্তুগীজদিগকে উচিত শিক্ষা দিলেন। ইহার পর পোর্তুগীজগণ বাংলাদেশে আর ব্যবসায় করিতে সমর্থ হয় নাই।



নূরজাহান

পূর্ববর্তী মোগল সম্রাটদের অনুসৃত দাক্ষিণাত্য জয়ের নীতি শাহ্‌জাহানও অনুসরণ করিলেন। শাহ্‌জাহান আহ্‌মদনগর জয় করিলেন, গোলকুণ্ডা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। বিজাপুরের সুলতানও তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। শাহ্‌জাহান মধ্য-এশিয়াস্থিত কান্দাহার জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি উৎকোচ দান করিয়া কান্দাহারের শাসনকর্তাকে সাময়িকভাবে বশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পারস্যের রাজা উহা অল্প কালের মধ্যেই পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহান শেষ পর্যন্ত কান্দাহার জয়ের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

দাক্ষিণাত্য নীতি

শাহ্‌জাহানের জাঁকজমকপ্রিয়তা এক প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে নির্মিত তাজমহল তাঁহার পত্নীপ্রেমের এক অমর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। তাঁহার আদেশে নির্মিত ময়ুর সিংহাসনটিও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত এই অপূর্ব সিংহাসনটি ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠনকালে নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের জাঁকজমকপ্রিয়তা

শাহ্‌জাহানের জীবদ্দশায়ই তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হইয়াছিল। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে দারাশিকো ছিলেন তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়। তিনি ছিলেন উদারচেতা, সুশিক্ষিত এবং শাসনকার্যে সুদক্ষ। দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন অলস, আরামপ্রিয় ও বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত। তৃতীয় পুত্র ঔরংজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা এবং অত্যন্ত কূটকৌশলী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। সর্ব-কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন মদ্যপায়ী, বিবেচনা-বুদ্ধিহীন। শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তাঁহার পুত্রগণ দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। দারা অবশ্য দিল্লীতে থাকিতেন। তিনি ছিলেন এলাহাবাদ ও মুলতানের শাসনকর্তা। ঔরংজেব মুরাদকে সাম্রাজ্যের অংশ দিবেন এই আশা দিয়া নিজপক্ষে টানিয়া লইলেন। সুজা দিল্লীর পথে বারাণসীর নিকট সম্রাটের বাহিনীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ঔরংজেব ও মুরাদের যুগ্মবাহিনী ধর্মাট নামক স্থানে এক যুদ্ধে মোগল সম্রাটের সৈন্যকে পরাজিত করিল। ইহার পর দারা ঔরংজেব ও মুরাদকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সামুগড়ের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলে ঔরংজেব আগ্রা দুর্গ অধিকার করিলেন এবং বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহানকে বন্দী করিলেন। এইভাবে স্বার্থ-সিদ্ধির পর তিনি মুরাদকেও বন্দী করিলেন। বন্দী অবস্থায় কয়েক বৎসর পর ঔরংজেব তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। এদিকে সুজা ঔরংজেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া খাজোয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া আরাকানে পলাইয়া গেলেন। পলাতক অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হইল। দারাশিকো ঔরংজেবের বিরুদ্ধে শেষ চেষ্টা করিতে গিয়া দেওরাইয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং পলায়ন করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন। ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। এইভাবে দারা, সুজা ও মুরাদের মৃত্যু ঘটিলে ঔরংজেবের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল। বৃদ্ধ শাহ্‌জাহান বন্দী অবস্থায় নানা প্রকার নির্যাতন ভোগ করিয়া ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মরিয়া বাঁচিলেন।

শাহ্‌জাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ



শাহ্‌জাহান

ঔরংজেব : ধর্মাট, সামুগড়, খাজোয়া ও দেওরাইয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এবং একে একে সকল ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া ও বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহানকে বন্দী করিয়া ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'আলমগীর' অর্থাৎ পৃথিবী বিজয়ী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

ঔরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ)

ঔরংজেবের চরিত্রে নানা প্রকার দোষ ও গুণের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তিনি যেমন ছিলেন সাহসী, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী তেমনি ছিলেন পরধর্ম-অসহিষ্ণু,

নিষ্ঠুর ও সঙ্কীর্ণমনা। সমরকুশল সেনাপতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন কূটকৌশলী হিসাবে তিনি যেমন ছিলেন উল্লেখযোগ্য তেমনি নৃশংসতা, স্বার্থ-লোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ত্রুটির জন্য তিনি ছিলেন নিন্দার্হ।

ঔরংজেবের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশে নানা প্রকার গোলযোগ শুরু হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অহোম জাতি অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং মোগল সাম্রাজ্যের সীমার অভ্যন্তরে আসিয়া হানা দেয়। আরাকানে মগ জাতি, উত্তরবঙ্গে কোচ জাতি অনুরূপ উপদ্রব শুরু করে। ঔরংজেব মীরজুম্লাকে উপদ্রবকারীদের দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মীরজুম্লা সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করিলেও স্থায়ীভাবে তিনি তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। ইহার পর ঔরংজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ যখন বাংলার সুবাদার তখন তিনি মগদের পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পোর্তুগীজ জলদস্যুদের ঘাঁটি সন্দীপ দ্বীপটি অধিকার করিয়া লন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান উপজাতিগুলিকে ঔরংজেব স্বয়ং দমন করিতে অগ্রসর হন। তিনি ইহাতে সফলকাম হইলেও দীর্ঘকাল সেখানে ব্যয়িত হওয়ার সুযোগে রাজপুত ও মারাঠাগণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রাজ্য বিস্তার : উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপদ্রব দমন



ঔরংজেব

দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যগুলি—বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয় করিবার ইচ্ছা ঔরংজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন সেই সময় হইতে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুইটি অধিকার করিতে সমর্থ হন। ইহা ভিন্ন তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীর হিন্দু রাজ্য দুইটিও তিনি অধিকার করেন। এইভাবে ঔরংজেব মোগল সাম্রাজ্যের সীমা দাক্ষিণাত্যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার করিতে সমর্থ হন।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, সম্রাটের মর্যাদা প্রভৃতির দিক হইতে বিচার করিলে ঔরংজেবের দক্ষতার পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্কীর্ণ, পরধর্ম-অসহিষ্ণু নীতি, হিন্দুদের প্রতি জিজিয়া কর স্থাপন, শিখ, মারাঠা, রাজপুত জাতির প্রতি তাঁহার অদূরদর্শী নীতি সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। জাঠ, বুন্দেলা ও সৎনামী বিদ্রোহ, শিখ বিদ্রোহ, রাজপুত জাতির বিরোধিতা, দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতির বিরোধিতা আকবরের উদার নীতির ফলে গঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।

ঔরংজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

ঔরংজেব ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত গোঁড়া ও ধর্মভীরু ছিলেন, কিন্তু তিনি ধর্মের দ্বারা তাঁহার রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইতে দিয়া মোগল

সাম্রাজ্যের পতনের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানদের দমন করিতে গিয়া কালক্ষেপ যেমন মারাঠা ও রাজপুত জাতিকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়াছিল তেমনি দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয় এবং মারাঠাদের সহিত যুঝিতে গিয়া কালক্ষেপের ফলে উত্তর-ভারত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, কেন্দ্রীয় শাসনও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

ঔরংজেবের সঙ্কীর্ণতা মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তির দুর্বলতার কারণ

ঔরংজেবের অনুদার সন্দিগ্ধ মন অপরের সততায় বিশ্বাস করিতে পারিত না। ফলে তাঁহাকে নিজেই সবকিছুর উপর দৃষ্টি রাখিতে হইত। কিন্তু অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও সামরিক দায়িত্বসংক্রান্ত সবকিছু সুদক্ষভাবে পরিচালনা তাঁহার পক্ষে কেন, কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। আকবরের উদার পরধর্মসহিষ্ণু নীতি এবং প্রজাবর্গের প্রতি সমব্যবহার যেমন তাঁহাকে ভারতের জাতীয় সম্রাটে পরিণত করিয়াছিল তেমনি ঔরংজেবের ধর্মান্ধ, পরধর্ম-অসহিষ্ণু, সঙ্কীর্ণ নীতি তাঁহাকে সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমানদের সম্রাটে রূপান্তরিত করিয়াছিল। হিন্দু, রাজপুত —এক কথায় অ-মুসলমান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও অখণ্ড আনুগত্যে যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ঔরংজেবের অনুদার নীতি অ-মুসলমানদের বিদ্রোহী করিয়া এমনকি, সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান ভিন্ন অপরাপর মুসলমানের বিরাগ উৎপাদন করিয়া সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্যন্ত দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন: ঔরংজেবের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার সুযোগে মোগল দরবারে অভিজাতগণ ইরাণী (শিয়া ধর্মাবলম্বী) ও তুরাণী (সুন্নী ধর্মাবলম্বী) এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াইতে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইলেন। অপর দিকে এই দুইয়ের এক বিরোধী দলের সৃষ্টি হইল। উহা 'হিন্দুস্থানী' দল নামে পরিচিত হইল। এইভাবে মোগল বাদশাহদের ক্ষমতা দরবারের অভিজাতবর্গ এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের শাসনকর্তাদের মধ্যে বণ্টিত হইয়া গেল। বিহারের সুবাদার সৈয়দ হুসেন আলি ও এলাহাবাদের সুবাদার সৈয়দ আব্দুল্লা—এই সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে মোগল সম্রাটগণ ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন। এইভাবে যখন সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল তখন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সুবাদারগণ ও বিভিন্ন জাতি স্বাধীন হইয়া যাইতে লাগিল। এই ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতার সুযোগে পারস্যের সম্রাট নাদির শাহ্ এবং আহম্মদ শাহ্ আব্‌দালী বা দুর্‌রানী ভারত আক্রমণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া গিয়াছিলেন। নাদির শাহ্ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং আহম্মদ শাহ্ আব্‌দালী ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য শুধু নামেই টিকিয়া রহিল, সাম্রাজ্য বা সম্রাটসুলভ ক্ষমতা আর তখন ছিল না।

বহিরাগত আক্রমণ

মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা, ঔরংজেবের ধর্মান্ধনীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, আকবরের পরবর্তী সম্রাটদের জাতীয়তাবোধের অভাব, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে

কলহ ও ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা, ঔরংজেবের ভ্রান্ত দাক্ষিণাত্য নীতি সবকিছু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ঔরংজেবের আমলে মোগল সাম্রাজ্যের যে পতনোন্মুখতার সূচনা হইয়াছিল তাহা রোধ করা তাঁহার দুর্বল বংশধরদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্বলতা দেখা দিলে প্রদেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা করা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা মাত্রেরই প্রধান ত্রুটি ছিল। মোগল সাম্রাজ্য সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল বলিয়া ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্বলতা দেখা দিলে মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। এমতাবস্থায় বহিরাগত আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া গিয়াছিল। এই সকল আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উভয় প্রকার কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন

H.E.

দশম অধ্যায়

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইস্‌লামের প্রভাব

(Impact of Islam on Indian Society and Culture)

ইস্‌লামীয় সভ্যতার প্রভাব (Impact of Islam) : মুসলমানদের আগমনের পূর্বাবধি যে-সকল বৈদেশিক জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল সেগুলিকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। বহিরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, মুসলমানগণ যখন ভারতে আসেন তখন মুসলমান সভ্যতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি রূপ ছিল। মুসলমানগণ এ-সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ইহা ভিন্ন মুসলমান আক্রমণের কালে জনসাধারণের উপর যে-সকল নিষ্ঠুরতা এবং ভারতীয় সমাজের উপর যে-ধরনের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও ভারতীয় সভ্যতা ও ইস্‌লামীয় সভ্যতার সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। মুসলমানদের নিকট অ-মুসলমানগণ হইলেন 'জিম্মি' আর ভারতীয়দের নিকট মুসলমানগণ হইলেন 'যবন' বা 'ম্লেচ্ছ'। ফলে এই দুই সমাজ ও সংস্কৃতি পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার জন্য সচেষ্ট হইল। ইস্‌লাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজে নানা প্রকার কঠোর বিধি-নিষেধও চালু হইল। স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু ধর্মের ও সমাজের রক্ষণশীলতা বহু গুণে বাড়ানো হইল। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে বাংলার রঘুনন্দন শিরোমণি এবং বিজয়নগরের

ইস্‌লামীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সংঘাত

হিন্দু ধর্ম ও সমাজের রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি : রঘুনন্দন, মাধবাচার্য

মাধবাচার্য ছিলেন সর্বাধিক বিখ্যাত। উপরি-উক্ত কারণে হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের পথে প্রথম দিকে কঠোর বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল।

সুলতানি আমলে (Under the Sultanate):

দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে ইস্‌লামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও হিন্দু তথা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে যে বিভেদের মনোভাব প্রথম হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে বিদ্বেষ ও পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলমান মনীষী অল্‌বিরুণী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া উপনিষদ্ পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। উপনিষদের একেশ্বরবাদ ও ইস্‌লাম ধর্মের একেশ্বরবাদের সামঞ্জস্য ক্রমে মুসলমান সমাজকে হিন্দু ধর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিল। একে অপরের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবার ফলে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইল। ইহা ভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলেও হিন্দু সমাজের বহু আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ করিল। হিন্দুদের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া সুলতানদের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবার ফলে মুসলমান সমাজের আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদও হিন্দু সমাজে স্থানলাভ করিতে লাগিল। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই প্রীতি ও সৌহার্দ্য জন্মিতে লাগিল। এই পরস্পর প্রীতির মনোভাব হইতে বাংলাদেশে সত্যপীরের পূজার উদ্ভব ঘটে। হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পীরদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে নামদেব, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্মজ্ঞানীর উদ্ভব ঘটিল। ইহারা প্রত্যেকেই হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই এই ধারণা প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরকে পাইবার বা ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথ মাত্র, একথাই এই সকল ধর্মজ্ঞানী বলিতেন। নামদেব, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল। যবন হরিদাস ছিলেন প্রথমে একজন মুসলমান। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এই সমন্বয়ের চেষ্টা সুলতানি আমলের শেষভাগে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের উদারচেতা সুলতানদের চেষ্টা এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরস্পর প্রভাব বিস্তার

পারস্পরিক শ্রদ্ধা

ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের চেষ্টা

হুসেন শাহ্ যখন বাংলাদেশের সুলতান ছিলেন তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছিল। হুসেন শাহ্ ছিলেন পরধর্মসহিষ্ণু সুলতান। তাঁহার আমলে হিন্দু-মুসলমান সমাজে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অতি সুন্দর অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। হুসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহ্ এমনকি হুসেন

হুসেন শাহের আমলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা

শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর নামও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিরা আরবী ও ফারসী ভাষায় তখন যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন।

বাংলাদেশ ভিন্ন কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবিদিন হুসেন শাহের ন্যায় উদারচেতা সুলতান ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন হিন্দু-বিদ্বেষী। তাঁহার পিতার রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু জৈনুল আবিদিন তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন। তিনি হিন্দুদের উপর হইতে ঘৃণ্য জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়া মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি সংস্কৃত এবং কাশ্মীরী গ্রন্থের আরবী ও ফারসী অনুবাদ করাইয়া নিজ মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থাদি যেমন আরবী ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন সেরূপ বহু আরবী ও ফারসী গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার উদারতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য তিনি 'কাশ্মীরের আকবর' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের জৈনুল আবিদিন

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরস্পর প্রভাব ও মিলনের ফল অপর একটি ধারায় প্রকাশলাভ করিয়াছিল। ইহা ভক্তিবাদ নামে পরিচিত। হিন্দু ধর্মে ভাগবত ধর্ম ও ভক্তিবাদ এবং ইস্‌লামের সুফীবাদে মানুষকে মানুষ হিসাবে এবং সকল মানুষকে সমান চক্ষে দেখিবার নীতি প্রচার করিয়াছিল। এই সমন্বয়ের প্রয়োজন যখনই হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মহাপুরুষগণ উপলব্ধি করিলেন তখনই ধর্মের ক্ষেত্রে আসিল এক নূতন ভাব। ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা, মানুষকে ভালবাসিয়া সেই ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানের সৃষ্ট সবকিছুকে ভালবাসিবার ইচ্ছা সেই যুগে প্রকাশ পাইল। সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ উভয় ধর্মমতই ভগবানের সহিত মানুষের একাত্মবোধ এবং মানুষে মানুষে সমতা প্রচার করিয়াছিল। সুফী ধর্মজ্ঞানীদের মধ্যে নিজাম-উদ্দিন আউলিয়া, মইনুদ্দিন চিস্‌তি প্রভৃতি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। নিজাম-উদ্দিন এবং মইনুদ্দিন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন।

ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ

বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতান বংশের ইয়ুসুফ্ আদিল শাহ্ এবং দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের আমলে বিজাপুরে পরধর্মসহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেডোস্ টেলর (Meadows Taylor) নামক জনৈক ইংরেজ বিজাপুরের সুলতানদের উদারতার ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।*

আদিল শাহী বংশের উদারতা

ধর্ম-সংস্কারকগণ (Religious Reformers) : দাক্ষিণাত্যে চতুর্দশ শতকে রামানন্দ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ রাম-সীতার উপাসনার মধ্য দিয়া ভগবানকে উপলব্ধির চেষ্টা করেন। তিনি ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। জাতি-ধর্মনির্বিশেষে তিনি সকলকে তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন। মুচি, মেথর, হিন্দু, মুসলমান সকল শ্রেণীর ও জাতির লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ

রামানন্দ

* Vide *An Advanced History of India*, p. 358 (3rd Edn., 1967).

করিয়াছিল। বিখ্যাত মুসলমান ধর্মজ্ঞানী কবীর তাঁহার শিষ্য ছিলেন। রামানন্দ সমগ্র উত্তর-ভারতে তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। রাম ও রহিম এক এবং অভিন্ন একথা তিনি বলিতেন।

নামদেব

মহারাষ্ট্রে নামদেব নামে জনৈক ভক্তিবাদের প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি ভক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি ছিলেন জাতিতে দরজী। ঘটা করিয়া পূজাপার্বণ বা মূর্তি পূজার তিনি সমর্থন করিতেন না। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়াই ছিল তাঁহার ধর্মপথের নির্দেশ। জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি হিন্দু, মুসলমান সকলকেই তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন।



কবীর

কবীর

কবীরের জন্মপরিচয় সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। কেহ কেহ তাঁহাকে আসলে ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যাহা হউক পরে তিনি ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। বৃত্তিতে তিনি ছিলেন একজন তন্তুবায়। প্রাপ্ত বয়সে তিনি রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অতি সহজ ও সরল ভাষায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিতেন। তিনি বলিতেন যে, হিন্দুদের রাম আর মুসলমানদের আল্লাহ্ বা রহিম এক এবং অভিন্ন। হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথ মাত্র।



নানক

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন একজন সামান্য ব্যবসায়ীর পুত্র। প্রথম জীবন হইতেই ধর্মকর্মে তাঁহার গভীর অনুরাগের সৃষ্টি হয়। প্রথমে কিছুকাল ব্যবসায়ে কাটাইবার পর তিনি ধর্মকর্মে মনোযোগী হন। ব্যবসায় করিতে গিয়া বহু বার তিনি নিজের অর্থ গরীব-দুঃখী, সাধু-সন্ন্যাসীদের

মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম সাধনা শুরু করিয়া তিনি নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। তিনি একবার মক্কাও গিয়াছিলেন। নানক কোন জাতিভেদ মানিতেন না। সকল ধর্মের সমন্বয়সাধন ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি যে-ধর্মের প্রচার করেন উহা 'শিখ' ধর্ম নামে পরিচিত। 'শিখ' কথাটির অর্থ হইল 'শিষ্য'। নানক জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলকেই তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন।

নানক

নানকের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেব। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতার নাম ছিল শচীদেবী। শ্রীচৈতন্যের আসল নাম ছিল বিশ্বম্ভর। আদর করিয়া তাঁহাকে গৌরাঙ্গ, নিমাই প্রভৃতি নামেও ডাকা হইত। চব্বিশ বৎসর বয়সে নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। ইহার পর তাঁহার নাম হয় শ্রীচৈতন্য। তিনি বাংলাদেশ, উড়িষ্যা, বৃন্দাবন, দক্ষিণ-ভারত পর্যটন করিয়া তাঁহার উদার ধর্মমত প্রচার করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা, জীবের প্রতি দয়া, সকল মানুষকে সমানভাবে দেখা প্রভৃতি ছিল শ্রীচৈতন্যের বাণী। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। মুসলমানদের মধ্য হইতেও তিনি তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিতেন। ৪৮ বৎসর বয়সে পুরীর নীলাচলে তিনি দেহরক্ষা করেন।

শ্রীচৈতন্য



শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্যের বাণী

রাঠোর-দুহিতা কৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণা মীরাবাঈ ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবান প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মেবারের রাণা কুম্ভের সহধর্মিণী। ব্রজভাষায় গানের মাধ্যমে তিনি রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন। তাঁহার অসংখ্য কৃষ্ণপ্রেম গান কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ব্যাপক প্রচার করিয়াছিল এমন নহে, হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিরও সৃষ্টি করিয়াছিল।

মীরাবাঈ

নামদেব, রামানন্দ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ সেই যুগে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ও ধর্মের মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর ছিল তাহা ভাঙিয়া দিয়া সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সর্বধর্ম সমন্বয়

সাহিত্য ও শিল্প (Literature and Art): সুলতানি আমলে আরবী, ফারসী এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইতিহাস-গ্রন্থ, জীবন-স্মৃতি প্রভৃতিও রচিত হইয়াছিল। ফারসী ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আমীর খসরু। জিয়া-উদ্দিন বরণী ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পদাঙ্ক পরবর্তী কালে—সুলতানি আমলে অনুসৃত হইয়াছিল। মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজও সে-যুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিদেশী পর্যটক ইবন্‌-বতুতার বর্ণনায় সে-যুগের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

আরবী ও ফারসী সাহিত্য

হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে চাঁদ বরদৈ, রামানন্দ, কবীর, জগনায়ক, গোরখনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রাধাকৃষ্ণের ভক্তি ও প্রেম সম্পর্কে ব্রজভাষায় বহু গীত সেই যুগে রচিত হইয়াছিল। ফারসী ও হিন্দী ভাষা ভিন্ন হিন্দী ও ফারসীর সংমিশ্রণে উর্দু ভাষারও উদ্ভব সে-যুগেই ঘটিয়াছিল।

হিন্দী সাহিত্য

সুলতানি আমলে প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার সর্বাধিক উন্নতি ঘটিয়াছিল। হুসেন শাহ্‌ ও তাঁহার পুত্র নুসরৎ শাহ্‌ এবং তাঁহাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ—পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা এ-বিষয়ে খুবই সহায়ক হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মালাধর বসু, পরমেশ্বর কবীন্দ্র প্রভৃতি তখন তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনা দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মালিক জয়সীর পদ্মাবৎ কাব্য প্রভৃতিও ঐ যুগে রচিত হইয়াছিল। শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কতকাংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুসেন শাহ্‌, নুসরৎ শাহ্‌, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতি সুলতান ও পদস্থ রাজকর্মচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। রূপ গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের মন্ত্রী। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সে-যুগের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

বৈষ্ণব পদাবলী, মহাকাব্য প্রভৃতি

পাঞ্জাবী ভাষা, মারাঠী সাহিত্য প্রভৃতিরও সে-যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবিদিনের পৃষ্ঠপোষকতায় তথাকার আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার আদেশে আরবী ও ফারসী গ্রন্থাদির হিন্দী অনুবাদ এবং হিন্দী ও কাশ্মীরী গ্রন্থাদির আরবী ও ফারসী অনুবাদ করা হইয়াছিল।

পাঞ্জাবী, মারাঠী, কাশ্মীরী ভাষা ও সাহিত্য

শিল্পের ক্ষেত্রে সুলতানি যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও প্রীতির সুফল সে-যুগের স্থাপত্য

শিল্প : হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য রীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ (Indo-Saracenic art)

শিল্পেও প্রকাশলাভ করিয়াছিল। হিন্দু ও ইস্‌লামীয় স্থাপত্য শিল্পের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ সে-যুগে দেখা গিয়াছিল। 'কুতবমিনার', 'আলাই দরওয়াজা', 'জমায়েতখানা মসজিদ', 'ফিরোজ শাহের সমাধি-সৌধ' প্রভৃতি দিল্লীর স্থাপত্য নিদর্শনগুলি সে-যুগের স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের চমৎকার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। দিল্লী ভিন্ন জৌনপুর, গুজরাট, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত স্থাপত্য কৌশল প্রকাশলাভ করিয়াছিল। জৌনপুরের প্রাসাদ, মসজিদ প্রভৃতিতে হিন্দু স্থাপত্য রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট রহিয়াছে। জৌনপুরের অতাল মসজিদ, গুজরাটের মাকিজ মসজিদ প্রভৃতি সে-যুগের স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। বহু স্থানে প্রাচীন হিন্দু মঠ, মন্দির প্রভৃতির সামান্য পরিবর্তনসাধন করিয়া মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছিল। এগুলিতে স্বভাবতই হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য কৌশলের সংমিশ্রণ দেখা যায়। বাংলাদেশের গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্থাপত্য নিদর্শনগুলি আজিও দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া থাকে। বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পে ইটের ব্যবহার দেখা যায়। অন্যান্য স্থানে ইট অপেক্ষা পাথরেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। গৌড়ের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা, কদম রসুল, তাঁতিপাড়া মসজিদ প্রভৃতি এখনও সে-যুগের শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে টিকিয়া আছে।

দিল্লী

জৌনপুর, গুজরাট, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের গৌড় ও পাণ্ডুয়া

সমাজ ও অর্থনীতি (Society and Economy): সুলতানি আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জিয়া-উদ্দিন বরণী, মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ, আমীর খস্‌রু প্রভৃতি রচয়িতার রচনা হইতে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, বিদেশী ভ্রমণকারী—যথা, ইব্‌ন্‌-বতুতা, মাহুয়ান, নিকোলো কন্টি, এথেনিসিয়াস নিকিতিন, পায়েজ, নুনিজ প্রভৃতির বিবরণে সে-যুগের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিদেশী পর্যটক ও লেখকদের বর্ণনা

সুলতানি আমলে সমাজের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তারপর স্থান ছিল অভিজাত শ্রেণীভুক্ত মালিক ও আমীর-ওম্‌রাহ্‌দের। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিতে সাধারণ রাজকর্মচারী এবং ব্যবসায়ী ও বণিকদের বুঝাইত। ইহাদের নিম্ন স্তরে ছিল কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়। মালিক এবং আমীর-ওম্‌রাহ্‌গণ সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। দেশের সর্বাধিক পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি ও ধনদৌলত তাঁহাদের হস্তে ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকেরই অভিজাত শ্রেণীর মত অর্থ ও ধনসম্পদ ছিল। ধনদৌলত ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার কু-অভ্যাস, মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ে এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সমকক্ষ কয়েকটি বণিক পরিবারেও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় এই সকল দোষত্রুটি

সুলতান, অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমজীবী

হইতে মুক্ত ছিল। মুসলমান রাজত্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির অধিকার নানাভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। পর্দাপ্রথার প্রবর্তন, পরিবারের বাহিরে শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ না করা, প্রভৃতি তখনকার হিন্দু সমাজে চালু হইয়াছিল। সেই-যুগে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নানা প্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল।

নারী জাতির অধিকার সঙ্কুচিত

কৃষি ও শ্রম শিল্প ছিল সে-যুগের প্রধান উপজীবিকা। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমেও বহু লোক জীবিকার্জন করিত। গ্রাম ছিল তখনকার অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ফলেই তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনদৌলত দেশে সঞ্চিত হইয়াছিল। অবশ্য এই ধনদৌলতের অতি সামান্য অংশই যাহারা প্রকৃত উৎপাদনকারী তাহাদের হাতে থাকিত। অত্যধিক করভার, উচ্চহারে রাজস্ব ভিন্ন নানা প্রকার অবৈধ কর প্রভৃতির চাপে জনসাধারণের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। আমীর খস্‌রু বলিয়াছেন যে, দরিদ্র কৃষকদের রক্ত-বিগলিত অশ্রু যেন জমাট বাঁধিয়া সুলতানের মুকুটের মণিমুক্তায় পরিণত হইয়াছে—অর্থাৎ গরীবদের শোষণ করিয়াই সুলতান এবং অভিজাত শ্রেণীর অর্থ ও ঐশ্বর্য সঞ্চিত হইয়াছিল।

কৃষি

শিল্পের মধ্যে কাগজ, কাপড়, মদ, চিনি, জুতা, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। রেশম ও পশম বস্ত্রাদির উৎপাদনও যথেষ্ট ছিল। বাংলাদেশ ও গুজরাট সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিদেশী পর্যটকগণ বাংলাদেশের সমৃদ্ধির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কৃষিজাত দ্রব্যাদি, নানা প্রকার বস্ত্র, নীল, আফিং প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী করা হইত। বিদেশ হইতে ঘোড়া, ক্রীতদাস, খচ্চর এবং নানা প্রকার বিলাস-সামগ্রী আমদানী করা হইত। সেই সময়ে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত কম ছিল। ইব্‌ন্‌-বতুতা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অপর কোন স্থানেই এত সস্তায় জিনিসপত্র তিনি দেখিতে পান নাই।

শিল্প

হিন্দু প্রজাদের উপর সে-যুগে নানা প্রকার অবিচার করা হইত। তাহাদিগকে জিজিয়া কর, তীর্থ কর প্রভৃতি দিতে হইত। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাহাদিগকে রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। আলা-উদ্দিনের আমলে হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য দক্ষিণ-ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্যে জনসাধারণের অবস্থা খুবই উন্নত ছিল সেই কথা আব্দুর্‌রজাক, নিকোলো কন্টি, পায়েজ, নুনিজ প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়।

হিন্দুদের অবস্থা

মোগল আমলে (Under the Mughals):

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন (Social and Religious Life): মোগল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সেই

যুগের ইতিহাস-গ্রন্থাদি ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। মোগল যুগে ইওরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে র‍্যাল্‌ফ ফিচ্‌, হকিন্স্‌, টমাস রো, টেরি, পেলসার্ট, তেভার্নিয়ে, বার্ণিয়ে, মাহুচি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইওরোপীয় পর্যটকগণ

এই সকল বিদেশী পর্যটকের বিবরণ হইতে মোগল যুগের সমাজ, অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। বার্ণিয়ের বর্ণনায় বাংলাদেশের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কথা পাওয়া যায়। তেভার্নিয়ের বর্ণনা হইতে মোগল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা—ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়।

স্থলতানি আমলের ন্যায়ই মোগল যুগের সমাজ প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বাদশাহ্ ও অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। বাদশাহ্ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতিই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন কোন বাদশাহ্ অবশ্য এইসব উচ্ছৃঙ্খলতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। বাদশাহ্ ও অভিজাত শ্রেণীর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল নানা ধরনের এবং বহুসংখ্যক। সম্রাট আকবরের জন্য বৎসরে এক হাজার পোশাক প্রস্তুত করা হইত। বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন অত্যধিক অর্থশালী ব্যক্তির জীবনে অভিজাত শ্রেণী-সুলভ বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল তাহাদের উপজীবিকা। তাহাদের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও নিষ্কলুষ। তাহাদের উপর সরকার হইতে অত্যধিক করভার চাপানো হইত। এজন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই অতি সাদাসিধা ধরনের জীবন যাপন করিয়া দারিদ্র্যের ভান করিত। সমাজের অধস্তন শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক এবং মুদি প্রভৃতি সাধারণ দোকানদার সম্প্রদায় লইয়া গঠিত। ইহাদের খাওয়া-পরার কোন অভাব না থাকিলেও অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।

বাদশাহ্ ও অভিজাত সম্প্রদায়

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

সাধারণ শ্রেণী

মোগল আমলেও হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও প্রীতির সম্পর্ক অটুট ছিল। সম্রাট আকবরের পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতির ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রীতির নিদর্শন তৎকালীন সাহিত্যে প্রকাশলাভ করিয়াছিল। হিন্দুদের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার রীতি স্থলতানি আমল হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল। উহা মোগল যুগেও অপরিবর্তিত ছিল। মুসলমান কবি আলাওল 'পদ্মাবতে'র বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ধর্মানুষ্ঠানেও পরস্পর সৌহার্দ্য ও মিলনের পরিচয় পাওয়া যায়। মোগল সম্রাট আকবর তাঁহার হিন্দু পত্নীদিগকে হিন্দু দেবদেবীর অর্চনা করিতে দিতেন। হিন্দুগণ মুসলমানদের মহরম ও অপরাপর অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। অনুরূপ মুসলমানগণও হিন্দুদের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতেন। হিন্দু দেবদেবীর প্রতিও কোন কোন মুসলমান ধর্মাবলম্বী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সেরূপ হিন্দুগণও মুসলমান পীর-পয়গম্বরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি

পরধর্মসহিষ্ণুতা

মোগল যুগে হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য ও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ-প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই নানা প্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। নানা প্রকার মন্ত্রতন্ত্র এবং রহস্যজনক ক্রিয়াকলাপে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই বিশ্বাস করিত।

কুসংস্কার

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition): ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। মোগল যুগে কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা। খাদ্যশস্য ভিন্ন কার্পাস, নীল, আখ, তুঁতে, তামাক প্রভৃতির চাষ হইত। বারিপাতের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা হেতু অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ফলে সময় সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কৃষি ভিন্ন নানা প্রকার শিল্প হইতেও এক বিরাট সংখ্যক লোকের জীবিকা অর্জিত হইত। শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সূতী বস্ত্র, রেশমী বস্ত্র, মসলিন, শাল, গালিচা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পোশাকী কাপড়, রঙিন কাপড় প্রভৃতিও প্রস্তুত হইত। এই সকল সামগ্রী ভারতের সর্বত্র এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হইত। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বাংলাদেশের সূতী বস্ত্র, ঢাকার মসলিন প্রভৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রহিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও শিল্পজাত সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য ছিল খুবই অল্প। আবুল ফজ্‌লের বর্ণনা হইতে জিনিসপত্র কিরূপ সস্তা ছিল সেই ধারণা পাওয়া যায়। একটি গরুর দাম তখন ছিল মাত্র দশ টাকা। চারিটি ছাগল তখন এক টাকায় পাওয়া যাইত। জিনিসপত্রের দাম এরূপ সস্তা ছিল বলিয়া বিদেশে ভারতীয় জিনিসপত্রের খুবই চাহিদা ছিল। প্রধানত সূতী বস্ত্র, মসলিন, সোরা, নীল প্রভৃতিই বিদেশে চালান হইত। সোনার মুদ্রা বা মোহর, রূপার টাকা, জিতল, জালালী প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের ও বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা তখন চালু ছিল।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

মুদ্রা

মোগল যুগে একাধিকবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সরকার দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা মাপ করিয়া দিতেন। কিন্তু তখনকার সরকারের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। সেজন্য এবং যানবাহনের অভাব হেতু খাদ্যশস্য এক স্থান হইতে অন্যত্র চালান দিবার অসুবিধা হইত বলিয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিত।

দুর্ভিক্ষের প্রকোপ

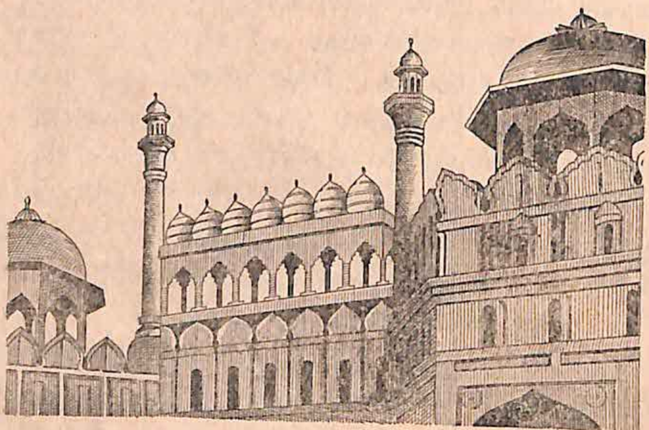
মোগল যুগে জনসাধারণের সাধারণভাবে খাওয়াপরার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু অপরদিকে বাদশাহ, আমীর-ওম্রাহ্‌দের ধনদৌলতের অভাব ছিল না। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। আগ্রা ও ফতেপুর শহর দুইটির সমৃদ্ধি ও জনবহুলতার কথা র‍্যাল্‌ফ ফিচের বিবরণে পাওয়া যায়। বুর্‌হান্‌পুর, বারাণসী, আহ্‌মদাবাদ, রাজমহল, বর্দ্ধমান, ঢাকা, হুগলী, পাটনা প্রভৃতি শহর সমৃদ্ধ ও জনবহুল ছিল বলিয়া মন্‌সেরেট নামে জনৈক ইওরোপীয় পর্যটক বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্থ ও ধনদৌলতের বৈষম্য

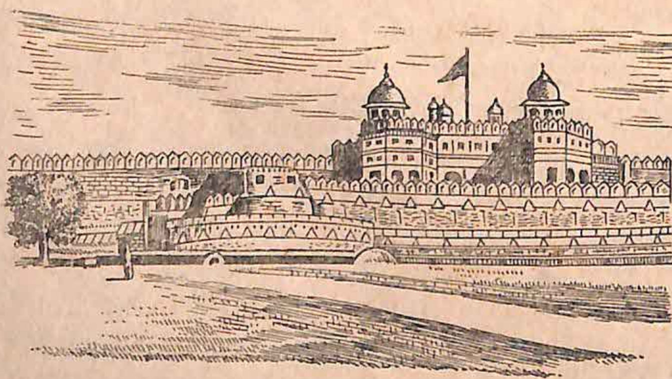
স্থাপত্য ও শিল্পকলা (Architecture and Art): দিল্লীর সুলতানি আমলের শিল্পরীতিতে ভারতীয় ও ইস্‌লামীয় শিল্পের সমন্বয় ও সংমিশ্রণ শুরু হইয়াছিল। উহাই মোগল যুগের শিল্প ও স্থাপত্যে চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল।

স্থাপত্য শিল্প

বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল বাদশাহ্‌দের সকলেই শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। একমাত্র ঔরংজেবই ছিলেন এ-বিষয়ের ব্যতিক্রম। বাবর তাঁহার স্বল্পকাল রাজত্বের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বহু সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি ভিন্ন সবই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হুমায়ুনের আমলেও কয়েকটি মসজিদ, সৌধ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। আগ্রা ও হিসারের সৌধগুলির মধ্যে দুইটি এখনও টিকিয়া আছে। স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাসে মোগল যুগের অন্তর্বর্তী শের শাহের রাজত্বকালও উল্লেখযোগ্য। সাসারামে তাঁহার নিজের সমাধি-সৌধটির পরিকল্পনা



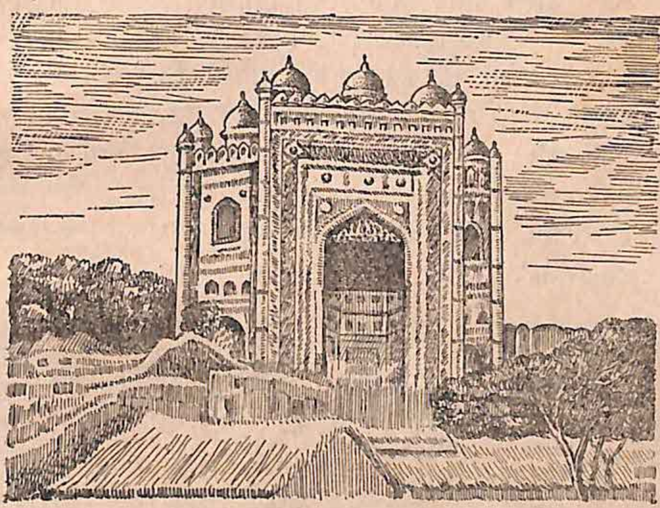
লালকেল্লা



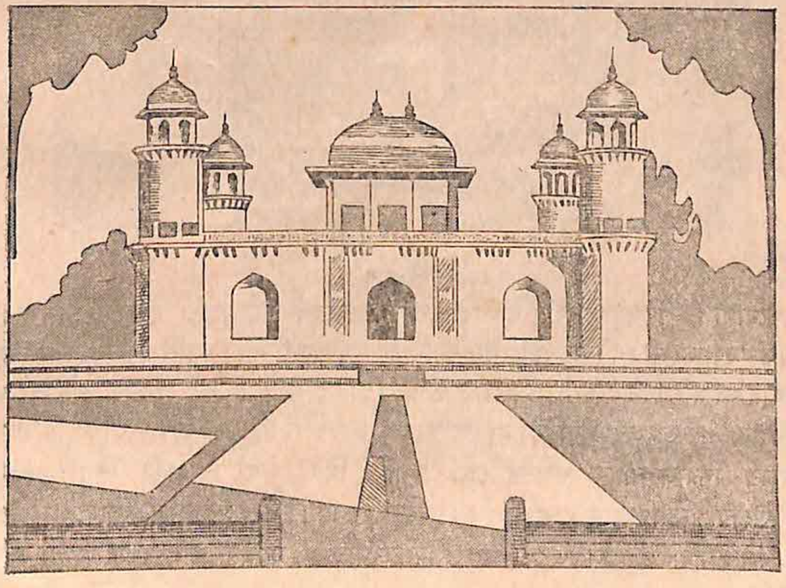
আগ্রার দুর্গ

শের শাহ্ তাঁহার জীবদ্দশাতেই করিয়া গিয়াছিলেন। দিল্লীর পুরাতন কেল্লাও তাঁহারই স্থাপত্য অনুরাগের নিদর্শন। শের শাহের স্থাপত্য শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মোগল বাদশাহ্ আকবরের রাজত্বকালে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাসাদ, সমাধি-

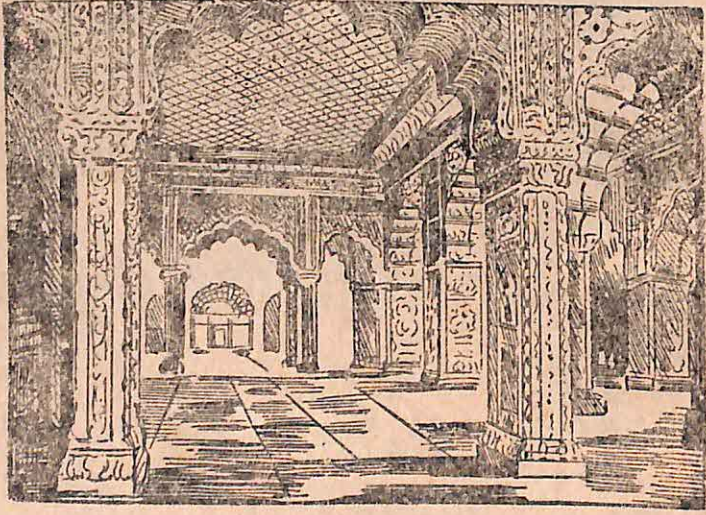


বুলন্দ্-দরওয়াজা



সৌধ ও স্মৃতি-সৌধ এবং বহু সংখ্যক দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। আগ্রার দুর্গ ও দিল্লীর লালকেল্লা এগুলির অন্যতম। ইহা ভিন্ন মিনার, প্রমোদোদ্যান প্রভৃতিও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হইয়াছিল। স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে আকবরের গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার আমলে নির্মিত বহু স্থাপত্য নিদর্শনের প্রায় সব কয়টিরই পরিকল্পনা আকবর স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার গভীর শিল্পানুরাগ ও শিল্পজ্ঞান ফতেপুর সিক্রির নির্মাণ-কৌশল ও সৌন্দর্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ফতেপুর সিক্রির 'বুলন্দ্-দরওয়াজা', সলিম চিস্তির 'সমাধি-সৌধ', 'পাঁচ মহল' প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচায়ক। আকবরের পুত্র সম্রাট জাহাঙ্গীরেরও শিল্পানুরাগ নেহাত কম ছিল না। সেকেন্দ্রায় আকবরের 'সমাধি-সৌধ', আগ্রায় ইতিমাদ্-উদ্-দৌলার 'সমাধি-সৌধ' জাহাঙ্গীরের আমলে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় বহন করিতেছে। মোগল বাদশাহ্দের মধ্যে শাহ্জাহানের শিল্পানুরাগ ছিল সর্বাধিক গভীর। তাঁহার আমলের শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে 'দেওয়ান-ই-আম্', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'মোতি মসজিদ', 'জুম্মা মসজিদ'

মোগল বাদশাহ্দের শিল্পানুরাগ

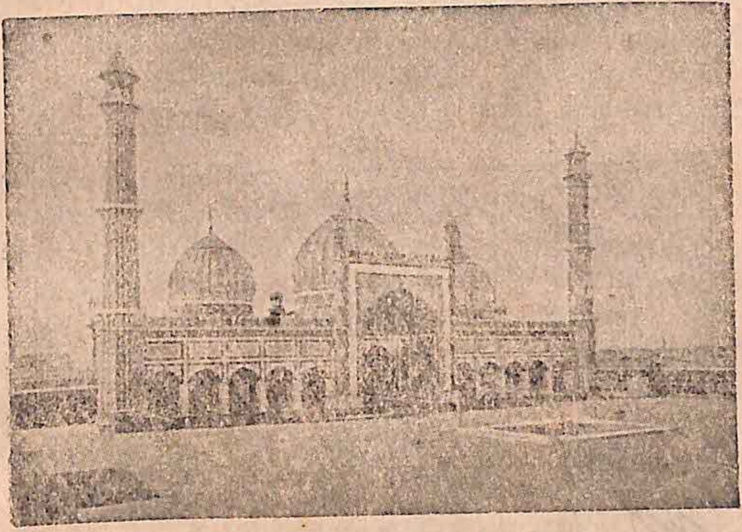


দেওয়ান-ই-খাস

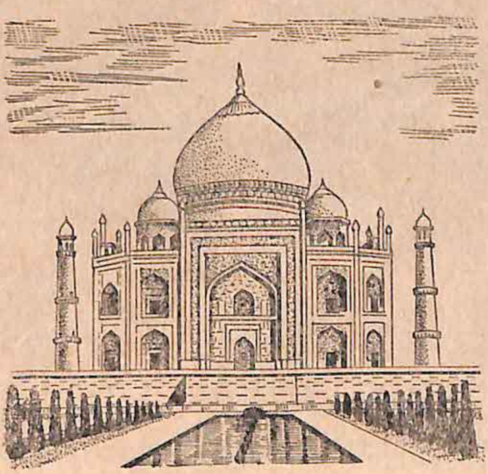
উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁহার পত্নীপ্রেমের সাক্ষ্যস্বরূপ মমতাজের দেহাবশেষের উপর নির্মিত 'তাজমহল' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির অন্যতম হিসাবে আজিও টিকিয়া আছে। পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের মধ্যে তাজমহল অন্যতম। বহু দেশী ও বিদেশী স্থপতি তাজমহলের পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী উহার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পারস্যের সিরাজ নামক শহরের শ্রেষ্ঠ স্থপতি মির্জা ঈশা, বাঙালী শিল্পী বলদেব দাস উহার নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহ্জাহানের আদেশে নির্মিত ময়ূর সিংহাসনটিও ছিল একটি অপূর্ব শিল্পকীর্তি। নাদির শাহ্ যখন দিল্লী লুণ্ঠন

করেন, তখন তিনি এই বহুমূল্য শিল্পকীর্তিটি লইয়া গিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহানের পরবর্তী কালে ঔরংজেবের উৎকট ধর্মান্ধতার ফলে শিল্পানুশীলন একবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মোগল স্থাপত্য তথা শিল্পকলার অবনতি দেখা দিয়াছিল।

মোগল যুগে চিত্র শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গ্রীক, ইরাণী ও চীনদেশীয় চিত্র-শিল্পরীতির সংমিশ্রণে মোগল যুগে এক অভূতপূর্ব চিত্র-শিল্পরীতি গড়িয়া



জুম্মা মসজিদ



তাজমহল

উঠিয়াছিল। আকবরের দরবারে বহু চিত্রশিল্পী ছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। আকবরের রাজত্বকালে চিত্র শিল্পের যে উৎকর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল, জাহাঙ্গীরের আমলে উহার চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। কিন্তু শাহজাহানের আমল হইতেই চিত্র শিল্পের প্রতি আর সেরূপ অনুরাগ ছিল না বলা যাইতে পারে এবং ঔরংজেবের আমলে উহা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

চিত্র শিল্প

মোগল আমলে রাজপুতদের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এক চিত্রশিল্প গড়িয়া উঠে। এগুলি 'রাজপুত চিত্র' হিসাবে পরিচিত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন সুর ও সামাজিক জীবনের নানা বিষয়ের উপর নানা প্রকার রাজপুত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজপুত চিত্রাঙ্কনরীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাঞ্জাবের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী অঞ্চল

পাহাড়ী শিল্পরীতি : কাংড়ার শিল্পোৎকর্ষ



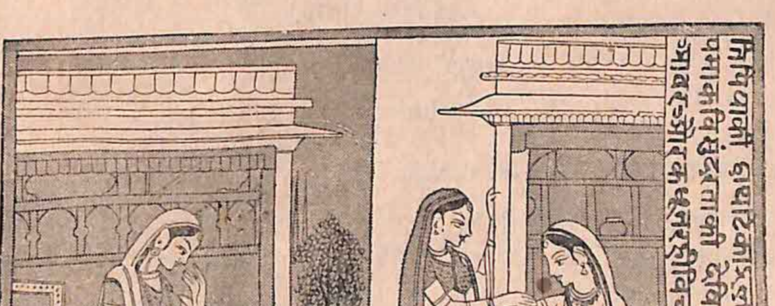
মোগল চিত্র

এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষভাবে কাংড়ায় পাহাড়ী চিত্রকলার উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের চিত্রকলার বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের জীবন, রামায়ণের কাহিনী, পুরাণের কাহিনী, সমাজ-জীবন প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

সঙ্গীত শিল্প

সঙ্গীত শিল্পেও মোগল যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তানসেন ছিলেন আকবরের অন্যতম সভাসদ্। তাঁহার দরবারে দেশী ও বিদেশী বহু সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত থাকিতেন। আকবরের পিতা হুমায়ুনের সঙ্গীতানুরাগ ছিল খুবই গভীর। কিন্তু আকবরের মধ্যে উহা অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছিল। বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে শিঙ্গা, বাঁশী, ঢাক প্রভৃতি সে-যুগে ব্যবহৃত হইত। জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মোগল যুগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। ঔরংজেব অবশ্য তাঁহার ধর্মান্ধতাবশত রাজসভা হইতে সঙ্গীতজ্ঞ, কবি প্রভৃতি সকলকেই বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল যুগের সঙ্গীত শিল্প জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া সেগুলি এযাবৎ আংশিকভাবে টিকিয়া আছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মোগল যুগের উৎকর্ষ নেহাত কম ছিল না। ইতিহাস-সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য, কাব্য—এই তিন প্রকার সাহিত্য-সৃষ্টিই মোগল যুগে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। বাবরের জীবনস্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আবুল ফজ্‌ল, ফৈজী, বদাউনী, আব্দুল হামিদ লাহোরী, কাঁফি খাঁ প্রভৃতি সকলে ঐ যুগের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আবুল ফজ্‌লের 'আকবরনামা' ও



পাহাড়ী চিত্র (কাংড়া)

'আইন-ই-আকবরী', বদাউনীর 'মন্তাখাব-উল্-তোয়ারিখ', ফৈজীর 'লীলাবতী' প্রভৃতি আকবরের আমলের অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টি। ঘিজ্‌লী ছিলেন আকবরের সভার শ্রেষ্ঠ কবি। জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী, তাঁহার আমলে আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'পাদশাহ্‌নামা', শাহ্‌জাহানের পুত্র দারাশিকো কর্তৃক উপনিষদ্ ও অথর্ব বেদের পারসীক অনুবাদ মোগল যুগের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। পারসীক ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হইয়াছিল। হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বীরবল (মহেশ দাস), ভগবান দাস, মানসিংহ, তোডরমল প্রভৃতি হিন্দী কবিতা রচনা করিয়া হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। রাজা বীরবল হাস্যরসাত্মক কবিতা রচনা করিয়া আকবরের নিকট হইতে 'কবিরায়' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। আব্দুল রহিম খাঁন হিন্দী ভাষায় বহু দোঁহা রচনা করিয়াছিলেন। সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিও সে-যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত, মঙ্গলকাব্যগ্রন্থ, কাশীদাসের মহাভারত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্য সে-যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন মারাঠী সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি সে-যুগে ঘটিয়াছিল। মোগল যুগে হিন্দুগণ ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া বাদশাহের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিতেন। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে আবার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন।

(মার্জিন: সাহিত্য; বাংলা সাহিত্য)

একাদশ অধ্যায়

মারাঠা ও শিখ শক্তি

(The Marathas and the Sikhs)

(ক) মারাঠাগণ (The Marathas)

মারাঠা অভ্যুত্থান (Rise of the Marathas): পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে হায়দরাবাদ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্য উপকূল ধরিয়া মহারাষ্ট্র দেশ বিস্তৃত। সহ্যাদ্রি, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত মহারাষ্ট্র দেশকে পর্বতসঙ্কুল ও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে প্রকৃতির কৃপণতা হেতু এই অঞ্চলের জনসাধারণকে জীবনধারণের জন্য অসাধারণ শ্রম করিতে হয়। প্রকৃতির কঠোরতার ফলে তাহারা স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু ও দুর্ধর্ষ। এইরূপ শক্তিশালী জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হইলে এক দুর্জয় শক্তিতে পরিণত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

(মার্জিন: পর্বতসঙ্কুল মহারাষ্ট্র দেশ)

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মারাঠা জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল। কিন্তু যোদ্ধা হিসাবে তাহারা যে অতিশয় দুর্ধর্ষ ছিল সে-পরিচয় দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলি জানিত। এজন্য সেই সকল সুলতানি রাজ্যে মারাঠাগণ সামরিক পদে নিযুক্ত হইত। মারাঠা জাতির সমরকুশলতা ভিন্ন ধর্ম-

(মার্জিন: মারাঠা জাতির অনৈক্য)

প্রবণতাও উল্লেখযোগ্য। একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি ধর্মপ্রচারক মারাঠা জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে মারাঠা জাতি এক গভীর জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই ঐক্যবোধকে কার্যকর করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন ক্ষমতাবান নেতার। শিবাজী সেই নেতার পদ গ্রহণ করিয়া মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ এক দুর্ধর্ষ সামরিক ও ধর্মপ্রাণ জাতিতে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতির দান

শিবাজী (Shivaji): শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথম জীবনে আহ্‌ম্মদনগরের সুলতানের অধীনে কাজ করিতেন। সেই সূত্রে তিনি ক্রমে সম্মান, প্রতিপত্তি এবং প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন। পুণা অঞ্চলে তাঁহাকে জায়গির দেওয়া হয়। পুণায় অবস্থানকালে শিবনের গিরিদুর্গে তাঁহার পুত্র শিবাজীর জন্ম হয় (১৬২৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৬৩০ খ্রীঃ)। ইহার অল্পকালের মধ্যেই শাহজী বিজাপুর সুলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী তুকাবাঈ-সহ সেখানে চলিয়া যান। শিশুপুত্র শিবাজী এবং তাঁহার মাতা জীজাবাঈ দাদাজী কোণ্ডদেব নামক জনৈক ধর্মভাবাপন্ন অথচ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণের অভিভাবকত্বাধীনে পুণায় বাস করিতে থাকেন।

জন্ম

বাল্যকাল

শিবাজী বাল্যকাল হইতেই মাতা জীজাবাঈ-এর মুখে তাঁহার পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী ও দাদাজী কোণ্ডদেবের নিকট রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। ধর্মের ভিত্তিতে এবং বীরত্বের দ্বারা এক বিশাল হিন্দু রাজ্য স্থাপনের আদর্শ তাঁহার অন্তরে গড়িয়া উঠে। তিনি ছেলেবেলায় বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না সে-বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না, তবে দাদাজীর নিকট যুদ্ধকৌশল শিক্ষা এবং তাঁহার ও মাতা জীজাবাঈ-এর মুখে হিন্দু বীরদের কাহিনী শ্রবণের ফলে অন্তরের বলিষ্ঠতা, আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠতা, সমরকুশলতা, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি গুণ শিবাজীর চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিজ আদর্শসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাল্যবয়স হইতেই তিনি মাওলী জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। পরে তাহাদিগকে লইয়া তিনি একটি সেনাবাহিনী গড়িয়া তোলেন।



শিবাজী

এদিকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যগুলি ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। সেই সুযোগ গ্রহণে শিবাজী ত্রুটি করিলেন না। তিনি তাঁহার মাওলী সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিজাপুর রাজ্যের তোরণা দুর্গটি অধিকার

(১৬৪৬ খ্রীঃ) করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন তোরণার অনতিদূরে তিনি রায়গড় নামক অপর একটি দুর্গও আক্রমণ করিলেন। দাদাজী কোণ্ডদেব শিবাজীর এই যুদ্ধ-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশায় শিবাজী বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যু হইলে (১৬৪৭ খ্রীঃ) শিবাজীকে বাধা দেওয়ার কেহ রহিল না। শিবাজী চকণ দুর্গ এবং আরও কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি দখল করিয়া পুণার সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলেন। বিজাপুর সুলতান শিবাজীর এই সকল কার্যকলাপে প্রথমদিকে ততটা বিচলিত হন নাই। কিন্তু ক্রমেই যখন শিবাজী নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া এবং এক একটি করিয়া বিজাপুর রাজ্যের দুর্গ দখল করিতে লাগিলেন, তখন শিবাজীর কার্যকলাপ বন্ধ করিবার সহজ উপায়স্বরূপ বিজাপুর সুলতান তাঁহার পিতা শাহজীকে বন্দী করিলেন। ফলে শিবাজী কিছুকাল বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ-নীতি ত্যাগ করিলেন। কয়েক বৎসর পরে পিতার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী পুনরায় নিজরূপ ধারণ করিলেন। তিনি জাওলীর মারাঠা রাজাকে হত্যা করাইয়া সেই রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইলেন। পর বৎসর শিবাজী মোগল বাহিনীর সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। ঔরংজেব সেই সময়ে ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। তিনি বিজাপুর রাজ্যের সহিত যখন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেই সুযোগে শিবাজী মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত জুনার ও আহম্মদনগর লুণ্ঠন করিলে ঔরংজেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে ঔরংজেবের হস্তে শিবাজীর পরাজয় ঘটিলে শিবাজী মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ঔরংজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে রওনা হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজী পুনরায় তাঁহার যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে বহু স্থান অধিকার করিয়া ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোঙ্কণের উত্তরাংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন।

বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

একে একে বহু দুর্গ জয়

মারাঠা-মোগল সংঘর্ষ

শিবাজীর ক্ষমতা বৃদ্ধি বিজাপুর সুলতানের নিরাপত্তার দিক দিয়াও কাম্য ছিল না। তিনি শিবাজীকে ধরিয়া আনিবার জন্য তাঁহার সেনাপতি আফজল খাঁকে প্রেরণ করিলেন (১৬৫৯ খ্রীঃ)। আফজল খাঁ সসৈন্যে অগ্রসর হইলে শিবাজী তাঁহার প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তিনি আফজল খাঁর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না। প্রতাপগড় দুর্গ জয় করা সহজ হইবে না দেখিয়া আফজল খাঁ কৌশলে শিবাজীকে নিজ শিবিরে আনিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। তিনি শিবাজীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নিজ শিবিরে শিবাজীকে আমন্ত্রণ করিলেন। আফজল খাঁর দুরভিসন্ধির সংবাদ পাইতে শিবাজীর বিলম্ব হইল না। তিনি আফজল খাঁর শিবিরে প্রস্তুত হইয়াই আসিলেন। শিবাজী প্রবেশ করিলে আফজল খাঁ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার ভান করিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিলেন এবং বক্ষে ছুরিকাঘাত

আফজল খাঁ ও শিবাজী

করিতে উদ্যত হইলেন। শিবাজী 'বাঘনখ' নামক ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাঁর বক্ষ চিরিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। আফজল খাঁর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তাঁহার সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে শিবাজীর অনুচরগণ তাহাদিগকে সহজেই পরাজিত করিতে সমর্থ হইল। শিবাজী দক্ষিণ-কোঙ্কণ এবং কোলহাপুর জেলা অধিকার করিয়া নিজ রাজ্য আরও বিস্তার করিলেন। অবশ্য পর বৎসর (১৬৬০ খ্রীঃ) বিজাপুর বাহিনী পান্হালা দুর্গটি তাঁহার নিকট হইতে জয় করিয়া লইল।

এদিকে ঔরংজেব পিতা সম্রাট শাহ্‌জাহানকে বন্দী ও কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীর সম্রাট হইয়াছিলেন। শিবাজীকে দমন করিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা-পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার উপর শিবাজীকে দমন করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। শায়েস্তা খাঁ প্রথমে শিবাজীকে পরাজিত করিয়া চকণ ও পুণা অধিকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন কল্যাণ জেলা হইতে মারাঠা প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া শিবাজীকে সাময়িকভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এমতাবস্থায় বাধ্য হইয়া শিবাজী বিজাপুর সুলতানের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। দুই বৎসর ধরিয়া তিনি শায়েস্তা খাঁর সহিত যুঝিয়া চলিলেন। তারপর এক রাত্রিতে শায়েস্তা খাঁ যখন নিজের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন শিবাজী অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। শায়েস্তা খাঁর পুত্র আবুল ফতাকে হত্যা করিয়া শিবাজী শায়েস্তা খাঁর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শায়েস্তা খাঁ প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন কিন্তু শিবাজীর তরবারির আঘাতে তিনি হাতের একটি আঙুল হারাইলেন। ইহার পর (১৬৬৪ খ্রীঃ) শিবাজী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিলেন। মাতুল শায়েস্তা খাঁর অকৃতকার্যতায় ঔরংজেব অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া এবার অম্বররাজ জয়সিংহ এবং সেনাপতি দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের কূটকৌশল ও মোগল বাহিনীর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে শিবাজী পরাজয় স্বীকার করিয়া পুরন্দরের সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হইলেন (১৬৬৫ খ্রীঃ)। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে শিবাজী মোগলদিগকে কয়েকটি জেলা ও মোট ২৩টি দুর্গ ছাড়িয়া দিতে এবং প্রয়োজনবোধে মোগল বাহিনীকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিবার কালে পুরন্দরের সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি মোগল সৈন্যকে সামরিক সাহায্য করিলেন। ইহাতে ঔরংজেব অত্যন্ত প্রীত হইয়া শিবাজীকে মোগল দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে স্বীকৃত না হইলেও শেষ পর্যন্ত জয়সিংহের বিশেষ অনুরোধে শিবাজী ঔরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইতে রাজী হইলেন এবং মাতা জীজাবাঈ-এর হস্তে শাসনকার্য পরিচালনার ভার সাময়িকভাবে অর্পণ করিয়া শিশুপুত্র শম্ভুজী-সহ আগ্রায় ঔরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ঔরংজেব শিবাজীকে উপযুক্ত সম্মান

শায়েস্তা খাঁ ও শিবাজী

শায়েস্তা খাঁর পলায়ন

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁর সহিত শিবাজীর যুদ্ধ—পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫ খ্রীঃ)

মোগল দরবারে শিবাজীর উপস্থিতি

প্রদর্শন করিলেন না। ইহাতে শিবাজীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ক্রোধবশত ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। সেই সুযোগে ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। সুচতুর শিবাজী অসুস্থতার ভান করিয়া দেবমন্দিরে পূজার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি ফল, মিষ্টি প্রভৃতি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রথম কয়েকদিন দ্বাররক্ষিগণ পরীক্ষা করিয়া যখন ঝুড়িতে সন্দেহজনক কিছুই দেখিতে পাইল না তখন তাহারা ঝুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখা ছাড়িয়া দিল। সেই সুযোগে একদিন শিবাজী ও তাঁহার পুত্র ঝুড়িতে করিয়া কারাগার হইতে পলাইয়া গেলেন (১৬৬৬ খ্রীঃ)। তারপর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন।

শিবাজীর পলায়ন

মোগলদের সকল কৌশল ব্যর্থ করিয়া এবং মোগল রক্ষীদের চক্ষে ধূলি দিয়া শিবাজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিলেন। ঔরংজেব শিবাজীকে পরাভূত করা অসম্ভব দেখিয়া তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন বেরার প্রদেশের কতক স্থান তাঁহাকে জায়গির হিসাবেও দান করিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই শিবাজী পুনরায় মোগলদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং একে একে তাঁহার হৃত রাজ্যের প্রায় সকল স্থান ও দুর্গ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত পরিমাণ অর্থলাভ করিলেন। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুরাট হইতে চৌথ দাবি করিলেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন : ঔরংজেব কর্তৃক 'রাজা' উপাধি দান

ইহার দুই বৎসর পর ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী রায়গড়ে মহাসমারোহে নিজ অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি 'ছত্রপতি', 'গো-ব্রাহ্মণ-প্রজাপালক' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি জিঞ্জি, ভেলোর এবং উহার নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া এক বিরাট মারাঠা রাজ্য গড়িয়া তোলেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজ্যাভিষেক : 'ছত্রপতি', 'গো-ব্রাহ্মণ-প্রজাপালক' উপাধি গ্রহণ

শিবাজী কেবল সমরকুশল সেনাপতি, দুর্ধর্ষ বীর ও অনন্যসাধারণ সংগঠকই ছিলেন না, তাঁহার চরিত্রবল, মহান আদর্শ, পরধর্মসহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি তাঁহার সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা তাঁহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব দান করিয়াছে। হিন্দু জাতি ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, আদর্শের প্রতি অকাতর অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ তাঁহার চরিত্রকে মহিমমণ্ডিত করিয়াছে। শিবাজী হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সত্য, কিন্তু মুসলমান বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি কোনদিন কোনপ্রকার অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন নাই। হিন্দু ধর্মের প্রকৃত উদার আদর্শ তিনি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। কোন স্থান অধিকার বা লুণ্ঠন করিবার কালে মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরান তাঁহার হস্তে আসিলে তাহা তিনি কোন মুসলমানকে ডাকিয়া দিয়া দিতেন। অপরাপর ধর্মাবলম্বীর ধর্মস্থান তাঁহার সেনাবাহিনী যাহাতে কলুষিত না করে

শিবাজীর চরিত্র

সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। শিবাজী নারীজাতির প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বৃদ্ধ, শিশু, নারী কেহই যাহাতে তাঁহার সেনাবাহিনীর আক্রমণকালে কোনভাবে অত্যাচারিত না হয় সেই বিষয়ে তাঁহার কঠোর নির্দেশ ছিল।

শিবাজীর সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা

শিবাজীর কর্মজীবনের প্রায় সকল সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যেও তিনি নিজ রাজ্যের সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন তিনি স্বয়ং। কিন্তু তিনি যথেচ্ছভাবে শাসনকার্য চালাইতেন না। তাঁহাকে সাহায্য করিবার ও পরামর্শদানের জন্য আটজন মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা 'অষ্টপ্রধান' নামে অভিহিত হইতেন। এই আটজন মন্ত্রী আটটি পৃথক পৃথক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

প্রদেশ, পরগণা, গ্রাম প্রভৃতির শাসনব্যবস্থা

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে ভাগ করা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি প্রান্ত আবার পরগণা এবং তরফে বিভক্ত ছিল। শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন বিভাগ ছিল গ্রাম। রাজ্যের বিভিন্নাংশের রাজকর্মচারিগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীনে ছিলেন।

রাজস্ব: চৌথ ও সরদেশমুখী

শিবাজী প্রজাবর্গের জমি জরিপ করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের দশভাগের চারিভাগ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করিতেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির প্রজাদের উপর মারাঠা সৈন্য আক্রমণ চালাইবে না, এই শর্তে শিবাজী তাহাদের নিকট হইতে 'চৌথ'—অর্থাৎ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'সরদেশমুখী'—অর্থাৎ রাজস্বের এক-দশমাংশ অতিরিক্ত কর হিসাবে গ্রহণ করিতেন।

সেনাবাহিনী: অশ্বারোহী—বর্গির ও শিলাদার এবং পদাতিক

শিবাজীর সেনাবাহিনী ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। অশ্বারোহী সৈন্যগণ আবার 'বর্গির' ও 'শিলাদার' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শিবাজীর সেনাবাহিনী পর্বতসঙ্কুল দেশে অতিশয় দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিল। শিবাজীর সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল অসাধারণ। কোন স্ত্রীলোক তাঁহার সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিত না। কোন স্থান আক্রমণ বা লুণ্ঠনের সময় কোন স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ বা শিশুর উপর অথবা কোন ধর্মস্থানের উপর কোনরূপ অত্যাচার বা আক্রমণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা

দুর্গ

শিবাজীর কতকগুলি সুরক্ষিত দুর্গও ছিল। এই সকল পার্বত্য দুর্গ শত্রুর পক্ষে দুর্ভেদ্য ছিল। শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্যের দুর্গসংখ্যা ছিল মোট ২৪০টি।

নৌ-বহর

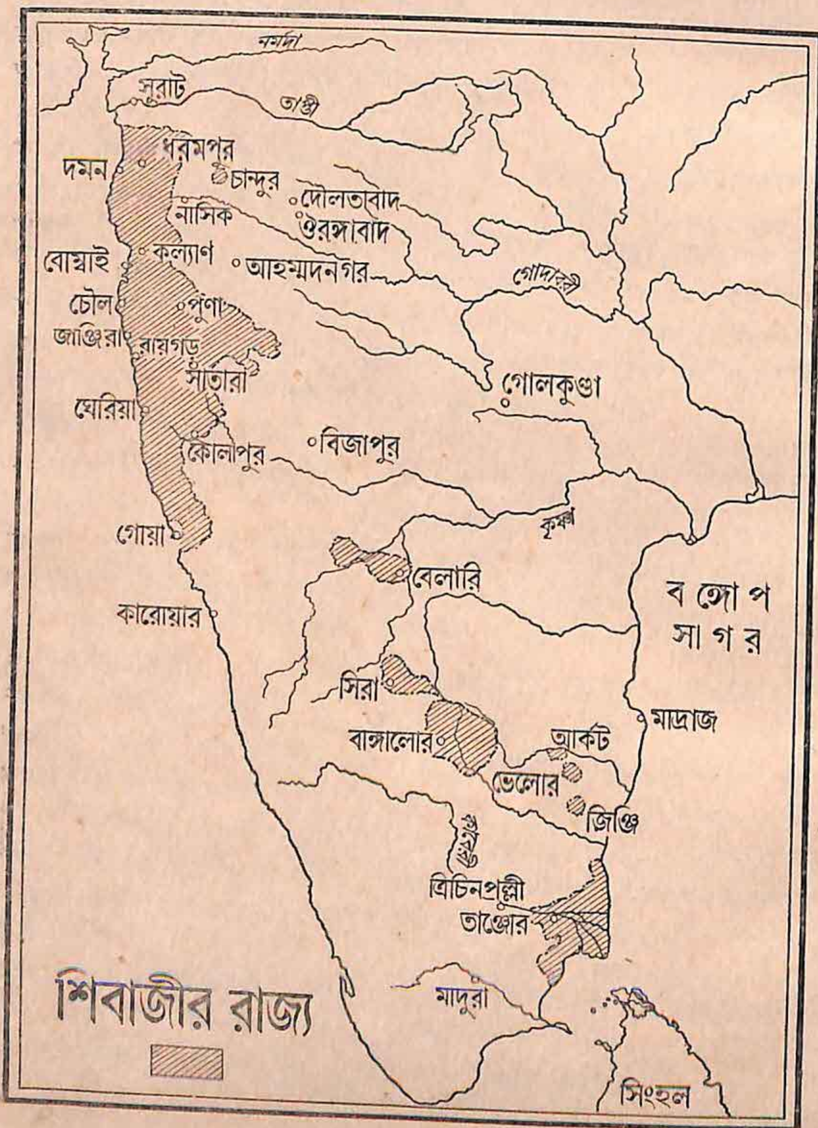
শিবাজী ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সামরিক সংগঠক। তিনি নৌবাহিনীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য তিনি মোট ২০০টি বিভিন্ন আকারের রণতরীর এক বিরাট নৌ-বহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা সমসাময়িক ঐতিহাসিক মাত্রেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক খাফি খাঁ শিবাজীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু তিনিও তাঁহার শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

খাফি খাঁর মন্তব্য

শিবাজীর অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মারাঠাগণ এক সঙ্ঘবদ্ধ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দুর্ধর্ষ জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মারাঠাগণ



পরস্পর বিচ্ছিন্ন মারাঠা জাতিকে এইভাবে গভীর জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া শিবাজী ভারত-ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন।

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ : প্রথম শম্ভুজী (১৬৮০-৮৯ খ্রীঃ)

শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৮০ খ্রীঃ)। তিনি পিতার ন্যায় প্রতিভাবান ছিলেন না, কিন্তু মোগলদের সহিত যুঝিবার মত তাঁহার সাহসের অভাব ছিল না। ঔরংজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয়দানে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রথম শম্ভুজী মোগলদের সহিত যুঝিবার কালে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের হস্তে বন্দী হন এবং বহু লাঞ্ছনার পর তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

মোগল হস্তে প্রথম শম্ভুজীর পরিবার-পরিজন ও শিশুপুত্র শাহু বন্দী

ইহার পর মোগল বাহিনী একে একে বহু মারাঠা দুর্গ, এমনকি মারাঠা রাজ্যের রাজধানী রায়গড়ও দখল করিয়া লয়। রায়গড় দখল করিবার কালে প্রথম শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) ও পরিবার-পরিজন মোগলদের হস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু প্রথম শম্ভুজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রায়গড় হইতে পলাইয়া গিয়া কর্ণাটকে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাজারাম (১৬৯০-১৭০০ খ্রীঃ)

সেখান হইতে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে মারাঠাগণ মোগল বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করিতে লাগিল। শান্তাজী ঘোড়পাড়ে, ধনাজী যাদব প্রভৃতি মারাঠা সেনাপতির আক্রমণে মোগল বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মারাঠাগণ কোন কোন স্থানে মোগলদের নিকট হইতেও 'চৌথ' আদায় করিতে ছাড়িল না। এইভাবে কিছুকাল কাটিল, তারপর মোগল সেনাবাহিনী রাজারামের কর্মকেন্দ্র জিঞ্জি অবরোধ করিলে মারাঠাগণ প্রায় আট বৎসর সেই অবরোধ প্রতিহত করিয়া টিকিয়া রহিল। অবশেষে জিঞ্জি মোগল সেনার হস্তগত হইলে (১৬৯৮ খ্রীঃ) রাজারাম সাতারাতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাতারাও মোগল সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হইল (১৭০০ খ্রীঃ)। এইভাবে ঔরংজেব মারাঠা প্রতিরোধ কতক পরিমাণে শিথিল করিয়া তাহাদের দুর্গগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অধিকৃত দুর্গগুলি পুনরায় মারাঠাগণ জয় করিয়া লইতে লাগিল। ঔরংজেব কোনরূপেই মারাঠাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

রাজারাম দীর্ঘকাল মোগলদের সহিত সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার দুই বিধবা পত্নী তারাবাঈ ও রাজসবাঈ নিজ নিজ পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত হইলেন। প্রথমা পত্নী তারাবাঈ মারাঠা সৈন্যের পোষকতায় তাঁহার শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন (১৭০০ খ্রীঃ) করিয়া মোগলদের সহিত চিরাচরিত যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন।

তারাবাঈ—তৃতীয় শিবাজী (১৭০০-১২ খ্রীঃ)

মারাঠাগণ মালব, গুজরাট, বরোদা এমনকি আহ্মদনগরে ঔরংজেবের যুদ্ধশিবিরও আক্রমণ করিল। ঔরংজেব জীবনের দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য দমনে কাটাইয়া শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণ কর্তৃক প্রতিহত হইলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের

মৃত্যুকালে মারাঠাদিগকে দমন করা দূরের কথা তাহাদিগকে তিনি যথেষ্ট শক্তিশালীই রাখিয়া গেলেন।

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মোয়াজ্জেম জুলফিকার খাঁর কুটিল পরামর্শে* মারাঠাদিগের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ঔরংজেব কর্তৃক বন্দীকৃত শাহুকে মুক্তিদান করেন। সেই সময়ে তারাবাঈ নিজপুত্র তৃতীয় শিবাজীর পক্ষে মারাঠা রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। শাহু মুক্তিলাভ করিয়া মারাঠা সিংহাসন দাবি করিলেন। আইনত তাঁহার দাবিই অধিকতর বলবৎ ছিল। তারাবাঈ শাহুর দাবি অস্বীকার করিলে মারাঠাদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধ শুরু হইল। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) মারাঠাদের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলে সাতারা দুর্গে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তারাবাঈ পান্‌হালা দুর্গে তাঁহার রাজধানী অপসারিত করিলেন। চারি বৎসর ধরিয়া মারাঠা রাজ্য শাহু ও তারাবাঈ-এর মধ্যে বিভক্তভাবেই শাসিত হইল। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তারাবাঈ-এর মৃত্যু ঘটিলে রাজারামের অন্যতমা পত্নী রাজসবাঈ নিজপুত্র দ্বিতীয় শম্ভুজীর নামে কোলহাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এইভাবে মারাঠাদের গৃহযুদ্ধ তখনও লাগিয়া রহিল। কিন্তু শাহু বালাজী বিশ্বনাথ নামে কোঙ্কণের জনৈক চিৎপাবন ব্রাহ্মণের সাহায্যে এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ হইলেন শাহুর 'পেশওয়া' বা প্রধান মন্ত্রী। পরে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণার সন্ধি (Treaty of Warna) দ্বারা দ্বিতীয় শম্ভুজী ও শাহুর রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট হইল। কোলহাপুরের মারাঠা শাসনকর্তা শম্ভুজী শাহুর সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপন করিলেন। মহারাষ্ট্রেও শাহুর অধিনায়কত্ব স্বীকৃত হইল এবং রাজবংশের মধ্যে গৃহবিবাদের সমাপ্তি ঘটিল।

শাহুর মুক্তিলাভ (১৭০৭ খ্রীঃ)

শাহু (১৭০৮-৪৯ খ্রীঃ)

রাজসবাঈ—দ্বিতীয় শম্ভুজী (১৭১২-৬০ খ্রীঃ)

বার্ণার সন্ধি (১৭৩১ খ্রীঃ)

পেশওয়াতন্ত্র: শাহু রাজ্য শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা বালাজী বিশ্বনাথকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী বা 'পেশওয়া' নিযুক্ত করিলেন (১৭১৩ খ্রীঃ)। বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁহার কর্মকুশলতা, দূরদর্শিতা ও সংগঠনী শক্তি মারাঠা রাজ্যে এক নবজীবনের সূচনা করিল। তিনি ক্রমেই রাজ্যের প্রকৃত শাসক হইয়া দাঁড়াইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ শাহুর জীবদ্দশায় পেশওয়া-পদকে বংশানুক্রমিক করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বময় শাসন-কর্তৃত্ব কায়েম করিয়া লইলেন।

পেশওয়াতন্ত্রের উৎপত্তি

বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা রাজ্যকে এমনভাবে পুনর্গঠন করিলেন যে মারাঠা সর্দারগণ স্ব স্ব প্রধান হওয়া দূরের কথা, রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সহযোগিতা-দানে বাধ্য হইলেন। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছিল। সেই সময়ে মারাঠাগণ মোগল বাদশাহের নিকট

পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০ খ্রীঃ)

* V. A. Smith : *The Oxford History of India* (3rd. Edn.), p. 430.

হইতে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবার উপর চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকারও লাভ করিয়াছিল। সরদেশমুখী হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থই ছিল রাজার প্রাপ্য। চৌথের এক-চতুর্থাংশ পাইতেন রাজা স্বয়ং। অবশিষ্ট অর্থ মারাঠা দলপতিগণ পাইতেন। বালাজী বিশ্বনাথ রাজ্যকে সুসংগঠিত করিয়া এবং মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম বাজী রাও পেশওয়া-পদ গ্রহণ করেন। প্রথম বাজী রাও ছিলেন যেমন সাহসী ও কর্মকুশল তেমনি বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। তিনি পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের স্থলে একটি বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য গঠন করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। প্রথম বাজী রাও ইহার নাম দিয়াছিলেন 'হিন্দু-পাদ্-পাদ্শাহী'। এইজন্য তিনি মারাঠা ভিন্ন অপরাপর হিন্দু দলপতি, অভিজাতবর্গ ও রাজাগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। যেখানেই হিন্দু রাজা বা জমিদারকে সামরিক সাহায্যদানের প্রয়োজন হইত সেখানেই প্রথম বাজী রাও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণ করিতেন। উত্তর-ভারতেও মারাঠা রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথম বাজী রাও জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলরাজ ছত্রশালের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। প্রথম বাজী রাও গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল আক্রমণ করিয়া ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে নিজাম-উল্-মুল্ক বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের সৈন্যসহ তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। প্রথম বাজী রাও ভূপালের অনতিদূরে নিজাম-উল্-মুল্ককে পরাজিত করিয়া (১৭৩৮ খ্রীঃ) সমগ্র মালব এবং নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। অপর-দিকে প্রথম বাজী রাও-এর ভ্রাতা চিমন্‌জী পোর্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া সলসেট্ ও ব্যাসিন দখল করেন। প্রথম বাজী রাও-এর আমলে রাজধানী রায়গড় হইতে পুণায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

প্রথম বাজী রাও
(১৭২০–৪০ খ্রীঃ)

প্রথম বাজী রাও-এর বিজয়লাভ

প্রথম বাজী রাও কেবল মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের জন্যই খ্যাতি অর্জন করেন নাই। তিনি একজন দেশপ্রেমিকও ছিলেন। শাহু ও পেশওয়া চৌথ আদায়ের নিশ্চয়তা ও সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তৃতির মাধ্যমে ক্ষমতা সুদৃঢ় রাখিবার জন্য মারাঠা গেরিলা সামন্তদিগের মধ্যে 'সারণজমি' (*Saranjami*) প্রথা* চালু করিয়াছিলেন। নাদির শাহের সহিত আহ্মদ শাহ্ আবদালী বা দুর্‌রানী ভারত আক্রমণ করিলে তিনি মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত মিলিত হইয়া বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যু হয় (১৭৪০ খ্রীঃ)।

বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা

প্রথম বাজী রাও মারাঠাদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন। রাজারাম যখন মারাঠা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন জায়গির-প্রথা

* Vide *The New Cambridge Modern History*, Vol. VII. p. 549.

পুনঃ-প্রবর্তিত হইয়াছিল। ফলে গোয়ালিওরের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড়, নাগপুরের ভোঁসলে এবং ধারের পোবার—এই কয়েকটি সামন্ত রাজ্যে মারাঠা রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা সকলেই অবশ্য পুণার পেশওয়ার আদেশাধীনে ছিল। পেশওয়া এই বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন সামন্ত রাজ্যগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক 'মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করিলেন। এইভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন হইল। মারাঠাগণ যখন পেশওয়ার নেতৃত্বে মধ্য-ভারতে ও দক্ষিণ-ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল, তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিদেশী আক্রমণকারী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণকারী ছিলেন নাদির শাহ্।

প্রথম বাজী রাও-এর কৃতিত্ব

মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র



প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (দ্বিতীয়) বালাজী বাজী রাও পেশওয়া-পদ লাভ করিলেন। তিনি নানাসাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। নানাসাহেব তাঁহার পিতার 'হিন্দু-পাদ্ পাদ্শাহী'র আদর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দু, মুসলমান সকলের উপরই উৎপীড়ন চালাইতে লাগিলে হিন্দুরাজাগণও তাঁহার বিরোধিতা শুরু করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি মারাঠা বাহিনীতে মুসলমান সৈন্য এবং ইব্রাহিম খাঁ নামক ব্যক্তিকে অন্যতম সেনাপতি-পদে নিয়োগ করিয়া মারাঠা বাহিনীর পূর্বেকার ঐক্য ও আদর্শ নাশ করিয়াছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহুর মৃত্যু হইলে বালাজী বাজী রাও সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া বসিলেন। তাঁহার আমলেই অবশ্য মারাঠা সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে মারাঠা সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে সিন্ধু নদ এবং দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বালাজী বাজী রাওয়ের আমলে নাগপুরের ভোঁসলে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট হইতে চৌথ আদায় করিয়া উড়িষ্যায় প্রাধান্য বিস্তার করেন। বালাজী বাজী রাও-এর ভ্রাতা রঘুনাথ রাও আহ্‌ম্মদ শাহ্ আবদালীর পুত্র তৈমুরকে বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (১৭৫৮ খ্রীঃ)। হায়দরাবাদের নিজাম উদ্‌গীরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া (১৭৬০ খ্রীঃ) মারাঠাগণকে প্রচুর ধনদৌলত, দৌলতাবাদের দুর্গ, ঔরঙ্গাবাদ, বিজাপুর ও বিদরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলেও মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। এমনকি, দিল্লীর রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাহারা যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

(দ্বিতীয়) বালাজী বাজী রাও (১৭৪০-৬১ খ্রীঃ)

বালাজী বাজী রাও কর্তৃক 'হিন্দু-পাদ্ পাদ্শাহী'র আদর্শ পরিত্যক্ত

পাঞ্জাব হইতে তৈমুরকে বিতাড়িত করিবার ফলে আহ্‌ম্মদ শাহ্ আবদালী ভারত আক্রমণ করিয়া (১৭৬১ খ্রীঃ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে চরম আঘাত হানিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন চিরতরে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজগণ মোগলদের হাত হইতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। এইভাবে মারাঠা শক্তি সঙ্ঘকে দুর্বল রাখিয়া ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বাজী রাও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও-এর পর তাঁহার পুত্র প্রথম মাধব রাও পেশওয়া হন (১৭৬১ খ্রীঃ)। তাঁহার সুদক্ষ শাসনে ও সামরিক দক্ষতায় মারাঠা শক্তির পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। মাধব রাও-এর সহায়তায় মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম দিল্লী পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হায়দর আলিকে পরাভূত করিয়া মহীশূরের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মাধব রাও হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মারাঠা শক্তির বিপুল ক্ষতিসাধন হইয়াছিল।

প্রথম মাধব রাও (১৭৬১-৭২ খ্রীঃ)

প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া হইলেন (১৭৭২-৭৩ খ্রীঃ)। নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদ লাভ করার এক বৎসরের মধ্যে পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা কর্তৃক নিহত হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে এক বৎসরের মধ্যে রাঘোবা পেশওয়া-পদ হারাইয়া ইংরেজদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। নারায়ণ রাওয়ের পুত্র (দ্বিতীয়) মাধব রাও নারায়ণ পেশওয়া হইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মাধব রাও নাবালক ছিলেন বলিয়া নানা ফড়নবীশ নামে জনৈক বিচক্ষণ রাজনীতিক ব্রাহ্মণকে রাজ্যের যাবতীয় শাসনকার্যের ভার প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় মাধব রাও-এর শাসনকালে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসানে রাঘোবাকে ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইঙ্গ-মারাঠাদের মধ্যে সল্‌বইয়ের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। অপরদিকে মহীশূরের হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের সহিত মারাঠাদের যুদ্ধ চলিতে থাকে। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে মারাঠাগণ মহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ লাভ করে এবং নিজাম-উল্-মুল্ককে খর্‌দার যুদ্ধে (১৭৯৫ খ্রীঃ) পরাজিত করিয়া হায়দরাবাদের কিছু অংশ দখল করে।

(দ্বিতীয়) মাধব রাও নারায়ণ (১৭৭৪-৯৬ খ্রীঃ)

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে (দ্বিতীয়) মাধব রাও-এর মৃত্যু হইলে রঘুনাথ রাও-এর পুত্র দ্বিতীয় বাজী রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে নানা প্রকার গোলযোগ শুরু হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের ন্যায় সুদক্ষ শাসকের মৃত্যু হইলে মারাঠা ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নিজাম সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার হৃত রাজ্যের কিয়দংশ মারাঠাদের দখল হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন। নিজেদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে মারাঠাগণ ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাগণ পরাজিত হইলে পেশওয়াতন্ত্রের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। ইহার পর হইতে পেশওয়া প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হইয়া পড়েন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজী রাও-এর মৃত্যু ঘটিলে পেশওয়াতন্ত্রের পতন ঘটে।

দ্বিতীয় বাজী রাও (১৭৯৬-১৮১৮ খ্রীঃ)

(খ) **শিখদের অভ্যুত্থান (Rise of the Sikhs)**: পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভারতে যে ধর্ম-সংস্কারের প্রবণতা দেখা দিয়াছিল সেই সময়ে গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম শিখ ধর্ম নামে পরিচিত। তিনি যে ধর্ম সম্প্রদায়—অর্থাৎ শিখ সম্প্রদায়ের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন সেই শিখ সম্প্রদায় পরবর্তী ভারত-ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক

গুরু নানক অঙ্গদ নামে তাঁহারই এক শিষ্যকে পরবর্তী শিখগুরু হিসাবে মনোনীত করিয়া ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। গুরু অঙ্গদের পরবর্তী গুরু ছিলেন গুরু অমরদাস। ইঁহারা তাঁহাদের চরিত্রের পবিত্রতা ও মাধুর্যে শিখদের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। পরবর্তী—অর্থাৎ চতুর্থ শিখগুরু ছিলেন রামদাস। গুরু রামদাসের ধর্ম-প্রবণতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ সম্রাট আকবরের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল।

দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ

তৃতীয় গুরু অমরদাস

তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার দান হিসাবে সম্রাট আকবর গুরু রামদাসকে অমৃতসরে একটি সরোবর-সহ একখণ্ড জমি দান করেন। এই জমির উপরই অমৃতসরের প্রসিদ্ধ শিখমন্দির বা গুরুদ্বার নির্মিত হয়। গুরু রামদাসের সময় হইতেই শিখগুরু পদ বংশ-পরম্পরায় মনোনীত হইতে থাকে। পরবর্তী গুরু—অর্থাৎ শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুনমল ছিলেন এক অসাধারণ সংগঠন-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার চেষ্টায় শিখ ধর্ম পাঞ্জাবের সর্বত্র বিস্তারলাভ করে এবং শিখদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। গুরু অর্জুনমল হিন্দু ও মুসলমান সাধুসন্তদের বাণী হইতে এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী শিখগুরুদের বাণী হইতে শ্রেষ্ঠ অংশগুলি একত্র করিয়া 'আদিগ্রন্থ' নামে শিখদের মূল ধর্মগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। গুরু অর্জুনের সংগঠনী ক্ষমতা এবং ধর্মপরায়ণতার সুফল হিসাবে একদিকে যেমন শিখগুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তেমনি শিখ ধর্মাধিষ্ঠানে স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের ফলে ধর্মাধিষ্ঠানের সম্পত্তি ও ধনদৌলত প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গুরু অর্জুনের আমল হইতেই শিখ সম্প্রদায় নিছক ধর্ম সম্প্রদায় না থাকিয়া রাজনীতিক্ষেত্রেও প্রবেশ করিতে শুরু করে। সম্রাট আকবর গুরু অর্জুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বটে, কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শাহজাদা খস্রুকে প্রশ্রয় দিবার কারণে জাহাঙ্গীরের কোপানলে পতিত হন। জাহাঙ্গীর রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। তদুপরি তাঁহার উপর এক বিরাট পরিমাণ অর্থদণ্ডও চাপানো হয়। এযাবৎ শিখ সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নাই। কিন্তু জাহাঙ্গীর কর্তৃক পঞ্চম গুরুর নৃশংস হত্যার পর শিখ সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে মোগল সম্রাট ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল।

চতুর্থ গুরু রামদাস

পঞ্চম গুরু অর্জুনমল

জাহাঙ্গীর কর্তৃক গুরু অর্জুনের হত্যা

শিখ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ

গুরু অর্জুনের পুত্র গুরু হরগোবিন্দ ছিলেন দৃঢ়চেতা পুরুষ। তাঁহার সংগঠনী শক্তি, সামরিক দক্ষতা ও দুর্ধর্ষ নেতৃত্ব অল্পকালের মধ্যেই শিখ সম্প্রদায়কে এক সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করিল। পিতার উপর আরোপিত অর্থদণ্ড গুরু হরগোবিন্দ দিতে অস্বীকার করিলে কিছুকাল তাঁহাকে গোয়ালিওর দুর্গে বন্দিদশায় কাটাইতে হয়। ইহার পর হরগোবিন্দ সম্রাট শাহজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অমৃতসরের নিকট সংগ্রাম নামক স্থানে মোগল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন (১৬২৮ খ্রীঃ)। ইহার কিছুকাল পর তিনি কাশ্মীরের কিরাতপুর নামক স্থানে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্বে তিনি পৌত্র হররায়কে গুরুপদে মনোনীত করিয়া যান। হররায় ও তাঁহার পুত্র হরকিশন—এই দুই গুরুর আমলে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু ঘটে নাই। গুরু হরকিশনের মৃত্যুর পর কে গুরু হইবেন তাহা লইয়া এক বিবাদের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত হরগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র তেগ বাহাদুরকে শিখ সম্প্রদায় গুরু

ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫ খ্রীঃ)

সপ্তম গুরু হররায় (১৬৪৫-৬১ খ্রীঃ)

অষ্টম গুরু হরকিশন (১৬৬১-৬৪ খ্রীঃ)

হিসাবে স্বীকার করিলে কিরাতপুরের অনতিদূরে আনন্দপুর নামক স্থানে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন।

গুরু তেগ বাহাদুরঃ তেগ বাহাদুর ছিলেন বীর যোদ্ধা। তিনি কয়েক মাস পাটনায় ছিলেন। রাজা রাম সিংহ যখন আসাম আক্রমণ করেন (১৬৬৮ খ্রীঃ) সেই সময় তেগ বাহাদুর তাঁহার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তেগ বাহাদুর মোগল সম্রাট ঔরংজেবের অ-মুসলমান বিদ্বেষ, জিজিয়া কর স্থাপন এবং কঠোর সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণকে এই সকল আদেশের বিরোধিতা করিতে উৎসাহিত করিলেন। ঔরংজেবের ন্যায় ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং ধর্মান্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই বিরোধিতা বরদাস্ত করিবার মনোবৃত্তি স্বভাবতই ছিল না। তিনি তেগ বাহাদুরকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিল্লীতে আনাইলেন। দরবারে উপস্থিত সকলের সম্মুখে তেগ বাহাদুরকে হয় ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিতে নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করা হইল। তেগ বাহাদুর নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেও চাহিলেন না, তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াও স্বধর্ম রক্ষা করিবেন জানাইলেন। পাঁচ দিন পর তেগ বাহাদুরকে হত্যা করা হইল। মৃত্যুর পূর্বে তেগ বাহাদুর বলিয়াছিলেন 'শির দিয়া, সার না দিয়া'—অর্থাৎ মস্তক দিচ্ছি, কিন্তু ধর্ম দেই নাই। তেগ বাহাদুরের নির্ভীকতা ও ধর্মের জন্য জীবনাহুতি শিখ সম্প্রদায় তথা যাবতীয় অ-মুসলমানদের মনে তাঁহার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, শিখদের মধ্যে মোগল সম্রাট ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ পরায়ণতার সৃষ্টি হয়। ফলে মোগলদের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

নবম গুরু তেগ বাহাদুর

গুরু গোবিন্দ সিংহঃ তেগ বাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ ছিলেন শিখদের দশম এবং সর্বশেষ গুরু। তিনি অতি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়া শিখ সম্প্রদায়কে এক অতিশয় সংগঠিত ও সুসংহত শক্তিতে পরিণত করেন। তিনি শিখদের মধ্যে 'পাহুল' (Pahul) প্রথার—অর্থাৎ 'অভিসিঞ্চন' (baptism) প্রথার প্রচলন করেন। যে-সকল শিখ এইভাবে অভিসিঞ্চিত হইলেন তাঁহাদের নাম হইল 'খাল্‌সা'—অর্থাৎ পবিত্র। এই সকল 'পবিত্র' শিখদের পদবী সেই সময় হইতে দেওয়া হইল সিং (সিংহ)। ইহা ভিন্ন, এই সকল অভিসিঞ্চিত শিখকে পঞ্চ 'ক'—অর্থাৎ কেশ (লম্বা চুল), কৃপাণ (তরবারি), কচ্ছ (ছোট জাঙ্গিয়া), কঙ্গা (চিরুণী), কড়া (ইস্পাতের বালা)—এই পাঁচটি সর্বদা ধারণ করিতে হইত। গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ সম্প্রদায়কে এক সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করেন। যুদ্ধের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিবার পশ্চাতে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। গুরু গোবিন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন—অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা শিখদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ কাশ্মীরের পাহাড়ী অঞ্চলের রাজাগণ ও মোগল বাহিনীর সহিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ

ছিলেন। ঔরংজেব এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ শিখ নেতাকে তথা শিখদিগকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া বিরোধ দেখা দিলে গুরু গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর শাহ্‌কে সমর্থন করিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহের সহিত দাক্ষিণাত্যে তিনি গিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোদাবরী নদী তীরে জনৈক আফগান আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারান (১৭০৮ খ্রীঃ)।

গুরু গোবিন্দ সিংহের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পরই শিখ গুরুদের ক্রমিক ধারার অবসান ঘটে। শিখদের ধর্মনৈতিক সর্বোচ্চ অধিকার গুরুর স্থলে 'গ্রন্থসাহেব'—অর্থাৎ শিখদের ধর্মগ্রন্থে ন্যস্ত হয়। কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিংহের অনুচর বান্দা শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি দেখিতে অনেকটা গুরু গোবিন্দ সিংহের ন্যায়ই ছিলেন। বান্দা চল্লিশ হাজার শিখ সৈন্যের এক বাহিনী সংগঠন করিয়া শিরহিন্দ নামক স্থানের ফৌজদার ওয়াজির খাঁকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া সেই শহর দখল করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ওয়াজির খাঁ-ই গুরু গোবিন্দের সন্তানগণকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার পর যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বান্দা নিজ অধিকারে আনেন এবং নাহন ও শধরা নামক স্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে লৌহগড় নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি স্বাধীন রাজার মর্যাদা সহকারে নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। সম্রাট বাহাদুর শাহ্ লৌহগড় আক্রমণ করিলে বান্দা পলাইয়া গিয়া লাহোরের নিকট পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে তিনি শধরা, লৌহগড় দখল করেন এবং শিরহিন্দ লুণ্ঠন করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর দুর্গে তাঁহাকে অবরোধ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর মোগল সেনার হস্তে বন্দী হন। তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে দিল্লীতে সম্রাট ফারুকশিয়ারের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে সম্রাটের আদেশে বান্দার পুত্রকে বান্দার সম্মুখে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং বান্দাকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলিয়া হত্যা করা হয়। এই সময় শিখদের শক্তি অত্যধিক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের আদর্শে সংগঠিত শিখ শক্তি নিঃশেষ হইবার ছিল না। কাপুর সিংহ নামক অপর এক নেতার অধীনে শিখজাতি পুনরায় সংগঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ কালে পাঞ্জাবে যে রাজনৈতিক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল, সেই সুযোগে শিখগণ সামরিক ও আর্থিক শক্তি সঞ্চয় করিল।



গুরু গোবিন্দ সিংহ

বান্দা

বান্দার নৃশংস হত্যা: শিখশক্তি হ্রাস

শিখশক্তি পুনর্গঠিত

দালেওয়াল নামক স্থানে তাহারা একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এই দুর্গ হইতে তাহারা লাহোরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুঠতরাজ করিতে থাকে। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অব্যবস্থা শিখদের সুযোগ আরও বৃদ্ধি করে এবং আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী যখন ভারত ত্যাগ করিয়া যান (১৭৬৭ খ্রীঃ) সেই সময়ে তাহারা তাঁহাকে নানাভাবে আক্রমণ করে। ক্রমে পাঞ্জাবে আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী অধিকৃত যাবতীয় স্থান অধিকার করিয়া লয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিখগণ পূর্বে শাহরাণপুর হইতে পশ্চিমে এটক এবং দক্ষিণে মুলতান হইতে উত্তরে কাংড়া ও যমুনা পর্যন্ত নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লয়।

পাঞ্জাব ও নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল শিখ অধিকারভুক্ত

এইভাবে শিখগণ এক স্বাধীন রাজ্যাংশ নিজেদের মধ্যে বারটি ভাগে ভাগ করিয়া এক ধর্মাশ্রয়ী সামন্ত রাজ্যসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করে। এই এক-একটি ভাগ 'মিস্‌ল' (Misl) নামে অভিহিত হইত। প্রথমে মোগল শত্রুর বিরুদ্ধে যুঝিবার প্রয়োজনে এই বারটি মিস্‌লের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার হেতু মোগল শক্তির পতনের ফলে শিখ মিস্‌লগুলি বহিরাগত শত্রুর ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছে মনে করিয়া নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক কলহে প্রবৃত্ত হইল। এই সকল মিস্‌ল একে অপরের অংশ অধিকার করিতে শুরু করিলে ক্রমে শিখগণের অধিকাংশ এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে সংগঠিত হইল। এই রাজনৈতিক ঐক্য সাধন করিয়াছিলেন রঞ্জিৎ সিংহ।

ধর্মাশ্রয়ী সামন্ত রাজ্যসঙ্ঘ

রঞ্জিৎ সিংহ, ১৭৮০-১৮৩৯ খ্রীঃ (Ranjit Singh): রঞ্জিৎ সিংহ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের সুকারচুকিয়া নামক মিস্‌ল—অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল মহা সিংহ। দশ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু ঘটিলে (১৭৯০ খ্রীঃ) তিনি সুকারচুকিয়া মিস্‌লের নেতা হন। এত অল্প বয়সে সিংহাসন আরোহণ করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে শাসন-কার্য পরিচালনা করা এবং বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শিখ সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা একমাত্র অনন্যসাধারণ দূরদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। এ-বিষয়ে ভারত-ইতিহাসে সম্রাট আকবরের সহিত রঞ্জিৎ সিংহের তুলনা করা যাইতে পারে। কাবুলের অধিপতি জামান শাহ্‌ যখন ভারত আক্রমণ করেন সেই সময়ে রঞ্জিৎ সিংহ তাঁহার সেনাবাহিনীকে বার বার আক্রমণ করিয়া এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন যে জামান শাহ্‌ রঞ্জিৎ সিংহকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার সহিত এক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইহার পর রঞ্জিৎ সিংহ জামান শাহ্‌কে নানাভাবে

প্রথম জীবন



রঞ্জিৎ সিংহ

সাহায্য দান করিলে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জামান শাহ্ যখন ভারত ত্যাগ করিয়া যান তখন তিনি রঞ্জিৎ সিংহকে লাহোরের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করিয়া তাঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই সময় হইতেই রঞ্জিৎ সিংহ সামরিক নেতা এবং দূরদর্শী রাজনীতিক হিসাবে অসাধারণ সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি পাঞ্জাবে আফগান আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া শিখ জাতীয় রাষ্ট্র রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অব্যবস্থাই রঞ্জিৎ সিংহের সাফল্যের সুযোগ দান করিয়াছিল।

নিজ শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির পর মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক স্থান দুইটি অধিকার করিয়া রঞ্জিৎ সিংহ জম্মুর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। জম্মুর রাজা রঞ্জিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দান করিলেন। ইহার পর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর দখল করিয়া রঞ্জিৎ সিংহ নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। ঐ বৎসরই হোলকার ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক্ (Lord Lake) কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দূরদর্শী রঞ্জিৎ সিংহ হোলকারকে সাহায্য করা দূরে থাকুক ইংরেজদের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের চুক্তি দ্বারা হোলকারকে পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ সমগ্র শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার আশা পোষণ করিতেন। সেই উদ্দেশ্যে শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরের যাবতীয় শিখ মিস্‌ল দখল করিয়া উহার পূর্ব-তীরস্থ মিস্‌ল দখল করিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলে সেই অঞ্চলের কয়েকটি মিস্‌লের নেতা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য প্রয়োজন হইবে, একথা বিবেচনা করিয়া ইংরেজগণ তাঁহার সহিত মিত্রতা বজায় রাখিবার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিল। লর্ড মিণ্টো চার্লস্ মেট্‌কাফকে রঞ্জিৎ সিংহের সহিত আপোষ-মীমাংসার জন্য প্রেরণ করিলেন। ফলে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা রঞ্জিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরস্থ শিখ মিস্‌লগুলি আক্রমণ করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

অমৃতসর দখল

অমৃতসরের সন্ধি

অতঃপর কাশ্মীর, মুলতান, কোহাট, বান্নু, দেরা ইস্মাইল খাঁ, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া খাইবার গিরিপথ ও সিন্ধুদেশ পর্যন্ত রঞ্জিৎ সিংহ তাঁহার রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলেন।

রাজ্যবিস্তার

(রঞ্জিৎ সিংহ কেবল রণনিপুণ সেনাপতিই ছিলেন না, শাসনকার্যে তিনি অত্যধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগঠনী শক্তিও ছিল অপরিসীম। তিনি আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতিতে নিজ সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিজ বাহিনীর সামরিক শিক্ষার সুবিধার জন্য নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীতে কাজ করিয়াছিলেন এইরূপ দুইজন অভিজ্ঞ সামরিক কর্মচারীকে তিনি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রচলিত রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।)

সংগঠনমূলক কার্যাদি

ইংরেজদের সহিত রঞ্জিৎ সিংহ সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন। শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরে এবং সিন্ধুদেশে রাজ্যবিস্তার করিতে গেলে ইংরেজগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি মিত্রতা তাহারা সর্বদাই রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। দোস্ত মহম্মদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের বিনিময়েও ইংরেজগণ রঞ্জিৎ সিংহকে কোনভাবে বিরক্ত করিতে চাহে নাই। পারস্য ও রাশিয়ার যুগ্ম অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য আফগানিস্তানের সহিত ইংরেজদের মিত্রতা স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। দোস্ত মহম্মদও এইরূপ মিত্রতা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই মিত্রতার শর্ত হিসাবে রঞ্জিৎ সিংহ অধিকৃত পেশোয়ার দাবি করিলে, ইংরেজ সরকার সেই শর্ত মানিয়া লইতে রাজী হয় নাই।

ইংরেজদের সহিত মিত্রতা

রঞ্জিৎ সিংহ বীর যোদ্ধা, দূরদর্শী রাজনীতিক এবং গভীর দেশপ্রেমিক ছিলেন। শিখ জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক বৃহৎ শক্তিশালী জাতি হিসাবে গঠন করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরের শিখগণকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করিতে না পারিলেও পশ্চিম-তীরস্থ যাবতীয় শিখ মিস্‌লকে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অতি অল্পবয়সে স্বকারচুকিয়া মিস্‌লের শাসনভার গ্রহণ করিয়া একমাত্র নিজ প্রতিভাবলে এবং সামরিক কৌশল ও জাতীয়তাবোধ দ্বারা তিনি নিজেকে এক বিশাল ও শক্তিশালী রাজ্যের নেতৃত্বে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসক হিসাবেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চার্লস্ মেট্‌কাফ প্রমুখ ইংরেজ এবং বহু বিদেশী পর্যটক রঞ্জিৎ সিংহের শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমোঁ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়াছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ লেখাপড়া জানিতেন না বটে কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। শাসনকার্যে দয়া, ন্যায় ও সততার নীতি অনুসরণ করিয়া এবং ধর্ম বিষয়ে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন।

রঞ্জিৎ সিংহের কৃতিত্ব

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়ক সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি পিতার ন্যায় ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন না। যাহা হউক, সিংহাসনলাভের এক বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে শিখ রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এদিকে তাঁহার মৃত্যুর পরদিনই তাঁহার পুত্র নৌনিহাল সিংহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে খড়ক সিংহের অপর পুত্র শের সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনিও আততায়ীর আক্রমণে প্রাণ হারাইলে (১৮৪৩ খ্রীঃ) শিখ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমেই দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় শিখ সেনাবাহিনী 'খাল্‌সা' শাসনক্ষমতা হস্তগত করিল। রঞ্জিৎ সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া এবং রাণীমাতা ঝিন্দনকে নামমাত্র অভিভাবিকা নিযুক্ত করিয়া লালসিংহ ও তেজসিংহ নামক দুইজন সামরিক নেতা দেশের শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন।

খড়ক সিংহ

পরবর্তী রাজাগণ

খাল্‌সার প্রাধান্য—দলীপ সিংহ

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুকালে শিখ শক্তি উন্নতির চরমে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী কালে শিখ শক্তির পতন যেমন ছিল আকস্মিক তেমনি ছিল দ্রুত। জেনারেল গর্ডনের ভাষায়—রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখ শক্তি যেন এক বিস্ফোরণের পর যেরূপ অগ্নিশিখা লেলিহান রূপ ধারণ করে এবং অল্পকালের মধ্যে স্তিমিত হইয়া পড়ে সেরূপ স্তিমিত এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

রঞ্জিত সিংহের মৃত্যু—শিখ শক্তির দ্রুত পতন

রঞ্জিৎ সিংহের পরবর্তী কালে শিখ শক্তি: রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু শিখ রাজ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তির সূচনা করিয়াছিল। দীর্ঘকাল এরূপ পরিস্থিতি চালু থাকিবার ফলে স্বভাবতই শিখ শক্তির চরম দুর্বলতা দেখা দিল এবং অবশেষে ইংরেজদের অধীনতাপাশে শিখ জাতিকে আবদ্ধ হইতে হইল।

শিখ রাজ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর একের পর এক করিয়া বহু উত্তরাধিকারী সাময়িকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং পদচ্যুত হইলেন। অবশেষে, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিৎ সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রাণীমাতা ঝিন্দনকে অভিভাবিকা নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা রহিল তেজসিংহ ও লালসিংহ নামক দুইজন সামরিক নেতার উপর।

নাবালক দলীপ সিংহের সিংহাসন লাভ—রাণীমাতা ঝিন্দনের অভিভাবকত্ব

আভ্যন্তরীণ শাসনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই 'খাল্সা'—অর্থাৎ শিখ সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। রাণীমাতা ঝিন্দনের পক্ষে সেনাশক্তিকে স্ববশে রাখা সম্ভব হয় নাই। ফলে সামরিক বাহিনীর অধিকর্তাগণই দেশের শাসনব্যবস্থায় এক স্বৈরশক্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

খাল্সার শাসনক্ষমতা অধিকার

রাণীমাতা ঝিন্দন সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তিকে পরোক্ষভাবে দমন করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি তাহাদিগকে ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া ব্রিটিশ শক্তির হস্তে পরাজিত হইলে বা অন্তত ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুঝিবার ফলে দুর্বল হইলে তাহাদের উপর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের কথা ভাবিলেন। এইভাবে সুদক্ষ শিখ সৈনিকগণ কোন নির্দিষ্ট বা উচ্চ আশা দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইয়া কেবল রাণীমাতা ঝিন্দনের কূটচালের ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ব্রিটিশ শক্তির প্রসার-নীতিও শিখদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যদিও রাণীমাতা ঝিন্দনের গোপন উদ্দেশ্য ছিল শিখ সামরিক শক্তিকে দুর্বল করা। মুদ্‌কী, ফিরোজশাহ্, আলীওয়াল্ এবং সর্বশেষে সেব্রাঁও-এর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ব্রিটিশ ও শিখ শক্তির দ্বন্দ্বে শিখ শক্তির পরাজয় ঘটিল। ব্রিটিশ শক্তির সর্বাপেক্ষা বিরোধী শক্তির পতনে ভারতে ব্রিটিশ অধিকার নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিল।

রাণী ঝিন্দনের কূটচাল

ব্রিটিশ আগ্রাসী নীতি

ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ

শিখ শক্তির পরাজয়

ব্রিটিশরা দলীপ সিংহকে পাঞ্জাবের মহারাজা এবং রাণীমাতা ঝিন্দনকে তাঁহার অভিভাবিকা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইল এবং লাহোরে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন ও একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিয়োগ করিল। লাহোরকে ক্ষুদ্রায়তন করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর রাজ্যটি গোলাব সিংহের নিকট বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল। গোলাব সিংহ ছিলেন লাহোর দরবারের অধীনে জনৈক সর্দার।

পাঞ্জাবে ব্রিটিশ প্রাধান্য

শিখদের অন্তরে স্বাধীনতা-স্পৃহা তখনও নির্বাপিত হয় নাই। ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় প্রধানত সেনাবাহিনীর নেতৃবর্গের জন্যই ঘটিয়াছিল, একথা তাহাদের অন্তরে পীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে রাণীমাতা ঝিন্দনকে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে লাহোর হইতে অপসারণে বাধ্য করায় শিখদের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল। পাঞ্জাবে এক শিখ বিদ্রোহ প্রায় ঘটিতে চলিল। ঠিক সেই সময়ে মুলতানের গভর্নর দেওয়ান মূলরাজকে রাজস্ব আদায়ের হিসাব দিতে বলা হইলে তিনি ইহা অপমানজনক বিবেচনা করিয়া পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থলে সর্দার খাঁ সিংহকে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মুলতানে উপস্থিত হইলে উভয় ব্রিটিশ কর্মচারীকেই হত্যা করা হইল। মূলরাজকে এজন্য দায়ী করা হইলে মুলতানে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। ক্রমে এই বিদ্রোহ এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হইলে ব্রিটিশ সরকার শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে বহু সংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের বিনিময়েও জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মুলতানের যুদ্ধে অবশ্য ব্রিটিশ পক্ষ জয়ী হইল। অনুরূপ গুজরাটের যুদ্ধে পুনরায় ব্রিটিশ সৈন্য জয়লাভ করিল। চরম বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াও শিখগণ ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুঝিতে সমর্থ হইল না। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ লর্ড ডালহৌসী এক ঘোষণা দ্বারা পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিলেন। এইভাবে স্বাধীন শিখ শক্তির পরাজয় ও পতন ঘটিল।

শিখদের স্বাধীনতা-স্পৃহা

মূলরাজের সহিত বিরোধ

মুলতানের বিদ্রোহ—জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত

চিলিয়ানওয়ালা, মুলতান ও গুজরাটের যুদ্ধ

পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত

দ্বাদশ অধ্যায়

ইওরোপীয়দের ভারত আগমন
(Advent of the Europeans)

পোর্তুগীজগণ (The Portuguese) : ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা নামে একজন পোর্তুগীজ দক্ষিণ-ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছিলে অল্পকালের মধ্যেই পোর্তুগীজ বণিকগণ ভারতে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা কোচিন ও ক্যানানোর—এই দুই স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ইহার পর আল্-ফোন্সো আল্বুকার্ক পোর্তুগীজ বাণিজ্যকুঠিগুলির গভর্নর হইয়া আসিলে পোর্তুগীজগণ ভারতে অধিকার বিস্তারে মনোনিবেশ করিল। ক্রমে তাহারা গোয়া, দমন, দিউ, সল্‌সেট্, ব্যাসিন, বোম্বাই, চৌহল, সান্ টোম্ ও বাংলাদেশের হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। পরবর্তী কালে তাহাদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি হিসাবে হুগলী হইতে তাহাদিগকে সম্রাট শাহ্জাহানের আদেশে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। পরে সেখানে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি তাহারা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন হুগলীতে পোর্তুগীজদের বাণিজ্যের সুযোগ লোপ পাইয়াছিল। বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা এবং বাণিজ্যের নামে ক্রীতদাস বিক্রয় প্রভৃতি নানা প্রকার দুর্নীতিমূলক কার্যের ফলে ভারতে পোর্তুগীজ প্রাধান্য বিস্তারের কোন সুযোগ ঘটে নাই। তাহারা সামান্য কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য চালাইতে থাকে।

ভাস্কো-ডা-গামা

দক্ষিণ-ভারতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন



ভাস্কো-ডা-গামা

পোর্তুগীজদের দুর্নীতিমূলক কার্যাদি

ওলন্দাজগণ (The Dutch) : পোর্তুগীজদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া হল্যাণ্ডের—অর্থাৎ ওলন্দাজ বণিকগণ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমেই পোর্তুগীজদের সহিত বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করিল। গুজরাট, করমণ্ডল উপকূল, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠি তাহারা স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেও শেষ পর্যন্ত যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলেই নিজেদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক কেন্দ্র গড়িয়া তোলে।

অসাফল্য

ভারতবর্ষে অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা টিকিতে পারে নাই।

ফরাসী বণিকগণ (The French Traders): ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ফরাসী বণিকগণ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রাথমিক চেষ্টা কিছুকাল পরেই স্থগিত থাকে। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর অর্থ মন্ত্রী কল্‌বেয়ার (Colbert) ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ভারতের সহিত বাণিজ্য শুরু করিবার ব্যবস্থা করেন। সুরাটে সর্বপ্রথম ফরাসী বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ক্রমে মসুলিপত্তম্, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী বাণিজ্যকুঠি গড়িয়া উঠে।

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব

ইংরেজ বণিকগণ (The English Traders): ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায়ও ভারতে কুঠি স্থাপনে পশ্চাদ্‌পদ ছিল না। পোর্তুগীজ বণিকদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী (প্রথম) এলিজাবেথের সনন্দ লাভ করিয়া ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র লইয়া মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজদের স্বার্থে বাণিজ্য-সুযোগ প্রার্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই দৌত্য সাফল্যলাভ করিল না। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার্ টমাস্ রো প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র-সহ আসিলে পর ইংরেজ বণিকসম্প্রদায় কতক কতক বাণিজ্য-সুযোগ লাভে সমর্থ হইল। সুরাট, আগ্রা, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (মাদ্রাজ), হরিহরপুর, হুগলী, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে একে একে বহু বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ বিবাহসূত্রে পোর্তুগাল হইতে বোম্বাই শহরটি লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইহা ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। ফলে বোম্বাই শহরেও ইংরেজ বণিকদের কার্যকলাপ প্রসারিত হয়। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশে অনেক ইংরেজ বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ঔরংজেবের রাজত্বকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বলপ্রয়োগ দ্বারা ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করিলে ঔরংজেবের সহিত ইংরেজ বণিকদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরে ইংরেজগণ ঔরংজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহারা পুনরায় বাণিজ্য করিবার সুযোগ লাভ করে। বাংলাদেশে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য-শুল্ক ও জিজিয়া কর দিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় মোগল কর্মচারিগণ বণিকদের নিকট হইতে আরও নানা প্রকার কর ও শুল্ক আদায় করিত। ইংরেজগণ ইহার বিরোধিতা করিলে বাংলাদেশেও ইংরেজ ও মোগলদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ফলে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ হইতে ইংরেজগণ চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু জব্ চার্ণক নামে জনৈক ইংরেজ বণিক মোগল সম্রাটের বিশেষ অনুমতি লইয়া বাংলাদেশে

ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

ইংরেজগণ কর্তৃক বাণিজ্য-সুযোগ লাভ ও কুঠি স্থাপন

ইঙ্গ-মোগল সংঘর্ষ

ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সুতানুটি গ্রামে (বর্তমান শোভাবাজার এলাকায়) আসিয়া তাঁহার জাহাজ ভিড়াইলেন। কিন্তু ইহার অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজগণ চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলে ঔরংজেবের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধে। সেই সময়ে জব্ চার্ণক বাধ্য হইয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত ঔরংজেবের বিবাদ মিটিয়া গেলে তিনি পুনরায় বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ বৎসরই তিনি কলিকাতা মহানগরীর পত্তন করেন (১৬৯০ খ্রীঃ)। পরে ইংরেজগণ সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালীঘাট এই তিনটি গ্রামের জমিদারি গ্রহণ করিয়া উহাতে ফোর্ট উইলিয়াম নামক দুর্গটি স্থাপন করে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে থাকে।

জব্ চার্ণক

কলিকাতা মহানগরীর পত্তন (১৬৯০ খ্রীঃ)

পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি বণিক ভিন্ন দিনেমার, অষ্ট্রিয়ান (অষ্ট্রিয়ার), সুইডিস্ (অর্থাৎ, সুইডেন দেশের) বণিকগণও এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এদেশে বাণিজ্যে সাফল্যলাভ করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত এদেশ ত্যাগ করিয়া যায়।

অপরাপর ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায়

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব (Anglo-French Rivalry): অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ-ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইওরোপীয়গণ করমণ্ডল উপকূলের নামকরণ করিয়াছিল কর্ণাট। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারসংক্রান্ত যুদ্ধের সূত্রে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর-বিরোধী হিসাবে এই যুদ্ধে যোগদান করে। ইওরোপের এই যুদ্ধের জের টানিয়া ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। দাক্ষিণাত্যে সেই সময়ে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (বর্তমানে মাদ্রাজ) ছিল ইংরেজ বণিকদের প্রধান এবং সাময়িকভাবে সুরক্ষিত বাণিজ্য-কেন্দ্র। আর ফরাসীদের ছিল পণ্ডিচেরী। ইওরোপে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের প্রশ্ন ছাড়া সেই সময়কার দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় রাজাগণের দুর্বলতাও ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় রাজাগণ তাঁহাদের পারস্পরিক বিবাদে ইংরেজ ও ফরাসীদের সামরিক সাহায্য গ্রহণে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ বিবদমান দক্ষিণ-ভারতীয় রাজাগণকে সাহায্য-সহায়তা দান করিতে লাগিল। এইভাবে ক্রমে তথাকার রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে ইঙ্গ-ফরাসী বণিকদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল।

দক্ষিণ-ভারতীয় রাজনীতিতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের অংশগ্রহণ

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের হস্তে নিহত হইলে কর্ণাটের সিংহাসন লইয়া এক জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কর্ণাট ছিল হায়দরাবাদের নিজামের অধীন। নিজাম আনোয়ার-উদ্দিনকে নূতন নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু দোস্ত্ আলির জামাতা চাঁদা সাহেব কর্ণাটের নবাব-পদ দাবি করিলেন। এই সূত্রে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল তাহাতে ইংরেজ ও ফরাসীগণ বিবদমান দুই পক্ষের সাহায্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ফলে কর্ণাটের

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ (১৭৪৬-৪৮ খ্রীঃ)

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হইল। এই যুদ্ধ কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ (১৭৪৬-৪৮ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে এই-লা-স্যাপ্‌লের সন্ধিতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিলে ভারতেও দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল।

হায়দরাবাদ ও কর্ণাটের উত্তরাধিকারসংক্রান্ত দ্বন্দ্ব : কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৭৫১-৫৪ খ্রীঃ)

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে হায়দরাবাদের নিজাম নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের (আসফ্ জা) মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গ নিজাম-পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিলেন। সেই সঙ্গে দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব আনোয়ার-উদ্দিনকে বিতাড়িত করিয়া কর্ণাটের নবাব-পদ লাভের চেষ্টা শুরু করিলেন। নাসির জঙ্গ ও আনোয়ার-উদ্দিন রহিলেন একপক্ষে, অপরপক্ষে রহিলেন চাঁদা সাহেব ও মুজফ্‌ফর জঙ্গ। ডুপ্লে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ফরাসী শক্তি ও সাম্রাজ্য-সীমা বাড়াইতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি চাঁদা সাহেব ও মুজফ্‌ফর জঙ্গের পক্ষে যোগদান করিলেন। আর ইংরেজগণ যোগ দিল আনোয়ার-উদ্দিন ও নাসির জঙ্গের পক্ষে। কর্ণাটের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসীগণ সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজ সেনাপতি মেজর ল্যারেন্সের তৎপরতায় মুজফ্‌ফর জঙ্গ নাসির জঙ্গের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন, আর চাঁদা সাহেব পরাজিত হইয়া ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র পণ্ডিচেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।



যোসেফ্ ডুপ্লে

ফরাসী প্রাধান্য

ডুপ্লের সাহস, সমর-কুশলতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে পুনরায় মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ জয়যুক্ত হইল। চাঁদা সাহেব কর্ণাটের রাজধানী আর্কটে নবাব-পদে স্থাপিত হইলেন। স্বভাবতই এই অঞ্চলে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে ডুপ্লের ইঙ্গিতে নাসির জঙ্গ জনৈক আততায়ী কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ফলে মুজফ্‌ফর জঙ্গ বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হায়দরাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মহম্মদ আলি কর্তৃক সন্ধির প্রস্তাব

আনোয়ার-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি তখনও ত্রিচিনপল্লীতে রহিয়াছেন। তিনি চাঁদা সাহেবের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন যে, তাঁহার পিতা আনোয়ার-উদ্দিনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দাক্ষিণাত্যের এক ক্ষুদ্র অংশ তাঁহাকে দেওয়া হইলে তিনি চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব বলিয়া মানিয়া লইবেন। কিন্তু ফরাসী সাহায্য-পুষ্ট চাঁদা সাহেব তখন এই শর্তে সন্ধি করিতে রাজী হইলেন না। ফলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল না।

ত্রিচিনপল্লী ছিল সামরিক ও বাণিজ্যিক দিক হইতে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফরাসী সৈন্য এই স্থানটি অধিকার করিতে অগ্রসর হইল, কিন্তু ইংরেজ গভর্নর সণ্ডার্স মহম্মদ আলিকে সামরিক সাহায্যদানে ত্রুটি করিলেন না। সণ্ডার্স মারাঠাগণকে এবং তাঞ্জোর ও মহীশূরের রাজাকে নিজ পক্ষে টানিলেন। সেই সময়ে রবার্ট ক্লাইভ নামে জনৈক ইংরেজ সৈনিকের সমরকৌশল অনুসরণ করিয়া ইংরেজ পক্ষ আর্কট জয় করিতে সমর্থ হইল। ক্লাইভের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও তৎপরতায় কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ ইংরেজদের অনুকূলে চলিতে লাগিল।

রবার্ট ক্লাইভ—ইংরেজ পক্ষের জয়লাভ

অরণি ও কাবেরীপাক নামক অপর দুই যুদ্ধে ক্লাইভ জয়লাভ করিলে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ক্লাইভের সমরকুশলতায় এবং মারাঠা, মহীশূর ও তাঞ্জোরের সাহায্যে বলীয়ান ইংরেজ বাহিনীকে ডুপ্লে কোনভাবেই পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। রবার্ট ক্লাইভ ডুপ্লে ও চাঁদা সাহেবের যুগ্ম বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া ত্রিচিনপল্লী অধিকার করিলেন এবং মহম্মদ আলিকে আর্কটের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রভাব ও প্রতিপত্তির স্থলে ইংরেজ প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল। অবশেষে ফরাসী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ডুপ্লে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। পর বৎসর (১৭৫৫ খ্রীঃ) ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রাধান্য-প্রতিপত্তির অবসান

বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব: বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপায়িত (Anglo-French Conflict in Bengal : From Trade to Political Domination): মোগল সম্রাট ঔরংজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে (১৭০৫ খ্রীঃ) বাংলাদেশের নবাবি একপ্রকার স্বাধীন হইয়া উঠে। সম্রাট আকবরের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া ঔরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত (১৭০৭ খ্রীঃ) বাংলাদেশ মোগল প্রাধান্য ও আনুগত্য স্বীকার করিয়াই চলিত। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ কেবল নামেমাত্রই মোগল সম্রাটের অধীনে ছিল। কার্যত উহা স্বাধীনই ছিল। এমনকি, ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট ফারুকশিয়ার ইংরেজগণকে বিনা শুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার 'ফরমান' দান করিলে মুর্শিদকুলি খাঁ উহা অগ্রাহ্য করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। পরবর্তী নবাবগণ—সুজা-উদ্দিন খাঁ, সরফরাজ খাঁ, আলিবর্দী খাঁ প্রভৃতির আমলেও এই স্বাধীনতা অটুট ছিল।

মুর্শিদকুলি খাঁ

সুজা-উদ্দিন, সরফরাজ খাঁ

আলিবর্দী ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী নবাব। তিনি একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজ বণিকগণকে নিছক বণিক হিসাবে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার ভিন্ন অপর কোনপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করা নিরাপদ নহে। কারণ, ইংরেজ বণিকদের

আলিবর্দী খাঁর শাসনদক্ষতা

অভিসন্ধি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না। ইংরেজ বণিকদের নৌ-বলের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার ইচ্ছা তাঁহার থাকিলেও সেই ইচ্ছা কার্যকর করা সম্ভব হইবে না, একথা উপলব্ধি করিয়া তিনি ইংরেজদের প্রতি মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে রাজনৈতিক কোনপ্রকার শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগদানে তিনি মোটেই রাজী ছিলেন না।

তাঁহার দূরদর্শিতা

সিরাজ-উদ্-দৌলা, ১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ (Siraj-ud-dowla): আলিবর্দী খাঁ ছিলেন অপুত্রক। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার তিন কন্যার মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠার পুত্র সিরাজ-উদ্-দৌলাকে বাংলার নবাব-পদ দান করিয়া যান। তাঁহার অপর দুই কন্যার মধ্যে একজন ছিলেন ঘসেটি বেগম। ইনি ছিলেন ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার বিধবা পত্নী। অপর কন্যা ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার বিধবা স্ত্রী। এই সকল নিকট-আত্মীয়ের পরিবারস্থ সকলেই বাংলার মসনদ লাভের আশা পোষণ করিতেন। এমতাবস্থায় মৃত্যু-কালে আলিবর্দী খাঁ মির্জা মহম্মদকে, সাধারণ্যে পরিচিত সিরাজ-উদ্-দৌলাকে, বাংলার নবাব মনোনীত করিয়া গেলে তাঁহাদের আশা ভঙ্গ হইল। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার পুত্র সৌকৎ জঙ্গ এবং ঢাকার শাসনকর্তার বিধবা পত্নী ঘসেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজবল্লভও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। সেই সময়ে বাংলার ইংরেজ বণিকদের সহিত সিরাজ-উদ্-দৌলার বিবাদ বাধিলে পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল।

সিরাজের মসনদ লাভ

তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার মসনদে আরোহণ করিবার সময় হইতেই ইংরেজগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে শুরু করে। তাহারা চিরাচরিত প্রথা অমান্য করিয়া সিরাজ-উদ্-দৌলার মসনদ লাভের কালে কোনপ্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করে নাই। তদুপরি নবাবের শত্রু রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস প্রভূত ধনরত্ন লইয়া ঢাকা হইতে পলাইয়া আসিলে ইংরেজগণ তাহাকে আশ্রয় দান করে। নবাবের অনুরোধ সত্ত্বেও তাহারা কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হয়। এমন সময় ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইলে (১৭৫৬ খ্রীঃ) সেই সূত্রে বাংলাদেশের ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। তাহারা নিজ নিজ বাণিজ্যকুঠির নিরাপত্তার জন্য পরিখা খনন, দুর্গ নির্মাণ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সিরাজ তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলে ফরাসী বণিকগণ সেই আদেশ মানিল বটে, কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ তাহা অমান্য করিয়া নবাবের দূতকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল।

সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতি ইংরেজদের বিদ্বেষভাব

ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্য

ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ ও ইংরেজগণ যে যুগ্মভাবে এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে একথা সিরাজের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা ঘসেটি

বেগমকে নিজ তত্ত্বাবধানে লইয়া আসিলেন। ইহাতে ইংরেজ বণিকদের টনক নড়িল।

ঘসেটি বেগমকে নিজ তত্ত্বাবধানে আনয়ন—ইংরেজদের অনুশোচনা

তাহারা সিরাজ-উদ্-দৌলার নিকট কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহারা দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করিল না। বাধ্য হইয়া সিরাজ তাহাদের কলিকাতাস্থ দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করিলেন। ইংরেজগণ প্রাণভয়ে ফল্‌তা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সিরাজ ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিলেন।

সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা অধিকার (১৭৫৬ খ্রীঃ)

সিরাজ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম—অর্থাৎ কলিকাতা অধিকৃত হইয়াছে এই সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে সেখান হইতে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সনের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য ও একটি নৌ-বহর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরিত হইল। ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন সহজেই কলিকাতা পুনর্দখল করিলেন। সিরাজ পুনরায় কলিকাতার ইংরেজদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কলিকাতার নিকটে কাশীপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। রবার্ট ক্লাইভ তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর হইলে উভয়পক্ষে আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। সিরাজ ইংরেজ কোম্পানিকে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দানে স্বীকৃত হইলেন।

ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন কর্তৃক কলিকাতা পুনর্দখল



সিরাজ-উদ্-দৌলা

আলিনগরের সন্ধি

আলিনগরের সন্ধি দ্বারা সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিল বটে কিন্তু মিত্রতা স্থাপিত হইল না। ক্লাইভ সেই সময় হইতেই সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। মুর্শিদাবাদে নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। আলিবর্দী খাঁর ভগিনীপতি মিরজাফর সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং বাংলার নবাব হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মিরজাফর ছিলেন সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রধান সেনাপতি। তিনি মুর্শিদাবাদের অর্থলোভী শেঠ সম্প্রদায়, জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায়দুর্লভ প্রভৃতিকে নিজ দলে টানিয়া সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রবার্ট ক্লাইভও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজ-উদ্-দৌলার বাধাদান সত্ত্বেও ইওরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া বাংলাদেশে ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। ফরাসীদের সাহায্য লইয়া ইংরেজদের সহিত সিরাজ-উদ্-দৌলার ভবিষ্যতে যুঝিবার সুযোগ ইহাতে বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

ক্লাইভ কর্তৃক চন্দননগর অধিকার

তারপর সামান্য অজুহাতে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ ও রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল। মিরজাফর ও রায়দুর্লভ ষড়যন্ত্রের শর্ত অনুসারে নবাবের এক বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া নিজ দেশ ও নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। মিরমদন ও মোহনলাল অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক সৈন্যসহ রবার্ট ক্লাইভের সেনাবাহিনীর সহিত যুঝিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমরকুশলতায় ক্লাইভ যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। তিনি নিকটবর্তী আম্রকাননে নিজ সৈন্যদলকে অপসারিত করিলেন। সেই সময়ে মিরমদনের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে নবাব পক্ষের যাবতীয় দায়িত্ব পড়িল মোহনলালের উপর। মোহনলাল বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। মিরমদনের মৃত্যুতে সিরাজ-উদ্-দৌলা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মিরজাফরকে দেশরক্ষার জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মিরজাফর মুখে নবাবের প্রতি আনুগত্যের ভান করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। সিরাজ তখন মানসিক স্থৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মিরজাফরের পরামর্শক্রমে মোহনলালকে যুদ্ধত্যাগের আদেশ দিলেন। মোহনলাল প্রথমে সেই আদেশ পালনে রাজী হইলেন না, কারণ যুদ্ধ তখন নবাবী সৈন্যদের অনুকূলেই চলিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবাবের আদেশ তাঁহাকে মানিতেই হইল। এইভাবে যুদ্ধে যখন পরাজয় নিশ্চিত তখন মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভ জয়লাভ করিলেন। সিরাজ-উদ্-দৌলা ভাগলপুরের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ মসিয়েঁ ল'-এর সাহায্য লইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে বিহারের দিকে গোপনে পলায়ন করিলেন। পথে তিনি ধরা পড়িলেন। মিরজাফরের আদেশে তাঁহার পুত্র মিরণ সিরাজকে হত্যা করাইলেন।

পলাশীর যুদ্ধ (২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ)

মিরমদন ও মোহনলালের বীরত্ব

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা



মিরজাফর

সিরাজের পলায়ন

পলাশীর যুদ্ধের ফলে মিরজাফর বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রবার্ট ক্লাইভের সহায়তার বিনিময়ে তিনি এত বেশী পরিমাণ অর্থ পুরস্কারস্বরূপ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সেই পরিমাণ অর্থ তখন নবাবী খাজাঞ্চিখানায় ছিল না। তদুপরি ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা

মিরজাফরের মসনদ লাভ

দিলে মিরজাফর ইংরেজদের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য লইয়াছিলেন। এই সকল কারণে ইংরেজদের নিকট তাঁহার দেনা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মিরজাফর এই সকল দেনা ও ইংরেজদের সাহায্যের পুরস্কার মিটাইবার জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে প্রচুর অর্থ ও চব্বিশ পরগণার জমিদারি দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ঋণ শোধ হইল না। এমনকি, নবাবী আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়াও মিরজাফর ইংরেজদের ঋণ সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে পারিলেন না। যাহা হউক রবার্ট ক্লাইভ ও তাঁহার কর্মসচিবগণ প্রচুর পুরস্কার পাইলেন। এইভাবে প্রথম হইতে মিরজাফরের শাসনকে আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্বল এবং সামরিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজনীতিতে এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। বাংলার নবাবের শক্তি ও প্রভুত্ব সেই সময় হইতে ইংরেজগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল।

বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রভাব

পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা স্বর্য অস্তমিত হইয়াছিল, সাধারণ্যে এই কথাই প্রচলিত। কিন্তু একথা বলা ভুল হইবে, কারণ পরবর্তী কালে মিরকাশিম নিজ ইচ্ছামত মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং গুর্গিন্ খাঁ, মার্কার ও সামরুর অধীনে ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে নিজ সৈন্যবাহিনীকে শিখাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল কাজ মিরকাশিমের স্বাধীনতার পরিচায়ক। সুতরাং পলাশীর যুদ্ধের পরও বাংলাদেশের নবাবের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল একথা স্বীকার করিতে হইবে। মিরজাফরের ন্যায় হীনচেতা লোকের পক্ষে অবশ্য সেই স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন ইংরেজদের তাঁবেদার কিন্তু মিরকাশিম বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রীঃ) পরাজিত হইলে এবং ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল ক্লাইভ কর্তৃক বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রকৃত প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরোক্ষ নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়াছিল, একথা স্বীকার করিতে হইবে। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইবার পথে আর কোন বাধা ছিল না।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ

ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) সূত্রে যখন বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব চলিতেছিল সেই সময়ে কর্ণাট অঞ্চলেও পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পণ্ডিচেরী, মাহে, জিঞ্জি প্রভৃতি ফরাসী অধিকৃত স্থানের পতন ঘটে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধিতে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবসান ঘটিলে ফরাসীগণ তাহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি ফিরিয়া পায় বটে, কিন্তু কেবল বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবেই এগুলি ব্যবহার করা চলিবে এই প্রতিশ্রুতি ফরাসী সরকারকে দিতে হয়। এইভাবে ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ প্রাধান্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রিটিশ শক্তির প্রসার

(Expansion of British Power)

রবার্ট ক্লাইভ (১৭৫৬-৬০ খ্রীঃ) : সিরাজ-উদ্-দৌলাকে মস্‌নদচ্যুত করিয়া রবার্ট ক্লাইভ মিরজাফরকে নবাব-পদে বসাইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মত হীনচেতা ব্যক্তির পক্ষেও অধিককাল ইংরেজদের তাঁবেদারি করা সম্ভব হইল না। তিনি ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ক্লাইভ বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করিয়া সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। এইবার মিরজাফরকে মস্‌নদ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার জামাতা মিরকাশিমকে নবাব-পদে স্থাপন করা হইল। এজন্য ইংরেজগণ বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারি পাইল। নবাব পরিবর্তন করা ইংরেজদের এক অতিশয় লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইল। ক্লাইভ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

ক্লাইভ ও মিরজাফর

মিরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা দূরদর্শী রাজনীতিক। ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন এবং নিজ সেনাবাহিনীর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। ইংরেজ কর্মচারিগণ তাহাদের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য বিনা শুল্কে চালান দিতে পারিত। এজন্য 'দস্তক' নামে এক প্রকার ছাড়পত্র দেখাইলেই চলিত। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারিগণ এই সকল ছাড়পত্র দেখাইয়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য মালপত্র এক স্থান হইতে অন্যত্র বিনা শুল্কে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত এবং অবৈধভাবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে দেশীয় বণিকগণ ঘাটে ঘাটে শুল্ক দিয়া ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। মিরকাশিম ইংরেজ গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও যখন কোন প্রতিকার পাইলেন না তখন নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়া দেশীয় বণিকদের মাল চলাচলের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে রুষ্ট হইয়া পাটনার ইংরেজ কুঠির এলিস সাহেব পাটনা দখল করিলে মিরকাশিম বাধ্য হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তিনি পাটনা শহরটি পুনর্দখল করিলেন এবং ইংরেজ বাণিজ্য-কুঠি ভাঙিয়া দিলেন। এই সূত্রে ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালা—এই তিনটি যুদ্ধে পর পর পরাজিত হইয়া মিরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সাহায্য লইয়া বক্সারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এবারও তাঁহার পরাজয় ঘটিল। সুজা-উদ্-দৌলা ও শাহ্ আলম ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন।

মিরকাশিম ও ইংরেজগণ

বক্সারের যুদ্ধ

ইংরেজগণ মিরকাশিমের ন্যায় স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে মস্নদে বসাইবার ভুল বুঝিতে পারিয়া মিরজাফরকেই পুনরায় মস্নদে বসাইল (১৭৬৪ খ্রীঃ)। এক বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নজম-উদ্-দৌলাকে নবাব-পদে স্থাপন করিয়া ইংরেজগণ প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিল। এই সময় হইতে বাংলার নবাব কেবল নামেমাত্রই নবাব রহিলেন, প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হস্তগত হইল। এইভাবে ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইলে তাহারা বেপরোয়া হইয়া উঠিল। তাহারা নিজ নিজ স্বার্থ-সিদ্ধিতে এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, কোম্পানির শাসনে দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল, কোম্পানির স্বার্থও বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চলিল। এমতাবস্থায় ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টর সভা ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্নর করিয়া পাঠাইল। ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া লর্ড ক্লাইভ হইয়াছিলেন।

বাংলার নবাব নামেমাত্র নবাব

বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া লর্ড ক্লাইভ ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য ও দুর্নীতি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন ; এবং অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে কারা ও এলাহাবাদ এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ আদায় করিলেন। সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলম তখনও দিল্লীতে প্রবেশ করিবার সাহস পাইতেছিলেন না। তাঁহার পিতার হত্যার পর তিনি একপ্রকার রাজ্যহীন অবস্থায়ই ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ক্লাইভ তাঁহাকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুইটি দিয়া দিলেন এবং বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা দিবার শর্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর অধিকার আদায় করিলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)। ইহার অর্থ ছিল এই যে, রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় দায়িত্ব ইংরেজ কোম্পানির উপর বর্তাইয়াছিল। দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরেজ কোম্পানি আইনত এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা পাইল। ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে দেওয়ানী লাভ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। ক্লাইভ বাংলার নবাবকে বৎসরে ৫৩ লক্ষ টাকা দিবার বিনিময়ে রাজস্বের উপর তাঁহার সকল অধিকার কাড়িয়া লইলেন। ফলে বাংলার নবাব ইংরেজ কোম্পানির ভাতাভোগী হইয়া পড়িলেন। ক্লাইভ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নবাবের উপরই পূর্ববৎ রাখিয়া দিলেন, অথচ রাজস্বের উপর অধিকার নিজের হাতে রাখিলেন। এই ব্যবস্থা 'দ্বৈত শাসন' (Double Government) নামে পরিচিত। ইহার ফলে নবাবের উপর ক্ষমতাহীন দায়িত্ব, আর ইংরেজদের হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা রহিল।

কোম্পানির দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫ খ্রীঃ)

ইংরেজদের অধিকার আইনত স্বীকৃত



রবার্ট ক্লাইভ

ক্লাইভের 'দ্বৈত শাসন' ব্যবস্থা

ওয়ারেন হেস্টিংস্ (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) ও কর্নওয়ালিসের (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ) আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার : ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বাংলার গর্ভনর হইয়া আসিয়া প্রথমেই উপলব্ধি করিলেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই শক্তিকে সুদৃঢ় করিবার এবং ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে স্থায়িত্বদানের জন্য ইংরেজ শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত ও সংগঠিত করা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বেই ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের ইংরেজগণ মহীশূরের সুলতান হায়দর আলির বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের নিজামকে সামরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। এজন্য অবশ্য তাহারা উত্তর-সরকার নিজামের নিকট হইতে পাইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ যখন শুরু হইল তখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী হায়দর আলির রাজ্য আক্রমণ করিলে তাহাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল, উপরন্তু হায়দর আলি মাদ্রাজ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। মাদ্রাজের ইংরেজ কাউন্সিল হায়দর আলির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইল (১৭৬৯ খ্রীঃ)। পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল এবং কোন পক্ষকে অপর কোন শক্তি আক্রমণ করিলে উভয়ে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে স্থির হইল। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটিল। কিন্তু দুই বৎসর পর ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর আক্রমণ করিলে ইংরেজগণ তাহাদের ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া হায়দর আলির সাহায্যে অগ্রসর হইল না। ফলে হায়দর আলি ইংরেজদের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ



ওয়ারেন হেস্টিংস্

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত মারাঠাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। নানা ফড়নবিশ নিহত পেশওয়া নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলে নারায়ণ রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। পেশওয়া-পদ লাভের জন্য তিনিই নারায়ণ রাওকে হত্যা করাইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের ইংরেজগণ রঘুনাথের পক্ষ গ্রহণ করিল। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে যোগদান করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করাই ছিল ইংরেজদের উদ্দেশ্য। যুদ্ধের প্রথম দিকে তেলেগাঁওয়ের যুদ্ধে মারাঠা শক্তির হস্তে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পরাজিত হইল। তাহারা ওয়াড়গাঁওয়ের সন্ধি দ্বারা যাবতীয় বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিতে এবং রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তি ইংরেজদের মর্যাদায় দারুণ আঘাত হানিল। ওয়ারেন হেস্টিংস্ এই চুক্তির শর্ত মানিতে রাজী হইলেন না। ফলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। মারাঠা নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধে পেশওয়া ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নানা ফড়নবিশের সমর্থনে

দাঁড়াইলেন। এমন সময় হায়দরাবাদের নিজাম এবং মহীশূরের হায়দর আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মারাঠা, মহীশূর ও নিজাম এই তিনের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ইংরেজগণকে আত্মরক্ষা করিতে হইল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ তাঁহার অসাধারণ কর্ম-কুশলতা, অধ্যবসায় ও দূরদর্শিতা দ্বারা এই সঙ্কট হইতে ব্রিটিশ শক্তিকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজগণ তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। কোন পক্ষই জয়লাভে সমর্থ না হইলে মাহাদজী

সল্‌বইয়ের সন্ধি (১৭৮২ খ্রীঃ)

সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সল্‌বইয়ের সন্ধি (১৭৮২ খ্রীঃ) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ইংরেজগণ দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশওয়া বলিয়া স্বীকার করিল। রঘুনাথ রাওকে বাৎসরিক ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইংরেজগণ অবশ্য সল্‌সেট্ নিজ অধিকারেই রাখিতে পাইল। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটিল। সল্‌বইয়ের সন্ধি মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধের শক্তি ও সুযোগ বাড়াইয়া দিল। মারাঠাগণ হায়দর আলি কর্তৃক ইংরেজদের নিকট হইতে বিজিত স্থানসমূহ পুনরুদ্ধারে সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। এইভাবে কূটকৌশলে ইংরেজগণ ভারতীয় শক্তি-গুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিল।



হায়দর আলি

এদিকে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র ও বন্দর মাহে ইংরেজগণ দখল করিলে হায়দর আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৭৮০ খ্রীঃ)। তিনি কর্ণাট আক্রমণ করিলেন এবং উহা দখল করিলেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস্ কূটকৌশলে নিজাম ও সিন্ধিয়াকে হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করিতে সম্মত করাইলেন। কিন্তু হায়দর আলি ইহাতেও দমিবার পাত্র ছিলেন না। কিন্তু ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টোনভোর যুদ্ধে সার্ আয়ার কূটের হস্তে তিনি পরাজিত হইলেন।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

নেগাপত্তম, ত্রিংকোমালি প্রভৃতি স্থানও ইংরেজগণ অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু হায়দরের পুত্র টিপু ব্রিটিশ বাহিনীকে তাঞ্জোরের নিকট পরাজিত করিলেন। হায়দর আলি ফরাসী সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন এবং এক ফরাসী নৌ-বহর দক্ষিণ-ভারতের দিকে অগ্রসর হইলে হায়দরের আশা ও উৎসাহ

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪ খ্রীঃ)

বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ফরাসী সাহায্যলাভের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল (১৭৮২ খ্রীঃ)। হায়দরের পর তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের সহিত যুঝিয়া চলিলেন। তিন বৎসর পর্যন্ত কোন পক্ষই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে সমর্থ না হইলে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষরিত

হইল। উভয় পক্ষ পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি মহীশূর রাজ্য ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি ঘটাইলেও ইহাতে দুই পক্ষের মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইল না। ইংরেজগণ টিপুর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু ছিল। মহীশূর রাজ্য সেই সময়ে দক্ষিণ-ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল। দক্ষিণ-ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মহীশূর রাজ্যের পতন ইংরেজদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে টিপু সুলতান ইংরেজদের ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিলেন।



টিপু সুলতান

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুর সহিত ইংরেজদের পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। টিপু অসাধারণ সাহস ও অনমনীয় দেশাত্মবোধ লইয়া ইংরেজদের সহিত জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। ইহা ছিল তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। এদিকে ওয়ারেন হেস্টিংসের স্থলে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মারাঠা, নিজাম, কুর্গ ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজাগণের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া টিপুকে সম্পূর্ণ এককভাবে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিলেন। টিপু যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দেশীয় রাজাগণের দেশাত্মবোধের অভাবহেতু তাঁহারা বিদেশীদের পক্ষগ্রহণেও দ্বিধাবোধ করিলেন না। সেরিঙ্গাপত্তমের সন্ধিতে টিপু নিজ রাজ্যের অধিকাংশ এবং তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্রিটিশদের দিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২ খ্রীঃ)। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ-ভারতে মহীশূর রাজ্যের প্রাধান্য বিনষ্ট হইল এবং সেই স্থলে ইংরেজদের প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

দক্ষিণ-ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য

লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ): ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটিল লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে। ওয়েলেসলী যখন গভর্নর-জেনারেল হইয়া আসিলেন সেই সময়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া প্রায় সকল মহাদেশেই এক জীবনমরণ সংগ্রাম চলিতেছিল। দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতান সেরিঙ্গাপত্তমের সন্ধি মানিয়া চলিতে স্বভাবতই রাজী ছিলেন না। তিনি সাহায্যলাভের জন্য বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন আফগানিস্তান, আরব ও তুরস্কের সহিত ব্রিটিশ-বিরোধী সঙ্ঘ স্থাপনের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কাবুলের জামান শাহের নিকট টিপু ব্রিটিশদের ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠাইলেন। ওয়েলেসলীকে এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ফরাসীগণ যাহাতে ভারতে শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারে সেজন্য ভারতের রাজাগণের

টিপু সুলতান ও ইংরেজদের পারস্পরিক বিদ্বেষ

মধ্যে যাঁহারা ফরাসীদের সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করিতেন তাঁহাদিগকে দমন করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।



লর্ড ওয়েলেস্‌লী

ওয়েলেস্‌লীর পূর্ববর্তী গভর্নর-জেনারেল-দের কার্যকাল পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল বিজিত রাজ্যের উপর নিজেদের শক্তি সুদৃঢ় করা এবং কোন প্রকার ঝুঁকি না লইয়া সাম্রাজ্য প্রসার সম্ভব হইলে তাহা করা। ভারতের রাজশক্তিগুলি যাহাতে বিরোধী না হইয়া উঠে সেদিকেও নজর রাখা ছিল ব্রিটিশ সরকারের নীতি। কিন্তু ওয়েলেস্‌লী আসিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারতীয় রাজাগণের মধ্যে যত জনকে সম্ভব ব্রিটিশ অধীনে আনিতে হইবে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের —অর্থাৎ ওয়েলেস্‌লীর ভারত আগমনের পূর্বেই মারাঠা ও মহীশূর রাজ্যের শক্তি প্রায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন ব্রিটিশ শক্তির প্রসারের খুবই অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায় ও শিল্পপতিগণও তাহাদের নিজ স্বার্থে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ চাহিয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের অর্থই ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রসারের সুযোগবৃদ্ধি।

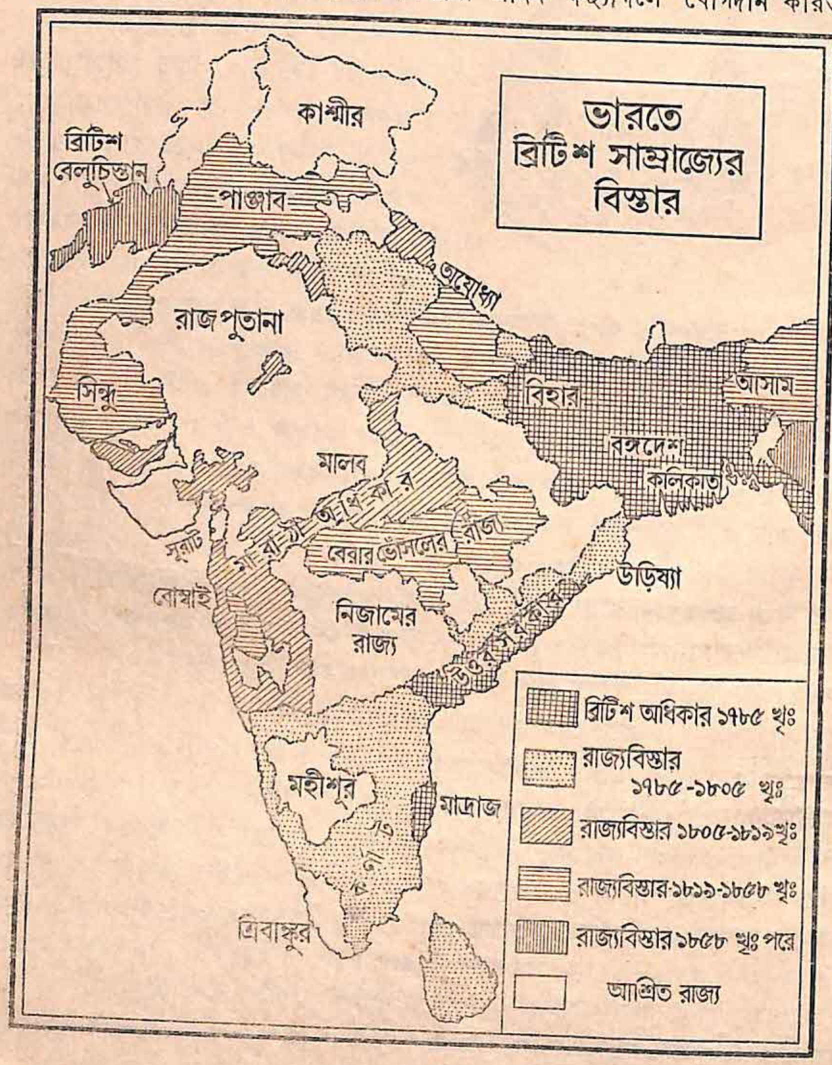
ওয়েলেস্‌লীর রাজ্য-বিস্তার নীতি

উপরি-উক্ত নীতি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে ওয়েলেস্‌লী 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র মাধ্যমে ও যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য সম্প্রসারণ এবং পূর্বে যে-সকল রাজা বা নবাবের রাজ্য ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীনে আসিয়াছিল সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে মনোযোগী হইলেন। সেই সময়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত ভারতীয় নৃপতিগণের প্রত্যেকেই ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণের জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লী এই সুযোগ হারাইতে চাহিলেন না। তিনি তাঁহার অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি (Subsidiary Alliance) প্রচলন করিলেন। যে-সকল দেশীয় নৃপতি অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি ইংরেজ কোম্পানির সহিত স্বাক্ষর করিতেন বহিরাক্রমণ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষার ভার কোম্পানি গ্রহণ করিত। সেজন্য কোম্পানিকে তাঁহাদের রাজ্যের কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে হইত অথবা সেজন্য ব্যয় বহন করিতে হইত। ইহা ভিন্ন এই সকল নৃপতি ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে অপর কোন শক্তির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ বা আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। এই সকল চুক্তিবদ্ধ নৃপতিগণ নিজেদের

অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি

সেনাবাহিনী রাখিতে পারিতেন, কিন্তু উহার পরিচালনার ভার একজন ইংরেজ সেনাপতির উপর ন্যস্ত করিতে হইত। 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র চুক্তির নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই মিত্রতা চুক্তি যে-সকল দেশীয় নৃপতি স্বাক্ষর করিতেন তাঁহারা ইংরেজদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের স্বাধীনতাও সঙ্গে সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হইত। ইহা ভিন্ন দেশরক্ষার ভার ইংরেজ কোম্পানির উপর ন্যস্ত হইলে উহার খরচ বাবদ চুক্তিবদ্ধ নৃপতিগণকে এত বেশী পরিমাণ অর্থ দিতে হইত যে, তাঁহাদের পক্ষে আর নিজেদের সেনাবাহিনী পোষণ করা সম্ভব হইত না। এই সকল কর্মচ্যুত সৈনিকের অনেকে পিণ্ডারী নামক দস্যু দলে যোগদান করিত।

অধীনতামূলক মিত্রতার নীতির ফলে ইংরেজ প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ



অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির ফলে ইংরেজ কোম্পানি দেশীয় নৃপতিদের অর্থে তাহাদের বিশাল সামরিক বাহিনীর ব্যয়-সঙ্কুলান করিত।

নিজাম অধীনতামূলক মিত্রতায় চুক্তিবদ্ধ

হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথমে ইংরেজ কোম্পানির সহিত অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ)। মারাঠাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতিতে তিনি কোম্পানির ছয় ব্যাটালিয়ন সৈনিকের খরচ বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই সেনাবাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এজন্য নবাবকে রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল—অর্থাৎ তাঁহার রাজ্যের অর্ধেকাংশ ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল। নানা ফড়নবিশ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন ওয়েলেস্‌লী মারাঠাদিগকে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণের বার বার অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও, যশোবন্ত রাও হোলকার, দৌলত রাও সিন্ধিয়া সকলেই মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যশোবন্ত রাও হোলকার ও দৌলত রাও সিন্ধিয়া যুগ্মভাবে পুণা আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বাজী রাও পলাইয়া গিয়া ইংরেজদের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন এবং ব্যাসিনের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেন। ইংরেজ সাহায্য লইয়া দ্বিতীয় বাজী রাও পুণা পুনরধিকার করিয়া পেশওয়া-পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ইংরেজদের পদলেহন সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সহ্য হইল না।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

তাঁহারা ব্যাসিনের চুক্তি ভাঙিয়া দিয়া পেশওয়াতন্ত্রের পূর্ণ মর্যাদা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইলেন। বরোদার গাইকোয়াড় অবশ্য এই চেষ্টায় যোগদান করিলেন না। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের যুগ্ম বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হইল। ইহা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ নামে পরিচিত। অসইয়ের যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে পরাজিত হইলেন। সিন্ধিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর অস্ত্রধারণ করিলেন না। ভোঁসলে একাই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে

মারাঠাদের অধীনতা-মূলক মিত্রতা গ্রহণ

ওয়াড়গাঁওয়ের যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হইয়া ভোঁসলে ইংরেজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। সিন্ধিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ত্যাগ করিলেও তিনি তখনও অধীনতামূলক মিত্রতাবদ্ধ হন নাই। ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং সুরয-অর্জুনগাঁওয়ের চুক্তি দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করেন। এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের শক্তি ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাইল এবং মারাঠা শক্তি চিরতরে দুর্বল হইয়া পড়িল।

কর্ণাট, তাঞ্জোর ও সুরাট অধিকার

কর্ণাটের নবাব নামেমাত্রই নবাব ছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদের হস্তেই ছিল। ওয়েলেস্‌লী তাঁহাকে নবাবপদ হইতে সরাইয়া দিয়া তাঁহার রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে পেনশন বা ভাতা

দানের ব্যবস্থা করিলেন। অনুরূপ তাঞ্জোর এবং সুরাটের রাজাগণকে পেনশন দানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের রাজ্য দখল করিয়া লইলেন।

টিপু সুলতান ওয়েলেস্‌লীর অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিতে স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না। টিপু ফরাসী সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন এই অভিযোগে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেস্‌লী টিপুর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইহা চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ নামে পরিচিত। টিপু ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, সাহসী বীরপুরুষ। ইংরেজদের পেনশনভোগী রাজা বা নবাবের ন্যায় বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী সেরিঙ্গাপত্তম্—অর্থাৎ শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষা করিতে গিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধে প্রাণ দিলেন (১৭৯৯ খ্রীঃ)। টিপুর রাজ্যের অধিকাংশ ইংরেজগণ দখল করিল, ইংরেজদের তাঁবেদার মিত্র নিজাম কতকাংশ পাইলেন। মারাঠাগণ মহীশূরের কোন অংশগ্রহণে রাজী হইল না। অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশে হায়দর আলি যে হিন্দু রাজবংশকে উৎখাত করিয়া মহীশূর রাজ্য দখল করিয়াছিলেন সেই বংশের একজন উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইল। এইভাবে ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রু মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটিল।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ : টিপুর পতন : দাক্ষিণাত্যে ইংরেজগণ নিরঙ্কুশ

ভরতপুরের রাজা ও হোল্‌কারের যুগ্ম বাহিনী দিল্লী অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে ইংরেজ বাহিনীর সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বাধিল। ভরতপুরের রাজা ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া লইলেন। মিত্রহীন হোলকারের বিরুদ্ধে যখন ওয়েলেস্‌লী প্রস্তুত হইতেছিলেন সেই সময় তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। ওয়েলেস্‌লীর চেষ্টায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে সর্বাধিক শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

ভরতপুর অধিকার

লর্ড হেস্টিংস্ (১৮১৩-২৩ খ্রীঃ) ও ডালহৌসীর (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ) আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার : লর্ড ওয়েলেস্‌লী ও লর্ড হেষ্টিংসের শাসনকালের অন্তর্বর্তী সময়ে যে-সকল গভর্নর-জেনারেল ভারতে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রধানত শান্তি নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার তখন ঘটে নাই। কিন্তু লর্ড হেষ্টিংস (লর্ড ময়রা) শাসনভার গ্রহণ করিলে পুনরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে গোরক্ষপুর জেলাটি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের হাতে আসিলে কোম্পানির রাজ্যের উত্তর-সীমা নেপালের দক্ষিণ-সীমার সংলগ্ন হইয়া পড়ে। নেপালের গুর্খা বংশের রাজাগণ সেই সময়ে দক্ষিণ দিকে রাজ্যবিস্তার শুরু করিলে ইংরেজদের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ বাধে। শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ শুরু হয় (১৮১৪-১৬ খ্রীঃ)। ইহা গুর্খা যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে নেপালরাজ পরাজিত হইলে সগৌলির সন্ধি দ্বারা (১৮১৬ খ্রীঃ) নেপাল ইংরেজদিগকে আলমোড়া, নৈনিতাল, সিমলা, মুসৌরী প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

গুর্খা যুদ্ধ : নৈনিতাল, আলমোড়া, মুসৌরী, সিমলা অধিকার

এদিকে পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও ইংরেজ রেসিডেণ্টের ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া ইংরেজ প্রাধান্য মুক্ত হইতে চাহিলেন। এজন্য তাঁহার মন্ত্রী ত্রিম্বকজী হোলকার-সিন্ধিয়া-ভোঁসলে-পেশওয়া মৈত্রী স্থাপনের গোপন আলোচনা শুরু করিলেন। অবশেষে এই মৈত্রী স্থাপিত হইলে পুণার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট এলফিন্স্টোনের আবাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল। তিনি কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হইল। এই যুদ্ধে পেশওয়া, ভোঁসলে এবং হোলকার পরাজিত হইলেন। পেশওয়ার রাজ্যের একাংশ, ভোঁসলের রাজ্যের একাংশ এবং হোলকারের রাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইল। এইভাবে মারাঠা শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া এবং ইংরেজ প্রাধান্যের অধীনে আনিয়া লর্ড ময়রা ভারতে ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিহত করিয়া তুলিলেন।

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ—মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত : ভারতে ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিহত

সেই সময়ে মারাঠাদের আক্রমণে রাজপুত রাজ্যগুলি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পিণ্ডারী দস্যুদের আক্রমণে সেগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস্ রাজপুত রাজ্যগুলির উপর মারাঠা প্রাধান্য খর্ব করিয়া রাজপুত রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীনে আনিলেন। এইভাবে মারাঠা ও রাজপুতদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া লর্ড ময়রা ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করিয়া গেলেন।

রাজপুত রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীনে আনয়ন

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সময় ছিল লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে (১৮৪৪-৪৮ খ্রীঃ) শিখ রাজমাতা ঝিন্দন দলীপ সিংহের অভিভাবিকা ছিলেন। শিখ সেনাবাহিনী খাল্সার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাহাদের শক্তিহ্রাসের উপায় হিসাবে তিনি তাহাদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করিলেন। ইহা অমৃতসরের চুক্তি বিরোধী ছিল। ফলে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হইল। শিখগণ মুদকি, ফিরোজশাহ্, আলিওয়াল ও সৌঁব্রাওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাশ্মীর রাজ্যটি ইংরেজদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। লাহোরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার নির্দেশক্রমে পাঞ্জাবের শাসনকার্য পরিচালিত হইতে লাগিল।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ) : পাঞ্জাবে ইংরেজ প্রভাব

ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের তাঁবেদার হিসাবে শাসন চালানো শিখদের পক্ষে দীর্ঘ দিন সহ্য হইল না। তাঁহার ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া শিখ বাহিনীও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ডালহৌসী সঙ্গে সঙ্গে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে ডালহৌসী পাঞ্জাবের নাবালক রাজা দলীপ সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিলেন। ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সীমা আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ) : পাঞ্জাব দখল

ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ বাধিয়াছিল লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে (১৮২৩-২৮ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বাহিনী জয়ী হইলে ব্রহ্মের রাজা পগিদোয়া যান্দাবুর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন (১৮২৬ খ্রীঃ)। ফলে টেনাসেরিম ও আরাকান অঞ্চল ইংরেজদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে এবং এক বিরাট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে তিনি বাধ্য হন। ব্রহ্মদেশে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ডালহৌসীর শাসনকালে ব্রহ্মদেশের ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের ঔদ্ধত্যে এক তীব্র বিদ্বেষ জাগিয়া উঠে, ফলে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর কয়েকজন ইংরেজ বণিক বর্মীদের হস্তে লাঞ্ছিত হইলে সেই সূত্রে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মরাজ ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন। পেগু ব্রিটিশদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল। ফলে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া আসে। ডালহৌসীর আমলে সিকিম রাজ্যের একাংশও ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ :

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ : পেগু অধিকার



লর্ড ডালহৌসী

লর্ড ডালহৌসী তাঁহার স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ দ্বারাও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারসাধন করিয়াছিলেন। যুদ্ধের দ্বারা যে-পরিমাণ রাজ্য তিনি অধিকার করিয়াছিলেন সমপরিমাণ রাজ্য এই নীতির প্রয়োগের ফলে তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। ব্রিটিশের অধীনে বা ব্রিটিশ শক্তির সাহায্যে গঠিত কোন রাজ্যের রাজার কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে সেই রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া আসিবে, কোন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া সেই রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া চলিবে না, এই ছিল স্বত্ববিলোপ-নীতির মর্মার্থ। লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বকালে ভাগ্যচক্রে ভারতের কয়েকটি রাজ্যেরই রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছিলেন। ইহাতে ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানি কর্তৃক গঠিত সাতারা রাজ্য, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য এই নীতির প্রয়োগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ভগৎ, কারাউলি ও উদয়পুর রাজ্যগুলি প্রথমে অধিকার করিয়া পরে অবৈধতার কারণে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেবের ভাতা ডালহৌসী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঞ্জোর ও কর্ণাট রাজ্যের রাজাগণকে পেনশন দানের ব্যবস্থা করিয়া এই দুইটি রাজ্যও ডালহৌসী অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ ভিন্ন

স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার

ভারতে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান

অরাজকতার অজুহাতে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন (১৮৫৬ খ্রীঃ)। হায়দরাবাদের নিজাম ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় বাবদ অর্থ দিতে না পারিলে তাঁহার নিকট হইতে বেরার প্রদেশটি তিনি আদায় করিয়া লইলেন। এইভাবে এক বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লর্ড ডালহৌসী ভারতে গড়িয়া তুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া গিয়াছিলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

(১) ওয়ারেন হেস্টিংস্, কর্নওয়ালিস, বেন্টিঙ্ক, ডালহৌসী ও রিপনের আমলে সংস্কার কার্যাদি

(Reforms under Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, Dalhousie and Ripon)

ওয়ারেন হেস্টিংস্ (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ): ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কতক কতক সংস্কার চালু করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন ভারতে ইংরেজ কোম্পানির সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী যথা গভর্নর এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাস হইবার পর গভর্নর-জেনারেলের ব্যক্তিগত মানসিক উৎকর্ষ ও দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মদক্ষতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কি ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা—সবকিছু তাঁহাদের সংস্কার নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

ওয়ারেন হেষ্টিংস্ যখন বাংলাদেশের গভর্নর হইয়া আসিলেন (১৭৭২ খ্রীঃ)* তখন বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের এক সঙ্কটকাল। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রীঃ) বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসনের কুফল কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় প্রকটিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কোম্পানির শাসনব্যবস্থার সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি দ্বৈত শাসন বাতিল করিয়া দিয়া রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ দায়িত্ব কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভার কালেক্টর নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ভ্রাম্যমাণ কমিটি (Committee of Circuit) নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া তিনি উহার উপর জমি বন্দোবস্ত দিবার ভার দিলেন। রাজস্বসংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ এবং সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি রেভিনিউ বোর্ড (Board of

ওয়ারেন হেষ্টিংসের রাজস্ব-সংস্কার ও রাজস্ব-ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা

* ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যাদির উপর কতক পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাস করে। ইহার অন্যতম শর্ত ছিল বাংলার গভর্নরকে গভর্নর-জেনারেল পদে উন্নীত করা এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কাউন্সিলের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দান করা। ওয়ারেন হেষ্টিংস সর্বপ্রথম গভর্নর-জেনারেল ছিলেন

Revenue) বা রাজস্ব বোর্ড গঠন করিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্বব্যবস্থা তাঁহার নিজের এবং ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলাদেশের রাজস্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব হেতু তেমন কার্যকর হয় নাই। যে-সকল ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে প্রস্তুত হইত তাহাদিগকেই জমি বন্দোবস্ত দিবার ফলে বহু অনভিজ্ঞ লোকও অত্যধিক পরিমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে জমিদারি লইত এবং প্রজাবর্গের উপর চরম অত্যাচার করিয়া যথাসম্ভব অর্থ আদায় করিত। এই ব্যবস্থার ত্রুটি অল্পকালের মধ্যে প্রকাশ পাইল। হেস্টিংস্ ইহার পর রাজস্বব্যবস্থার নানা প্রকার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। এইভাবে রাজস্বব্যবস্থার উপর পরীক্ষা চলিতে লাগিল।

মোগল শাসনব্যবস্থায় রাজস্ব বিভাগ—অর্থাৎ দেওয়ানীর উপর জমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা-মকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার ছিল। আর ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল নবাবের উপর। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি দেওয়ানীর ভার গ্রহণ করিলে কিছুকাল দেওয়ানী বিচারের ভার নবাবের উপরই ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস্ দেওয়ানীর ভার সরাসরি গ্রহণ করিলে দেওয়ানী বিচারের ভারও কোম্পানিকে লইতে হইল। তিনি বাংলাদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের সুযোগ লইয়া ফৌজদারী বিচারের ভারও কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রতি জেলায় একটি করিয়া মফস্বল দেওয়ানী আদালত ও মফস্বল ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিলেন। সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত স্থাপন করিয়া সেগুলির উপর দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত করিলেন। অবশ্য ফৌজদারী মামলায় প্রাণদণ্ডের আদেশ নবাবের সাপেক্ষ ছিল। এইভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বাংলাদেশের বিচারক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হাতে লইয়া আসিলেন। হিন্দুদের বিচারে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র এবং মুসলমানদের বিচারে কোরাণ ও হদিসের বিধি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। জরিমানার পরিমাণ যাহাতে অত্যধিক না হয় এবং সুদের পরিমাণ যাহাতে হ্রাস করা হয়, সেই ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

বিচারব্যবস্থার সংস্কার

লর্ড কর্নওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ) : লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানির আভ্যন্তরীণ শাসনে দুর্নীতি দূর করিবার এবং শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত করিবার দায়িত্ব লইয়াই ভারতে আসিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন বাড়াইয়া দিয়া তাহাদের অবৈধ উপার্জনের পথ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি অবশ্য ভারতীয়দের উপর কোন প্রকার শাসন-সংক্রান্ত দায়িত্ব দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কোম্পানির কর্মচারিগণের সততা ও আনুগত্যের উপর বিশেষ জোর দিয়া তিনি কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে কতক পরিমাণে সুদক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনিই ভারতের সিভিল সার্ভিসের (I.C.S.) গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করিতে গিয়া তিনি দেশীয় জমিদারদের পুলিশী ক্ষমতার বিলোপসাধন করিলেন এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি এলাকায় এক এক জন দারোগা নিযুক্ত করিলেন। পূর্বে কোম্পানির

কর্মচারীদের দুর্নীতি দূরীকরণের ব্যবস্থা

পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কার

কোম্পানির বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার

কর্মচারিগণ দেশীয় দালালদের নিকট হইতে কোম্পানির জন্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিত। ইহাতে তাহাদের প্রচুর লাভ হইত। কর্নওয়ালিস সরাসরি দালালদের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া কোম্পানির আয় প্রচুর বাড়াইয়াছিলেন।

কর্নওয়ালিস ওয়ারেন হেষ্টিংস্-প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থাকে আরও উন্নত করিলেন। সদর নিজামত আদালত ছিল মুর্শিদাবাদে অবস্থিত তিনি উহা কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। পূর্বে নবাব ছিলেন উহার সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত। কর্নওয়ালিস সেই ভার গভর্নর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন উহার অধীনে চারিটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় স্থাপন করিলেন এবং বিচারকগণ দেশের বিভিন্নাংশে উপস্থিত হইয়া যাহাতে বিচার কার্যাদি সম্পাদন করিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করিলেন। পূর্বেকার দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস, আইনের চক্ষে সকলের সমতা এবং সাক্ষ্য গ্রহণের রীতি পরিবর্তন প্রভৃতি করিয়া তিনি বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাজস্ব বিভাগ হইতে তিনি দেওয়ানী বিচারালয়কে পৃথক করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের অধীনে পর্যায়ক্রমে প্রাদেশিক বিচারালয়, জেলা বিচারালয়, সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয় স্থাপন করিলেন। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারক্ষমতা বাতিল করিয়া দিয়া কেবল শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়াছিলেন।

বিচারব্যবস্থার সংস্কার



লর্ড কর্নওয়ালিস

(লর্ড কর্নওয়ালিসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল তাঁহার প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।) পূর্বে কোম্পানি পাঁচ বৎসরের জন্য, পরে আবার এক বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইহাতে যাহারা জমিদারি গ্রহণ করিত তাহারা জমির উন্নতি সম্পর্কে উদাসীন থাকিত। কারণ তাহাদের হাতে জমিদারি সব সময় থাকিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। পক্ষান্তরে কোম্পানির বৎসরে মোটামুটি কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইবে সেই সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা না পাওয়ায় বাজেট প্রস্তুত করিতে অসুবিধার সৃষ্টি হইত। এজন্য তিনি প্রথমে দশ বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিলেন এবং ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া সেই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিয়া দিলেন (১৭৯৩ খ্রীঃ)।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত
(১৭৯৩ খ্রীঃ)

(চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ এবং অপগুণ উভয়ই ছিল।) রায়তদের উচ্ছেদ, অতিমাত্রায় রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কিছুকালের মধ্যে এই ব্যবস্থার ত্রুটি হিসাবে প্রকাশ পাইল। ইহা ভিন্ন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির দাম

গুণ-অপগুণ

বৃদ্ধি পাইলেও সরকার রাজস্ব বাড়াইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। অবশ্য জমিদারগণের অনেকে জমির উন্নয়ন, প্রজাবর্গকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির কালে সাহায্যদান, শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, জলাশয় খনন, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতিও করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে গুণ অপেক্ষা দোষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটান হইয়াছে।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খ্রীঃ): প্রধানত সংস্কার কার্যাদির জন্যই লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। প্রথমেই তিনি রাজস্বব্যবস্থার কতক পরিবর্তন করিয়া কোম্পানির আর্থিক অনটন দূর করিলেন। সেই সময়ে ভারত হইতে চীনে আফিং চালান হইত। তিনি আফিং ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিয়া কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করিলেন।

রাজস্ব-সংস্কার



লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক

বিচার যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হইতে পারে সেজন্য তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আপীল আদালত তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থায় ভারতীয়দের নিয়োগ না করিবার নীতি বাতিল করিলেন এবং যে-সকল ভারতীয় বিচারক হিসাবে কাজ করিতেন তাঁহাদের বিচারক্ষমতা বাড়াইয়া দিলেন। বিচারালয়ে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের নিয়ম তিনিই চালু করিয়াছিলেন।

বিচারব্যবস্থার সংস্কার

সমাজ-সংস্কারের জন্যই বেণ্টিঙ্কের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এ-বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সমর্থন পাইয়াছিলেন। তিনি ঠগী নামক দস্যুদের দমন করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন।

সতীদাহ নিবারণ

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট অনুসারে কোম্পানিকে বৎসরে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইত। এই অর্থ কেবল প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত। রাজা রামমোহন এই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যয় করিবার জন্য লর্ড আমহার্স্টের নিকট পূর্বে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। রাজা রামমোহন শিক্ষিত বাঙালী সমাজের ইচ্ছাই যে প্রকাশ করিয়াছিলেন সেকথা বেণ্টিঙ্ক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এদিকে সেক্রেটারি প্রিন্সেপ সাহেব ছিলেন প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পক্ষপাতী আর গভর্নর-জেনারেলের সভায় আইনসদস্য লর্ড ম্যাকলে ছিলেন পাশ্চাত্য ভাষার সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী। বেণ্টিঙ্ক ম্যাকলের মত গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ের

শিক্ষা-সংস্কার

ব্যবস্থা করিলেন। তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫ খ্রীঃ) ও বোম্বাইয়ের এলফিন্‌স্টোন ইন্‌স্টিটিউশান স্থাপন করিয়াছিলেন। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়া তিনি ভারতীয়দের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ) : লর্ড ডালহৌসী ভারত-ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রযোক্তা হিসাবেই সমধিক কুখ্যাত। কিন্তু জনস্বার্থে অবদানও তাঁহার কম ছিল না। তিনি আভ্যন্তরীণ পরিবহণব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতিসাধনে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। রুর্‌কির এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন, কলিকাতা বেথুন কলেজের ব্যয়ভার বহন, গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের আধুনিককরণ, গঙ্গার খাল খনন, 'মেরিয়া' নামক সমাজবিরোধীদের দমন, ভারতের রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য তিনি সম্পন্ন করেন। ইহা ভিন্ন টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, ডাক চলাচল ও বিলির সুষ্ঠু ব্যবস্থা, পাঞ্জাবে সামরিক চলাচলের প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ, বন-সংরক্ষণ, চা-বাগানের উন্নয়ন প্রভৃতির জন্যও তাঁহার কার্যকাল স্মরণীয়। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন, কলেজের অনুপাতে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যার অপ্রতুলতা প্রভৃতির অব্যবস্থা দূরী-করণের প্রয়াস, শিক্ষা পরিদর্শন সংক্রান্ত সরকারী বিভাগ স্থাপন প্রভৃতির জন্য ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবার যোগ্য।

আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ

এই সূত্রে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার্ চার্লস্‌ উডের প্রতিবেদন (Wood's Dispatch) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই যুগে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত, অথচ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবহেলিত হইত। পক্ষান্তরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইত। চার্লস্‌ উডের প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের নির্দেশ ছিল। শিক্ষার ভিত্তি রচনায় ইহার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, বলা বাহুল্য। লর্ড ডালহৌসীও উডের এই নির্দেশ পূর্ণ মাত্রায় সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সরকারী সাহায্যের দ্বারা হাই স্কুল ও কলেজীয় শিক্ষার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাও উডের প্রতিবেদনে উল্লিখিত ছিল। শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার কাঠামোকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার প্রয়োজনীয়তাও এই প্রতিবেদনে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহার ফল স্বরূপ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল (১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ)।

উডের প্রতিবেদন
(Wood's Dispatch)

লর্ড রিপন* (১৮৮০-৮৪ খ্রীঃ) : লর্ড রিপনের শাসনকালে শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের দাবি স্বীকৃত হইয়াছিল। এজন্য লর্ড রিপনের নাম ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনভার ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত করেন। গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট

* নবম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে লেখা আছে *History of India up to the Middle of the 19th Century* এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ পর্যন্ত উহা লিখিবার নির্দেশ আছে। অথচ ১৮৮০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপনের সংস্কার ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। যাহা হউক, সিলেবাসে যখন দেওয়া হইয়াছে সেজন্য রিপনের সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা দেওয়া হইল।

নির্মাণ, শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রভৃতির ভার তিনি লোক্যাল বোর্ড নামক প্রতিনিধিসভার হস্তে ন্যস্ত করেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ভার ভারতীয়দের উপর ন্যস্তকরণ

ইহা ভিন্ন কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থার উন্নতি বিধান করিয়া এবং শহরাঞ্চলে উহার ব্যাপক প্রয়োগ করিয়া তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনভার ভারতীয়দের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ সদস্য, মেয়র, চেয়ারম্যান প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। এই সকল সংস্থাকে তিনি অধিকতর দায়িত্বশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশ্য কর্তব্য কার্যে অবহেলা করিলে এই সকল স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবে এই ব্যবস্থাও তিনি রাখিয়াছিলেন।


লর্ড রিপন

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনরায় স্বীকৃত

লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের সমালোচনার অধিকার বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। লর্ড রিপন দেশীয় পত্রিকাগুলির সেই অধিকার পুনরায় ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

হাণ্টার কমিশন

শিক্ষার উন্নতির জন্য রিপন 'হাণ্টার কমিশন' নামে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতে উচ্চ শিক্ষার তুলনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অতি সামান্য মাত্রায় বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই সুপারিশ হাণ্টার কমিশন করিলে লর্ড রিপন উহা গ্রহণ করেন এবং সরকারী শিক্ষা-নীতির প্রবর্তন করেন

বিচারব্যবস্থার সংস্কার : ইল্‌বার্ট বিল

সেই সময়ে ভারতীয় বিচারপতিগণ ইওরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন না। বিচারকদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বিচারক্ষমতার তারতম্য থাকা রিপন অযৌক্তিক ও অন্যায় মনে করিলেন। তিনি স্যার্ ইল্‌বার্টের উপর এই বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ভার দিলেন। ইওরোপীয় বিচারপতিগণ ইহা তাঁহাদের পক্ষে অপমানজনক মনে করিয়া ইল্‌বার্ট বিলের বিরোধিতা শুরু করিলেন। পক্ষান্তরে ভারতীয়রা এই বিলের সমর্থন করিয়া আন্দোলন শুরু করিলেন। এই আন্দোলনের তীব্রতার ফলে লর্ড রিপন আইনের খসড়ার কতক পরিবর্তন করিলেন। এই পরিবর্তনের ফলে স্থির হইল যে, ভারতীয় বিচারকদের বিচারালয়ে ইওরোপীয়দের বিচার হইলে ইওরোপীয়গণ ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ ইওরোপীয় লইয়া জুরি গঠনের দাবি করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থায় ইওরোপীয় ও ভারতীয় বিচারকদের

বৈষম্য পূর্ণমাত্রায় দূরীভূত হইল না বটে, কিন্তু এই বিল লইয়া আন্দোলন করিতে গিয়া ভারতীয়গণ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য কিভাবে আন্দোলন করিতে হয় সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন।

লর্ড রিপন প্রজাস্বত্ব আইন পাস করিয়া প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী কালে আইন পাস করা হইয়াছিল। তিনি একটি 'কারখানা আইন' পাস করিয়া শিশু শ্রমিকদের মোট নয় ঘণ্টার বেশী কাজ করান নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি উপযুক্তভাবে ঘেরিয়া রাখার এবং সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। তিনি অবাধ-বাণিজ্য নীতির প্রচলন করিয়া এবং লবণ, মদ ও অস্ত্রশস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। লর্ড রিপনের উদার কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকারের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

কারখানা আইন

বাণিজ্যিক সংস্কার

(২) ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার
(Social, Cultural and Religious Reforms under Indian Initiative)

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা সমগ্র ভারতকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সর্বক্ষেত্রে ক্রমে এক অন্তর্মুখিতা ও আত্মবিস্মৃতি দেখা দিয়াছিল। ভারত-ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল। সংস্কৃতির ধর্মই হইল আঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া। আবদ্ধ জলে যেমন স্রোত আসে না বা জোয়ার-ভাঁটা খেলে না, সেরূপ আবদ্ধ সংস্কৃতিরও কোন অগ্রগতি থাকে না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ভারতের অন্ধকার যুগ

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেজন্য এই নূতন প্রভাবের ফলে যে এক নবজাগরণ ও নবচেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশ, আর তাহার ধারক ও বাহক ছিল বাঙালী জাতি। আরব দেশের সহিত বাণিজ্য-ব্যপদেশে আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ইতালিতে বিস্তার লাভ করিবার ফলে যেমন ইওরোপীয় রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া ভারতীয় রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইতালি ও ইতালীয় জাতি যেরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল ভারতের রেনেসাঁস বা নবজাগরণে অনুরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশ। ফলে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক যুক্তিবাদী

বাংলাদেশে নবজাগরণের সূত্রপাত

দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল। সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার হইতে মুক্তি, বিধবা-বিবাহ, সমাজের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতদের মুক্তি সাধন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বাংলা ও সাহিত্যের উন্নয়ন—সব দিক দিয়া এক ব্যাপক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সময়কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চেষ্টায় সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম—সকল ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রীঃ) : ইওরোপীয় রেনেসাঁস যুগের ইতালির সহিত রেনেসাঁস যুগের—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। পেত্রার্ক, বোক্কাচো প্রভৃতি হিউ-ম্যানিস্ট বা মানবধর্মী যেমন ইতালিতে নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন সেইরূপ ভারতের নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন মানব-ধর্মী বাঙালী মনীষী রাজা রামমোহন রায়। মানবধর্মী বা হিউম্যানিস্ট-সুলভ অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারক-সুলভ মনোবল ও ঋষি-সুলভ প্রজ্ঞা লইয়া রামমোহন এক যুগপ্রবর্তনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

বাংলাদেশ—ইওরোপের ইতালি : রামমোহন হিউম্যানিষ্ট



রাজা রামমোহন রায়

শের শাহ্, আকবর প্রভৃতি উদারচেতা সুলতান-বাদশাহের প্রভাবে হিন্দু ও ইস্‌লামীয় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির আংশিক সমন্বয় সাধিত হইলেও সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে নাই। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যখন এদেশে বিস্তার লাভ করিল তখন হিন্দু, ইস্‌লামীয় ও পাশ্চাত্য—এই তিন প্রকার শিক্ষা, সংস্কৃতির সমন্বয়-সাধনের প্রয়োজন হইল। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই রাজা রামমোহন রায় এই তিনের সমন্বয়সাধন করিয়া এক নবযুগের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

হিন্দু, ইস্‌লামীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়সাধক রামমোহন

রাজা রামমোহন রায় গ্রীক, হিব্রু, ইংরেজী, সীরীয় প্রভৃতি কোন ভাষার, বা হিন্দু, মুসলমান ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সারমর্ম উপলব্ধি করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই সকল জাতির সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনার ফলে তাঁহার মনে এই সত্যটিই প্রকট হইয়া উঠিল যে সকল ধর্ম মূলত একই ভগবানে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অর্থহীন আচার-আচরণ, সামাজিক বা ধর্মীয় বাধানিষেধ কোন কিছুরই প্রকৃত মূল্য নাই। এজন্য তিনি হিন্দু ধর্মকে সংস্কারমুক্ত করিতে চাহিলেন। তাঁহার এই আগ্রহের ফলেই ব্রাহ্ম সমাজের গোড়া-পত্তন হইল (১৮২৮ খ্রীঃ)। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নহে—শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সর্বত্র তিনি

রাজা রামমোহন রায়ের অবদান

চাহিলেন এক নবযুগের, এক নূতন জীবনাদর্শের প্রবর্তন করিতে। বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা

রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ভারতেও যাহাতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সেজন্য তিনি তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শিক্ষার উপর

লর্ড আমহার্স্টের নিকট রাজা রামমোহন রায়ের আবেদন ও প্রতিবাদ

গুরুত্ব আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের অনুরোধ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শিক্ষার জন্য সরকার ব্যয় করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় তদানীন্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে যে পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের আগ্রহ দেখা দিয়াছিল তাহারই দাবি

ডেভিড্ হেয়ার : হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা

সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকার তাহা অগ্রাহ্য করিলে ডেভিড্ হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রীঃ) ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। পরে ইহাই প্রেসিডেন্সী কলেজ নামধারণ করিয়াছে। ডেভিড্ হেয়ার বাংলাদেশে তথা ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'স্কুল-বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করিয়া ইংরেজী ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। স্কটিশ ধর্মযাজক

আলেকজাণ্ডার ডাফ্

আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় কলিকাতায় প্রাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য 'জেনারেল এ্যাসেমব্লীজ ইনষ্টিটিউশান' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজই হইল আলেকজাণ্ডার ডাফ্-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বর্তমান রূপ।

রাজা রামমোহন রায় কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উন্নয়ন, জাতিভেদ প্রথার দূরীকরণ, নারী জাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা তিনি বাঙালীর শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণে তাঁহার সাহায্য ও

রাজা রামমোহন রায়ের বহুমুখী মনীষা

সহায়তা না থাকিলে লর্ড বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। হিন্দু বিধবাদের পুনঃ-বিবাহদান, তাঁহাদিগকে সম্পত্তির অংশদান প্রভৃতি সংস্কারমূলক কার্যের জন্য চেষ্টা করিয়া রাজা রামমোহন রায় তাঁহার উন্নত মনের পরিচয় দান করিয়া

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত

গিয়াছিলেন। এককথায় বলিতে গেলে তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের প্রকৃত উদ্যোক্তা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন এবং ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য রাজা রামমোহন রায় যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন সেই পথ অনুসরণ

করিয়াই পরবর্তী কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ উন্নয়নের চেষ্টা চলিয়াছিল। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে রামমোহনকে বাংলা তথা ভারতের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রবর্তক বলিয়া আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে।

ইয়ং বেঙ্গল : ইয়ং বোম্বে : রাজা রামমোহন রায়ের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ 'ইয়ং বেঙ্গল' (Young Bengal) ও 'ইয়ং বোম্বে' (Young Bombay) ভারতীয় সমাজ-জীবনের পুরাতন সবকিছুরই পরিবর্তনসাধন করিয়া, সবকিছু ভাঙিয়া-চুরিয়া এক নূতন রূপদানে সচেষ্ট হইয়াছিল। প্রাচীনকে ভাঙিবার চেষ্টায় বিশেষভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' তদানীন্তন হিন্দু সমাজকে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক আঘাত হানিয়াছিল, তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে তাহাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে বাঙালী জাতির জড়তা দূরীভূত হইয়া নবজাগরণের বিস্তৃতির পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ডেভিড্ হেয়ার, বেথুন, ডি'রোজিও প্রভৃতির অবদানও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

'ইয়ং বেঙ্গল' ও 'ইয়ং বোম্বে'

ডেভিড্ হেয়ার বেথুন, ডি'রোজিও

ডি'রোজিও (১৮০৯-৩১ খ্রীঃ) : হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডি'রোজিও ছিলেন একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। শিক্ষান্তে তিনি হিন্দু কলেজে পাঁচ বৎসর অধ্যাপনার কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, দেশাত্মবোধ, সত্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, স্বাধীনতা ও সমতার প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে সমসাময়িক কালের সমাজ-সংস্কার ও জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে স্থাপন করিয়াছিল। ডি'রোজিও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রধান নেতা। তিনি এবং তাঁহার অনুগামীরা রামমোহন রায় অপেক্ষাও অধিকতর উদারপন্থী ছিলেন। তিনি রামমোহন রায় এবং ফরাসী বিপ্লবের ধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁহার দক্ষতা, যুক্তিবাদে তাঁহার বিশ্বাস, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মানুষ মাত্রেরই সমতা প্রভৃতির প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে দুর্ধর্ষ দেশপ্রেমিকে পরিণত করিয়াছিল। ছাত্রদের উপর তিনি এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র (Derozian boys) তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। তাঁহার উপর তাহাদের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ডি'রোজিওর অতি-উদার মতবাদ প্রচারে সাহায্য করিয়াছিল। ডি'রোজিওকে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী কবি বলা ভুল হইবে না। তিনি মাতৃভূমির স্তুতি করিয়া ইংরেজীতে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অতি-উদার মতবাদের জন্য তাঁহাকে হিন্দু

ডি'রোজিওর চিন্তাধারা



ডি'রোজিও

কলেজে শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহার সামান্য দিনের মধ্যেই মাত্র ২২ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ডি'রোজিও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ডি'রোজিও ও তাঁহার অনুগামিগণ দেশের প্রচলিত প্রাচীন রীতি-নীতি, সামাজিক আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য সবকিছুর কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। স্ত্রী-জাতির সামাজিক অধিকার, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতির জন্য তাঁহারা সোচ্চার ছিলেন। সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, সভাসমিতির মাধ্যমে ডি'রোজিয়ানগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন সমাজের ধ্যানধারণার পক্ষে তাঁহাদের মতবাদ অত্যধিক অগ্রসর ছিল বলিয়া তাঁহাদের প্রচার কোন প্রকৃত আন্দোলনের রূপ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহাদের প্রচার কার্যাদি কতকটা কেতাবী ধরনের ছিল। যাহা হউক, তাঁহারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কোম্পানির চার্টার এ্যাক্টের পরিবর্তন, জুরির সাহায্যে বিচার, জমিদারের অত্যাচার হইতে রায়তদের রক্ষা করা, ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী কর্মচারীপদে নিয়োগ প্রভৃতি নানা প্রকার উন্নতিমূলক ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করিবার মত অগ্রসরতা তখনকার সমাজের ছিল না এজন্য তাঁহারা কৃতকার্য হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা বাংলাদেশের আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির পথিকৃৎ ছিলেন ইহা অনস্বীকার্য।

সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ডি'রো-জিয়ানদের আন্দোলন

ব্রাহ্ম সমাজ: রাজা রামমোহন হিন্দু ধর্মের অসার, আনুষ্ঠানিক দিকটা বর্জন করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদের ভিত্তিতে উহাকে কুসংস্কারমুক্ত এবং একেশ্বরবাদী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত 'আত্মীয় সভা' পরবর্তী কালের ব্রাহ্ম সমাজের সূচনা বলা যাইতে পারে। সার্বজনীনত্বই ছিল রামমোহন রায়ের ধর্মমতের মূল কথা। তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দু ধর্ম হইতে পৃথক ছিল একথা মনে করা ভুল হইবে। বস্তুত মনীষী ব্রজেন্দ্র-নাথের ভাষায়, তিনি ছিলেন 'ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ' (Brahmin of the Brahmins)। তাঁহার ধর্মমতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইস্‌লাম ও খ্রীষ্ট ধর্মমতের মূলগত একেশ্বরবাদেরই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম ধর্ম রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

রামমোহন কর্তৃক ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার

যাহা হউক, রামমোহনের আরব্ধ কার্য পরবর্তী কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ) ও কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ খ্রীঃ) সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনকে ব্যাপক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। ক্রমে অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-৮৬ খ্রীঃ) নেতৃত্বে বেদের অপৌরুষেয়তার সমালোচনা শুরু হইল। যুক্তিবাদের মাধ্যমে সবকিছু বিচার করিয়া দেখিবার এক প্রবণতা দেখা দিল। কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতা ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের প্রতি এক ব্যাপক ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিল। অনেকে

দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন ও ব্রাহ্ম সমাজ

ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিয়া এই আন্দোলনের সামিল হইলেন। কেশবচন্দ্র সেনই ব্রাহ্ম ধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রগতিশীল সংস্কার নীতির সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাল রাখিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরবর্গকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বহিষ্কার করিলেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন।

কেশবচন্দ্র যীশু খ্রীষ্টের ধর্মনীতির উপর ভিত্তি করিয়া অনুশোচনা ও ভগবদ্ প্রেম ব্রাহ্ম ধর্মের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব সঙ্কীর্তনের অনুকরণে ব্রাহ্ম সমাজেও সঙ্কীর্তন চালু করিলেন। এইভাবে তিনি যীশুবাদ ও চৈতন্যবাদের সংমিশ্রণ সাধন করিলেন। চৈতন্যবাদের প্রভাবে ব্রাহ্ম সমাজেও ভক্তিবাদের বিস্তার ঘটিল। ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রগতিশীল দলের স্ত্রীস্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে অত্যধিক উদার মতবাদ কেশবচন্দ্র সেনের মনঃপূত হইল না। পর্দা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, স্ত্রীজাতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া বা স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না—এই ছিল কেশব সেনের ধারণা। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশব সেন নিজ নাবালিকা কন্যাকে কোচবিহারের হিন্দু মহারাজার সহিত বিবাহ দিলে প্রগতিপন্থিগণ তাঁহার নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামে এক নূতন ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন-পরিচালিত ব্রাহ্ম সমাজ 'নববিধান' নামে পরিচিতি লাভ করিল।

'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' ও 'নববিধান'



কেশবচন্দ্র সেন

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সমাজ-সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিল। পর্দা প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রগতিশীল সংস্কারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ দাবি উত্থাপন করিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইনের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাতে হিন্দু সমাজের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব যে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য উপরি-উক্ত সমাজ-সংস্কারের দাবির সবকয়টিই ক্রমে হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথার ক্ষেত্রে একথা বলা যাইতে পারে। জাতি বিসর্জন না দিয়াও অপর জাতির লোকের সহিত বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতি করা যায় এই রীতি হিন্দু সমাজেও আজ সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল দিক দিয়া বিচার করিলে নব যুগের সৃষ্টিতে ব্রাহ্ম সমাজের দান যথেষ্ট রহিয়াছে। অবশ্য একেশ্বরবাদ প্রচারে ব্রাহ্ম সমাজ অকৃতকার্য হইয়াছে একথা অনস্বীকার্য।

ব্রাহ্ম সমাজ ও সমাজ-সংস্কার

ঈশ্বরচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খ্রীঃ) : বাংলাদেশে নবজাগরণের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মনীষায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত শিক্ষা সমাপন করিয়া প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিত হিসাবে কার্য গ্রহণ করেন। স্মৃতি পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য 'ল কমিটি' (Law Committee) তাঁহাকে বিদ্যাসাগর উপাধি দিয়াছিলেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। অল্প কালের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন।

পরিচয়



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রতীকস্বরূপ। কর্তৃপক্ষের সহিত মতানৈক্য ঘটিবার ফলে তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময়কার ইওরোপীয়দের আচরণে ভারতীয়দের প্রতি যে অমর্যাদা ও অবহেলা প্রদর্শিত হইত তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিধাবোধ করেন নাই। যে সময়ে সাহেব কর্তৃপক্ষের খোশামোদ করা এবং তাহাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের নিকট নতি স্বীকার করা ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্বভাব, সেই সময়ে সম্পূর্ণ দেশীয় পোশাক—ধুতি, চাদর এবং চটি পরিহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহেবদের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ এবং প্রতিকার করিয়া বাঙালী তথা ভারতীয়দের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ

সমাজ-সংস্কারক হিসাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া আছেন। বাংলাদেশের স্ত্রীলোকের সামাজিক মর্যাদা, তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে এই মহামনীষী যতদূর করিয়াছিলেন তাহা অপর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলেই তাঁহারা সমাজের গলগ্রহরূপে থাকিবেন না, সমাজে তাঁহাদের স্থান স্বীকৃত হইবে একথা উপলব্ধি করিয়া তিনি 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' (Hindu Female School) স্থাপনে বেথুন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সাহায্য-সহযোগিতা পাইয়াছিলেন। সংস্কৃতে অনন্যসাধারণ পণ্ডিত হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজে চাকরি করিবার কালে সেখানে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা

সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর : স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর গুরুত্ব দান

করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার উন্নতিসাধনে বিদ্যাসাগরের অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি শিশুদের এবং বয়স্কদের জন্য সাহিত্য রচনা করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন।

হিন্দু সমাজে বিধবাদের দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া এবং তাঁহাদিগকে মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশ দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিধবা-পুনঃবিবাহ আইনত স্বীকৃত হয়। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অবিস্মরণীয়। হিন্দুদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা রদের জন্যও বিদ্যাসাগর আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের কুলীন ব্রাহ্মণগণ বহু বিবাহ করিতেন। এ-বিষয়ে আইন পাস হইবার ব্যবস্থা যখন প্রায় স্থির সেই সময়ে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হইলে তাহা আর সম্ভব হয় নাই।

বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সাফল্য

বিদ্যাসাগর ছিলেন নির্ভীক সমাজ-সংস্কারক, অত্যুচ্চ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন শিক্ষাবিদ্। তাঁহার দয়াশীলতা, সর্বোপরি তাঁহার মানবহিতৈষণা তাঁহাকে জাগ্রত বাংলার শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছিল।

সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খাঁন (১৮১৭-৯৮ খ্রীঃ): মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছিল না। ফলে হিন্দুরা যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সরকারী চাকরি গ্রহণ করিতে থাকিল তখন মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া গেল। আব্দুল লতিফ প্রমুখ মুসলমান নেতা মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হাজি মহম্মদ মহসীন মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করিলেন। এই অর্থ হইতে সরকার মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে লাগিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি কতকটা উৎসাহ জন্মিল। কিন্তু এ-বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ করিলেন সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খাঁন। পরে ইনি 'স্যার্' উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন। আলিগড়ে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান এ্যাংলো-ওরিয়েণ্ট্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে উহার সূত্র ধরিয়া আলিগড়ে সমাজ ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আন্দোলন চালু হইল। ইহা আলিগড় আন্দোলন নামে পরিচিত।



সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খাঁন

আলিগড় আন্দোলন

স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খাঁনকে মুসলমান সম্প্রদায়ের রামমোহন বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তিনি মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিকে আঘাত না দিয়া মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি কুসংস্কারের

বিরোধী ছিলেন, যুক্তিগ্রাহ্য সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আল্লা বা ঈশ্বরের বাণী—অর্থাৎ কোরাণকে শুধু ভগবানের বাণী হিসাবে না দেখিয়া সেই অনুসারে কাজ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার আন্দোলন সমসাময়িক কালের রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায় ততটা গ্রহণ না করিলেও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত মুসলমানগণ তাঁহার যুক্তিবাদী মতকে গ্রহণ করিয়াছেন।

সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক হিসাবে সৈয়দ আহ্‌ম্মদ

স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খাঁন ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমানগণকে লইয়া 'ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এ্যাসোসিয়েশান' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুসলমান ও ইংরেজদিগকে লইয়া 'মুসলমান এ্যাংলো-ওরিয়েণ্ট্যাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশান অব আপার ইণ্ডিয়া' নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব রোধ করা এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করা। এই সংস্থা কতক পরিমাণে হিন্দু-বিরোধীও ছিল বটে। স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদের ভয় ছিল যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা ভারতে চালু হইলে উহাতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে। এই সকল কারণে মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেসকে সমর্থন না করেন সেই চেষ্টাও করা হইতে লাগিল।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এ্যাসো-সিয়েশান

ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলন অবশ্য স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ সমর্থন করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে সেই সময় তিনি ভারতমাতার দুইটি চক্ষু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং এই দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দিয়াছিলেন।

ইল্‌বার্ট বিলের সমর্থন

প্রার্থনা সমাজ: ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেন মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায়ই যুক্তি-বাদের উপর নির্ভর করিয়া ভগবানের উপাসনা ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রার্থনা সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হয় (১৮৬৭ খ্রীঃ)। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য হিন্দু ধর্মের অংশ হিসাবে, হিন্দু ধর্মের আওতায় থাকিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার করিতে চাহিয়াছিল। বস্তুত নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় ধর্মগুরুর মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রার্থনা সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নয়ন প্রভৃতি অতি-প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের উপর প্রার্থনা সমাজ জোর দিয়াছিল। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১ খ্রীঃ) ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতা। তিনি ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রাণস্বরূপ। ইহার সাফল্য

প্রার্থনা সমাজ—রাণাডে



মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে

সবই মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অক্লান্ত চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ সমিতি, দাক্ষিণাত্য এডুকেশান সোসাইটি নামক সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সংস্থা দুইটি তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন।

প্রার্থনা সমাজ কেবল মৌখিক প্রচারে তাঁহাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের সকল স্তরের লোকের মধ্যে একই সঙ্গে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, স্ত্রীজাতির সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বিধবা-বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি কাজ করিয়া তাঁহারা প্রকৃত সমাজ উন্নয়ন করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত শিশু, পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় শিশুদের জন্য অনাথ-আশ্রম তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

রাণাডের আদর্শ

মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিয়া ভারতীয়দের এক উন্নততর জীবনের আস্বাদ দান করাই ছিল রাণাডের আদর্শ। মানুষের সেবা ও মানুষের প্রতি ভালবাসা ভগবানকে ভালবাসার পন্থাস্বরূপ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সমাজের উন্নতি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উপর নির্ভরশীল, আবার সামাজিক উন্নতি সাধন না হইলে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিবার যোগ্যতাও ভারতবাসীর থাকিবে না, একথা তিনি বলিতেন। সংস্কারক হিসাবে মাধব গোবিন্দ রাণাডেকে রাজা রামমোহনের সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে।

দয়ানন্দ (১৮২৪-৮৩ খ্রীঃ): আর্য সমাজ : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল আর্য সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন।

আর্য সমাজ—দয়ানন্দ

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন আর্য সমাজের স্থাপয়িতা (১৮৭৫ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন একজন গুজরাটবাসী এবং সংস্কৃত পণ্ডিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার অন্তর ছিল যেমন উদার তেমনি উচ্চ আদর্শে পরিপূর্ণ। তিনি সমগ্র ভারতে এক ধর্ম ও এক জাতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অ-হিন্দুদের 'শুদ্ধি'র মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার রীতি চালু করিয়াছিলেন। তিনি বেদ ও উপনিষদের আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দয়ানন্দ আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়া সমাজ-সংস্কার, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে ভারতের জনসাধারণের গুরুত্ব সর্বপ্রথম সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচার সীমাবদ্ধ থাকিলে সমাজের উন্নতি ঘটিবে না একথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ রদ, জাতিভেদ প্রথার অবসান, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি



স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

ছিল আর্য সমাজের আদর্শ। দয়ানন্দ তাঁহার 'সত্যার্থ প্রকাশ' নামক গ্রন্থে আর্য সমাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আর্য সমাজ ধর্মবিষয়ে উদার-নীতির পক্ষপাতী ছিল। দয়ানন্দ-স্থাপিত আর্য সমাজের প্রধান আদর্শ ছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজ হইতে কুসংস্কার দূর করা এবং বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করা। অহিন্দুকে 'শুদ্ধি'র মাধ্যমে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা ছিল আর্য সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬ খ্রীঃ) : শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন হিন্দু ধর্মের প্রতীকস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার উদারতা ও মানবতার মাধ্যমে তিনি সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের পন্থাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষামুক্ত এবং সাধারণ অর্থে অশিক্ষিত এই মহামানব তাঁহার অকৃত্রিম ও হৃদয়স্পর্শী বাণী ও ভাবের দ্বারা হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তির যেমন প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সকল ধর্মের প্রতি সম-পরিমাণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু ধর্মকে সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি-মুক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ অনুসরণ করিয়া এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম একই ভগবানে পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। রামকৃষ্ণ সকল জীবকে শিব-জ্ঞানে সেবা করিবার উদার শিক্ষা দিয়াছিলেন। জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাকে তিনি ধৃষ্টতা মনে করিতেন, জীবের সেবা করাই হইল প্রকৃত ধর্ম একথা তিনি বলিতেন।

সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের বাণী

সকল ধর্ম একই ঈশ্বরে পৌঁছিবার বিভিন্ন পন্থা মাত্র

জীবে প্রেম—জীবে দয়া নহে



শ্রীরামকৃষ্ণ

যে সময়ে শিক্ষিত যুব সমাজ বহির্মুখী হইয়া হিন্দু জাতি ও ধর্মের সব কিছুর প্রতি একটা অবহেলার ভাব পোষণ করিতে শুরু করিয়াছিল সেই সময়ে রামকৃষ্ণ হিন্দু সমাজের সম্মুখে হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ করিয়া হিন্দুদের আত্মবিস্মৃতির পথ হইতে আত্মদর্শনের পথে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত মূর্তি পূজার মাধ্যমেও চরম অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভের পন্থা প্রদর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের শক্তির পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

আত্মদর্শনের মনোবৃত্তি

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ): শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাতিকে নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে নিখিল বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলনে হিন্দু ধর্মের আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া পাশ্চাত্য জাতিকে হিন্দু তথা ভারতীয় ধর্মের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তেমনি বাঙালী তথা ভারতবাসীকে পরধর্ম অনুকরণ না করিয়া নিজস্ব ধর্মের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছিলেন। ভারতবাসী যখনই নিজের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখিল তখনই ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণের দূরদর্শিতা তাহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীকে আত্মবিস্মৃতির পথ ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনের পথের সন্ধান বিবেকানন্দ দিয়া গিয়াছিলেন। ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে এক নূতন আদর্শ, এক নূতন চেতনার বিকাশ ঘটিতে লাগিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন—শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ



স্বামী বিবেকানন্দ

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

(Reaction Against British Rule : Revolt of 1857)

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পটভূমিকা (Background of the Revolt of 1857): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহীদের নানাবিধ অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হইলেও উহা উত্তর-ভারত ও মধ্য-ভারতের সর্বত্র এক ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃতি অতিশয় দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। এইভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের আনুষঙ্গিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন স্বভাবতই দীর্ঘকাল প্রচলিত ভারতীয় জীবনযাত্রায় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসন্তোষ সমাজের প্রতি স্তরেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয়দের অর্থনৈতিক শোষণ, জমিদার, অভিজাতবর্গ, কৃষক, শিল্প-শ্রমিক, হস্তশিল্পী—সকল শ্রেণীর লোককেই আর্থিক দিক দিয়া দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশদের রাজস্ব-নীতি, আইন-কানুন ও

শাসনব্যবস্থা ভূমি-আশ্রয়ী ব্যক্তিবর্গকে ঋণগ্রস্ত করিয়াছিল। মহাজন ও ব্যবসায়ীদের নিকট তাহাদের ভূসম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার, দুর্নীতিগ্রস্ততা, পুলিশ, আদালতের কর্মচারীদের অর্থ-গৃধ্নুতা ভারতীয় জনসাধারণের দুর্দশার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিম্ন পর্যায়ের ব্রিটিশ কর্মচারীদের অর্থাগমের প্রধান পথই ছিল জমিদার, কৃষকশ্রেণী প্রভৃতির উপর চাপ দিয়া অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা। এই সকল কারণে সাধারণ লোক দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়াছিল এবং একপ্রকার হতাশ হইয়াই তাহাদের অনেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। সমাজের উর্দ্ধতন শিক্ষিত সম্প্রদায় উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবার এবং ইংরেজ কর্মচারীদের সমপরিমাণ বেতন পাইবার বা সমমর্যাদা লাভের কোন সুযোগ পাইত না। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিত এবং সর্বোচ্চ সমাজের সহিতও ইংরেজ কর্মচারীরা কোন প্রকার সামাজিক যোগাযোগ রাখিত না। ভারতীয়দের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঔদ্ধত্য ছিল তাহাদের ব্যবহারের প্রকৃতি। ভীতি এবং সন্ত্রস্ততা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার মনোভাব স্বভাবতই ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয়দের মধ্যে জন্মায় নাই।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পটভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম আফগান যুদ্ধ, পাঞ্জাবের সহিত যুদ্ধ এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক পরাজয়ে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি অপরাজেয় এই ধারণা যে ভ্রান্ত একথা ভারতীয়দের মনে জন্মিয়াছিল। এমনকি, যাহারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ ছিল তাহারাও ব্রিটিশ পরাজয়ের সংবাদে মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রিটিশ শাসন জনসাধারণের মনে কোন শ্রদ্ধা বা আনুগত্য অর্জনে সমর্থ হয় নাই।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা বা আনুগত্যের অভাব

ব্রিটিশ শাসনের, বিশেষভাবে ব্রিটিশ কর্মচারীদের অত্যাচার-অবিচার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে সিপাহীদের বিদ্রোহ, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেরিলিতে বিদ্রোহ, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে সিপাহীদের বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দের কোল বিদ্রোহ, ছোটনাগপুরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের বারাসতের নিকট তিতু মীরের বিদ্রোহ, ১৮৫১ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালে মোপ্‌লা বিদ্রোহ এবং ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারে সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের যে মানসিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়িয়া যে ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

বিক্ষুব্ধ ভারতীয়গণের বিদ্রোহ

বিদ্রোহের কারণ (Causes): নানা প্রকার কারণে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী তাঁহার স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ দ্বারা এবং অরাজকতার অজুহাতে সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, অযোধ্যা, কর্ণাট, তাঞ্জোর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

রাজনৈতিক কারণ

পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র নানাসাহেবের বাৎসরিক ভাতাও তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।) এই সকল কার্যকলাপকে এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক কারণ হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক অযোধ্যা অধিকার ভারতের সর্বত্র, বিশেষভাবে অযোধ্যায় দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার ফলে অযোধ্যায় বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছিল। কোম্পানির দেশীয় সৈনিকদের মধ্যেও সেজন্য তীব্র বিরোধিতার ভাব দেখা দিয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে কোম্পানির সিপাহীদের এক বিরাট সংখ্যা ছিল অযোধ্যার লোক। এই সকল সিপাহী কোম্পানির প্রতি আনুগত্যপূর্ণই ছিল এবং ভারতের অপরাপর অংশ জয়ে তাহারা

অযোধ্যা অধিকার



নানাসাহেব

যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের নিজের দেশ বিদেশীদের অধীনে যাইবে ইহা তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের স্থানীয় জাতীয়তাবোধ ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। অযোধ্যা অধিকারের প্রধান যুক্তি ছিল নবাবের অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করা, অথচ ডালহৌসী অযোধ্যা দখলের পর প্রজাবর্গের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। বরং তাহাদিগকে উচ্চ হারে কর ও রাজস্ব দিতে হইয়াছিল। অযোধ্যা রাজ্য দখল করিবার ফলে তথাকার নবাব পরিবারের আশ্রিত বহু ব্যক্তির ভাতা ও বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। নবাবের শাসনকার্য পরিচালনায় নিযুক্ত বহু সংখ্যক কর্মচারী, অভিজাতবর্গ প্রভৃতি কর্মচ্যুত হওয়ায় তাঁহাদের আশ্রিত বহু লোক এবং তাঁহারা বেকার হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বহু জমিদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই স্থলে নূতন জমিদার ও তালুকদার নিয়োগ করা হইয়াছিল। সম্পত্তিচ্যুত জমিদারগণ স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের সর্বাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত হইলেন। ব্রিটিশের প্রতি অযোধ্যা রাজ্যে এক ভীষণ ও ব্যাপক বিদ্বেষ এবং ঘৃণার উদ্রেক হয়। লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক অপরাপর বহু দেশীয় রাজ্য অধিকার, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাহাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিভঙ্গ দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের মতলব সম্পর্কে সন্দেহ ও ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রিটিশ মিত্রতার মূল্য ছিল তাহাদের সম্পূর্ণ অধীনে চলিয়া যাওয়া। এই সকল কারণে নানাসাহেব ঝাঁসির রাণী, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ ব্রিটিশের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন।

(রাজনৈতিক কারণ ভিন্ন এই বিদ্রোহের পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণও ছিল।) উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে শুরু করিয়া প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয়দের উপেক্ষা এবং তাহাদের প্রতি শাসকশ্রেণীর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ব্রিটিশ শাসনের

সামাজিক কারণ

বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল হইতেই ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার শাসক ও শাসিতের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদ্রোহের পূর্বে অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া এই অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য হ্রাস না পাইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও নির্ভীকতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বভাবতই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা বিদ্রোহের সামাজিক কারণ বলা যাইতে পারে।

ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার



দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্

ব্রিটিশ-শাসিত অংশে জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এই বিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি মোট একশত বৎসর ধরিয়া প্রচুর পরিমাণ সোনারূপা এদেশ হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ার ফলে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিলাতী পণ্যদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্পজাত সামগ্রী টিকিতে পারিল না। ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইল। ব্রিটিশ-প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থাও ভারতীয়দের উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করিয়াছিল। তদুপরি নানা প্রকার কর স্থাপন এবং করের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে ক্রমেই দেশের তথা জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। সৈনিকদের আর্থিক অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। তাহাদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। ব্রিটিশ কর্মচারীদের তুলনায় তাহাদের বেতন ও ভাতার স্বল্পতা এবং তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সিপাহীদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। সিপাহীদিগকে ইংরেজ সামরিক কর্মচারীরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিত, তাহাদিগকে পশু অপেক্ষা উন্নততর জীব বলিয়াও মনে করিত না। ব্রিটিশ সৈন্য এবং ভারতীয় সিপাহী যুদ্ধের ব্যাপারে সমপরিমাণ দক্ষ ছিল। অথচ তাহাদের বেতন ছিল ইংরেজ সৈনিক অপেক্ষা বহু কম। সিন্ধু বা পাঞ্জাবে কাজ করিতে গেলে পূর্বে সিপাহীদিগকে ভাতা (allowance) দেওয়া হইত, কিন্তু পরে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সিপাহীদের অভিযোগ দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসিয়াছিল, কিন্তু কোন প্রতিকার না হওয়ায় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি ব্রিটিশ সরকার অভিযোগের মূল কারণগুলি দূর করিতে সচেষ্ট হন নাই। বিদ্রোহীদের গুলি করিয়া হত্যা করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে চাহিয়াছিলেন।

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

সৈন্যদের অভিযোগ

এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব যখন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের স্বার্থে এবং ভারতীয় সংস্কারকদের সমর্থনে প্রবর্তিত উন্নয়নমূলক সংস্কারগুলিও ভারতীয়রা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রভৃতিতে রক্ষণশীল ভারতীয়দের মনে এই কথাই জাগিল যে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন নিশ্চয়ই কোন দুরভিসন্ধি প্রণোদিত। সেই সময়কার ব্রিটিশ কর্মচারীবর্গের ব্যভিচারও জনসাধারণের মনে তাহাদের প্রতি এক তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষা, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রভৃতির প্রবর্তন

সেই সময়ে খ্রীষ্টধর্মযাজকগণ হিন্দু ও মুসলমানগণকে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা শুরু করিলে একথাই সকলের মনে জাগিল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সকলকেই ক্রমে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিবে। স্কুল, হাসপাতাল, জেলখানায় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ভারতীয়দিগকে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে নানা প্রকার কটূক্তি করিত। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ তাহাদের পারিবারিক সম্পত্তির অংশ পাইবে বলিয়া আইন পাস করায় ব্রিটিশ সরকার যে কোন উপায়ে ভারতীয়দিগকে ধর্মান্তরিত করিতে ব্যস্ত এই ধারণা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

ধর্মনৈতিক কারণ

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক কারণে যখন বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে সেই সময়ে এন্‌ফিল্ড্ রাইফ্‌ল্ (Enfield Rifle) নামে একপ্রকার বন্দুকের প্রচলন করা হইল। এই বন্দুকের টোটা দাঁত দ্বারা কাটিয়া বন্দুকে পুরিতে হইত। এগুলি প্রস্তুত করিতে চর্বি ব্যবহার করা হইত। হঠাৎ রটিয়া গেল যে গরু ও শূকর উভয় প্রকার চর্বি এগুলিতে ব্যবহার করা হইয়াছে। স্বভাবতই ধর্মভীরু হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বাংলাদেশের বারাকপুর সামরিক ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিল। অপরাপর সিপাহীও তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বারাকপুরের পল্টনটি ভাঙিয়া দিলেন। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাহার সহায়ক ঈশ্বরী পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হইল না। ইহা মীরাটের সামরিক ছাউনিতে ছড়াইয়া পড়িল। ১০ই মে (১৮৫৭ খ্রীঃ) কর্নেল ফিনিসকে মীরাটের সামরিক ছাউনিতে গুলি করা হইলে বিদ্রোহ প্রকৃতভাবে শুরু হইয়া গেল। ক্রমে উহা দিল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল। মোগল বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে বিদ্রোহী সৈন্যগণ হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিল। ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদিগকে বিদ্রোহী সিপাহীরা হত্যা করিতে লাগিল।

প্রত্যক্ষ কারণ : এন্‌ফিল্ড্ রাইফ্‌লের প্রবর্তন

বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ (২৯শে মার্চ, ১৮৫৭ খ্রী:)

মীরাটে বিদ্রোহ (১০ই মে, ১৮৫৭ খ্রীঃ)

বিদ্রোহের শুরু

বিদ্রোহের বিস্তার (Progress of the Revolt) : সিপাহীদের বিদ্রোহ বাংলাদেশের বহরমপুর ও বারাকপুর হইতে মীরাট এবং সেই স্থান হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। মীরাট হইতে বিদ্রোহীরা দিল্লী পৌছিয়া মোগল বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে হিন্দুস্থানের বাদশাহ্‌ বলিয়া ঘোষণা করিল। দিল্লী বিদ্রোহীদের অধিকারে আসিয়াছে সংবাদ পাওয়া মাত্র ফিরোজপুর ও মুজফ্‌ফরপুরের সিপাহীগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত জনসাধারণও যোগদান করিতে ত্রুটি করিল না। ক্রমেই বিদ্রোহের আগুন পাঞ্জাব, নৌসেরা, হতমর্দান, অযোধ্যা ও বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অপরাপর অংশ, কানপুর, ঝাঁসি, বিহার ও বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ঝাঁসিতে ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাঈ ও তাঁতীয়া তোপী, কানপুরে নানাসাহেব, বিহারে কুনওয়ার সিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এটোয়া, মইনপুরী, রুর্‌কি, এটা, হোদাল, মথুরা, লক্ষ্ণৌ, বেরিলি, শাহ্‌জানপুর, মোরাদাবাদ, বোদাও, আজমগড়, কানপুর, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর, ফতেগড়, হাতরস ও অপরাপর বহু স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিদ্রোহীগণ জেলখানা ভাঙিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল, সরকারী খাজাঞ্চীখানা লুঠ করিল। সিপাহীদের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই বেসামরিক জনসাধারণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অযোধ্যার তালুকদার যাহারা সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিল তাহারা এবং কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান করিল। সমগ্র অযোধ্যায় বিদ্রোহ এক জাতীয় বিদ্রোহে রূপান্তরিত হইল। দাক্ষিণাত্য, রাজস্থান, মধ্য-ভারত প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। ঝাঁসির রাণী ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করেন। তাঁহার অনুচর তাঁতীয়া তোপী পলাইয়া যান। পরে ধৃত হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রথমদিকে বিদ্রোহী সিপাহীরা সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত স্যার্ জন ল্যরেন্স্, হেভেলক, আউট্রাম প্রভৃতি ব্রিটিশ সেনাপতির সামরিক তৎপরতায় এবং ব্রিটিশ, নেপালী ও শিখ সৈন্যদের সাহায্যে ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করে। দিল্লী পুনরধিকার করিবার পর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

বিদ্রোহের বিস্তৃতি ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতীয়া তোপী, নানাসাহেব, কুনওয়ার সিংহ প্রভৃতি



ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ

বিদ্রোহীদের পরাজয়

বিদ্রোহ দমন (Suppression of the Revolt) : ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের আক্রোশ কোন কোন স্থানে নির্দোষ ইওরোপীয় নারী এবং শিশুদের

হত্যাকাণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পৈশাচিকতা অনেক ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। স্যার্ জন ল্যরেন্স, স্যার্ হেন্‌রী ল্যরেন্স, হেভেলক, আউট্রাম, স্যার্ কোলিন ক্যাম্প্‌বেল প্রভৃতি ইংরেজ কর্মচারী ও সেনাপতির চেষ্টায় এবং শিখ ও নেপালী সেনাবাহিনীর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে ঝাঁসির রাণী, তাঁতিয়া তোপী প্রভৃতি বীরত্ব ও রণকৌশলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। পরাধীন দেশকে বিদেশীদের বিতাড়িত করিয়া স্বাধীন করিবার তাঁহাদের এই চেষ্টা ভারতের জনসাধারণের মনে এক গভীর শ্রদ্ধা ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিদ্রোহীদের বীরত্ব

বিদ্রোহের প্রকৃতি (Nature of the Revolt): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ নিছক সিপাহীদেরই বিদ্রোহ না সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ সে-বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। ভারতীয়দের মধ্যে এই বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে অনেকে ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিদ্রোহকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' কিংবা 'সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলন'—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। জে. বি. নর্টন, ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ্ প্রমুখ ব্যক্তির মতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও পরে উহা ব্যাপকতা এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল। সমসাময়িক জনৈক মার্কিন লেখকও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ, চার্লস্ রেকস্, জন কে, জনৈক বাঙালী সামরিক কর্মচারী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন কিছুই ছিল না। তাঁহাদের মতে বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন ও গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করা। বস্তুত ভারতীয় জনসাধারণের দিক হইতে বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে ভারতের জনসাধারণ এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ডক্টর সেন ও ডক্টর মজুমদার এবং আরও অনেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের নানাবিধ তথ্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। এইসব নূতন তথ্য এবং পূর্বে যে-সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছিল—সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও শেষ পর্যন্ত উহা অযোধ্যা, মধ্যপ্রদেশের কোন কোন অংশ এবং বিহারের পশ্চিমাংশে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইয়াছিল একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইয়াছিল বলিয়া উহাকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া অথবা কোন কোন স্থানে উহা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া উহাকে সম্পূর্ণ জাতীয় আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত হইবে বলা

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি—সিপাহী বিদ্রোহ বা জাতীয় যুদ্ধ (?)

স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অসুবিধা

কঠিন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডক্টর মজুমদার বা ডক্টর সেনের যুক্তি সর্বক্ষেত্রেই অকাট্য, এমন নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহাদের দুইজনের সিদ্ধান্তই গতানুগতিক ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে হিন্দুস্থানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা এবং বাহাদুর শাহ্‌ কর্তৃক দেশের হিন্দু-মুসলমান—সকল সম্প্রদায়ের লোককে ইংরেজ বিতাড়নে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান প্রভৃতি এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহে রূপান্তরিত করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। জে. বি. নর্টন ও ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফের মন্তব্য অনুধাবন করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ব্রিটিশদের বিতাড়িত করিতে হইলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন এই ছিল সমসাময়িক ধারণা। নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে আন্দোলন শুরু করা তখন কল্পনার বাহিরে ছিল। সুতরাং জাতীয় আন্দোলন সামরিক বাহিনীর মাধ্যমেই শুরু হইবে ইহাই ছিল যুক্তিযুক্ত। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ বিতাড়ন ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বহু স্থানে কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। আর একথাও সত্য যে, কোন জাতীয় আন্দোলনেই দেশের সকল লোক যোগদান করিয়াছে এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হওয়াই ছিল তখনকার ভারতীয় পরিস্থিতিতে যুক্তিসম্মত পন্থা। সিপাহীদের বিদ্রোহের মাধ্যমে শুরু হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে জাতীয় বিদ্রোহের সম্মান না দিবার যুক্তি নাই। তথাপি একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব হয় নাই। নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইলেই এই বিষয়ে যে মতানৈক্য তাহার অবসান ঘটিবে।

বিফলতার কারণ (Causes of Failure): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের অসাফল্যের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমত, বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতির অভাবই ছিল ইহার প্রধান ত্রুটি। দ্বিতীয়ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন স্বভাবতই আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে সর্বত্র উহা একই পন্থা বা একই গতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়ত, বিদ্রোহীদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের পার্থক্য ছিল। নানাসাহেব হইতে চাহিয়াছিলেন পেশওয়া আর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ হইতে চাহিয়াছিলেন পুনরুজ্জীবিত মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট। আদর্শের এই বিভিন্নতাও এই আন্দোলনকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। চতুর্থত, বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে নেতৃত্ব করিবার মত শক্তি এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার অভাব না থাকিলেও সমগ্র দেশ জুড়িয়া বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিবার মত ক্ষমতাবান নেতার অভাব বিদ্রোহের অসাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ভারতের কোন নৃপতি উহাতে যোগদান করেন নাই। সর্বশেষে, সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব,

বিদ্রোহের অসাফল্যের কারণ:
(১) যোগাযোগের অভাব,
(২) বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক রূপ গ্রহণ,
(৩) আদর্শের পার্থক্য,
(৪) নেতৃত্বের অভাব,
(৫) বিদ্রোহীদের সামরিক দুর্বলতা ও ভুল-ভ্রান্তি—ব্রিটিশ শক্তির কূটকৌশল প্রভৃতি

তাহাদের সামরিক ভুলভ্রান্তি এবং অপরপক্ষে ব্রিটিশ সামরিক ক্ষমতা ও কূটকৌশল বিদ্রোহের অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।

ফলাফল (Outcome): কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সাফল্য লাভ না করিলেও ইহার কতকগুলি সুফল দেখা দিয়াছিল। বহু সংখ্যক ভারতীয় সিপাহী, ইংরেজ নরনারী ও সামরিক কর্মচারী এই বিদ্রোহে প্রাণ হারাইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রাণনাশের বিনিময়ে কতকগুলি সুফলও পাওয়া গিয়াছিল। এই বিদ্রোহ হইতে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকার একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর এরূপ একটি বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত রাখিবার বিপদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ফলে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটাইয়া ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি শাসন স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের মহারাণী এক ঘোষণা (১৮৫৮ খ্রীঃ) দ্বারা ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার ভার তাঁহার পক্ষে একটি কাউন্সিল ও একজন সেক্রেটারির হস্তে ন্যস্ত করিলেন। ভারতে একজন রাজপ্রতিনিধি বা ভাইস্‌রয় নিযুক্ত করিবার নীতি গৃহীত হইল। গভর্নর-জেনারেলই ভাইস্‌রয়-পদে নিযুক্ত হইবেন স্থির হইল। ইহা ভিন্ন এই ঘোষণায় ডালহৌসী-প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ-নীতি পরিত্যাগ করা হইল একথা জানাইয়া দিয়া দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে রাজ্যচ্যুতির যে আশঙ্কা জাগিয়াছিল তাহা দূর করা হইল। ভারতীয় জনসাধারণকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় অধিকতর অংশদানের নীতিও গৃহীত লইল। ইহা ভিন্ন ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যাহাতে ঐক্যবদ্ধ আর কোন আন্দোলন না হইতে পারে সেজন্য 'সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ-নীতি'র প্রয়োগ শুরু হইল। এই সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসকগণ সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে শুরু করিল। দেশীয় সিপাহীদের উপর যাহাতে বেশী নির্ভর করিতে না হয় সেজন্য ভারতে অধিক সংখ্যায় ব্রিটিশ সৈন্য আমদানী করা হইল। লর্ড ক্যানিং ভারতের সর্বপ্রথম গভর্নর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হইলেন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। তাঁহার উদার ও সহানুভূতিসম্পন্ন মনোবৃত্তির ফলে বিদ্রোহীগণ অযথা শাস্তিভোগ হইতে নিস্তার পাইল। কোনপ্রকার প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি না থাকিবার জন্য স্বভাবতই সিপাহী বিদ্রোহের ফলে যে ব্যাপক ইংরেজ বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা ক্রমে অপসৃত হইল।

কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থার অবসান—মহারাণীর ঘোষণা

ভাইস্‌রয় নিয়োগ

স্বত্ববিলোপ-নীতি পরিত্যক্ত

বিভেদ-নীতি

অধিক সংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য আমদানি

প্রথম গভর্নর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় লর্ড ক্যানিং-এর উদারতা

লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর কোম্পানির শাসনকার্য পরিচালনার ভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে গ্রহণের আনুষঙ্গিক সংস্কার ও সংগঠন কার্যে ব্যয়িত হইল। ভারতের সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ সৈন্য লইয়া গঠন করা হইল। গোলন্দাজ বাহিনীতে কোন দেশীয় সিপাহীকে স্থান দেওয়া হইল না। বিদ্রোহের কালে যে ঋণ হইয়াছিল উহা পরিশোধের জন্য এবং সরকারের আয়বৃদ্ধির

সংস্কার: সামরিক ও অর্থনৈতিক

জন্য আয়কর ও আমদানী শুল্ক স্থাপন করা হইল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মচারী ছাঁটাই করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইল। ইহা ভিন্ন রাজস্ব আইন, পেনাল কোড, ফৌজদারী আইন প্রভৃতির সংস্কারসাধন করা হইল। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় একটি করিয়া হাইকোর্ট এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহার পূর্বেই (১৮৫৭ খ্রীঃ) স্থাপিত হইয়াছিল।

বিচার ও আইন সংক্রান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ)

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ (Indian Councils Act) পাস করিয়া কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে নিজ নিজ এলাকায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল। গভর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয়কে আইন পরিষদ (কাউন্সিল) কর্তৃক গৃহীত আইন বাতিল করিবার এবং জরুরী পরিস্থিতিতে অর্ডিন্যান্স পাস করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল।

কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্

নব-যুগের সূচনার পথে ভারত (India on the Threshold of a New Era): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল সত্য কিন্তু এই বিদ্রোহের শিক্ষা ভারতবাসীর অন্তর হইতে মুছিয়া গেল না। বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অমানুষিক বর্বরতা ভারতবাসীকে মনেপ্রাণে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জাতির প্রতি বিদ্বেষী করিয়া তুলিল। পক্ষান্তরে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহীদের সাহসিকতা, বীরের ন্যায় বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জীবন দান প্রভৃতির কাহিনী যখন দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল তখন বিদ্রোহীদিগকে ব্যাপকভাবে সাহায্য দানে অগ্রসর না হওয়ার জন্য ভারতবাসীর অন্তরে গভীর অনুতাপের সৃষ্টি হইল। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত সেই সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতীয়দের ভাবজগতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয়দের অন্তঃস্থলে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের শিক্ষা

পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, ইওরোপীয়দের জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। ক্রমে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ভারতবাসীর জাতীয় আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সরকারী সর্বোচ্চ কর্মচারী পদে (আই. সি. এস্.) ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যাপারে আন্দোলন, সমগ্র ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার এবং ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান' (Indian Association) স্থাপন করিলেন। এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত ভারতের সূচনা হইল।

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

বংশ-পরিচয়

মগধের রাজবংশাবলী

বিম্বিসারীয় বংশ :

বিম্বিসার	৫৪৪—৪৯৩ খ্রীঃ পূঃ
অজাতশত্রু	৪৯৩—৪৬১ "
উদয়ভদ্র	৪৬১—৪৪৫ "
অনিরুদ্ধ ও মুণ্ড	৪৪৫—৪৩৭ "
নাগ দাসক	৪৩৭—৪১৩ "

শৈশুনাগ বংশ :

শিশুনাগ	৪১৩—৩৯৫ খ্রীঃ পূঃ
কাকবর্ণ	৩৯৫—৩৪৫ "

নন্দ বংশ :

মহাপদ্মনন্দ	৩৪৫—? খ্রীঃ পূঃ
উগ্রসেন	?
ধননন্দ	? —৩২৪ "

মৌর্য বংশ :

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	৩২০—৩০০ খ্রীঃ পূঃ
বিন্দুসার	৩০০—২৭৩ "
অশোক	২৭৩—২৩৬ "
* * *	
বৃহদ্রথ	?

শুঙ্গ বংশ : ১৮৭—৭৫ খ্রীঃ পূঃ

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ
অগ্নিমিত্র
সুজ্যেষ্ঠ
বসুমিত্র
ভাগভদ্র
দেবভূতি

কাণ্ব বংশ : ৭৫—৩০ খ্রীঃ পূঃ

বসুদেব
ভূমিমিত্র
নারায়ণ
সুশর্মন্

সাতবাহন (অন্ধ্র) বংশ

সিমুক
কৃষ্ণ
প্রথম সাতকর্ণী
* * *
গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী
বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী
* * *
যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী

কুষাণ বংশ

প্রথম কদ্‌ফিসিস্
দ্বিতায় বা বিম কদ্‌ফিসিস্
* * *
কণিষ্ক
বাশিষ্ক
হুবিষ্ক

গুপ্ত বংশ

শ্রীগুপ্ত
|
ঘটোৎকচ গুপ্ত
|
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত
|
সমুদ্রগুপ্ত
|
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' (৩৮১—৪১৩ খ্রীঃ)
|
প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৫—৪৫৫ খ্রীঃ)
|
স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫—৪৬৭ খ্রীঃ)
|
জীবিতগুপ্ত (দ্বিতীয়)

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ

প্রভাকরবর্ধন
|
রাজ্যবর্ধন (দ্বিতীয়), হর্ষবর্ধন

বাংলার রাজবংশ

শশাঙ্ক (৬০৬-৩৭)

পাল বংশ : গোপাল (৭৫০-৭০)
ধর্মপাল (৭৭০-৮১০)
দেবপাল (৮১০-৫০)
বিগ্রহপাল (প্রথম শূরপাল)
নারায়ণপাল
রাজ্যপাল
দ্বিতীয় গোপাল
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল } (৮৫০-৯৮৮)
প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮)
নয়পাল (১০৩৮-৫৫)
তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৫-৭০)
দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-৭৫) | দ্বিতীয় শূরপাল | রামপাল (১০৭৫-১১২০)

সেন বংশ : বীর সেন
সামন্ত সেন }
হেমন্ত সেন } সামন্তরাজ
বিজয় সেন (১০৭৫-১১৫৮)
বল্লাল সেন (১১৫৮-৭৯)
লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫)

দিল্লী সুলতানি

দাস বংশ : (১) কুতব-উদ্দিন অইবক (১২০৬-১০)
(২) আরাম শাহ্ (১২১০-১১) | কন্যা = (৩) ইল্‌তুৎমিস্ (১২১১-৩৬)

ইল্‌তুৎমিসের সন্তান: নাসির-উদ্দিন মামুদ | (৪) রুক্‌ন-উদ্দিন ফিরোজ | (৫) রাজিয়া (১২৩৬-৪০) | (৬) মুইজ-উদ্দিন বাহ্‌রাম | (৮) নাসির-উদ্দিন মামুদ (১২৪৬-৬৬)

(৭) আলা-উদ্দিন মাস্থদ

(৯) গিয়াস্-উদ্দিন বলবন (১২৬৬-৮৭) (নাসির-উদ্দিনের শ্বশুর)

বুগ্‌রা খাঁ (বাংলাদেশ) | মহম্মদ

(১০) মুইজ-উদ্দিন, কুইকোবাদ (১২৮৭-৯০)
(১১) কয়ুমর

দিল্লী সুলতানি

খল্‌জী বংশ

- (১) জালাল-উদ্দিন ফিরুজ (১২৯০-৯৬)
  - (২) রুকন-উদ্দিন
- শিহাব-উদ্দিন মামুদ
  - (৩) আলা-উদ্দিন খল্‌জী (১২৯৬-১৩১৬)
    - খিজির খাঁ
    - (৪) শিহাব-উদ্দিন ওমর
    - (৫) কুতব-উদ্দিন মুবারক

তুঘ্‌লক বংশ

- (১) গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক
  - (২) মহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লক (১৩২৫-৫১)
- রজ্জব
  - (৩) ফিরুজ শাহ্ (১৩৫১-৮৮)
    - ফতে খাঁ
      - (৪) গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক (দ্বিতীয়)
      - (৮) নসরৎ শাহ্
    - জাফর খাঁ
      - (৫) আবুবকর
    - (৬) নাসির-উদ্দিন মামুদ শাহ্
      - (৭) আলা-উদ্দিন সিকন্দর
      - (৯) মামুদ শাহ্

দিল্লীর সৈয়দ সুলতানগণ (১৪১৪-৫১)

- (১) খিজির খাঁ (১৪১৪-২১)
  - (২) মুইজ-উদ্দিন মুবারক (১৪২১-৩৪)
  - ফরিদ খাঁ
    - (৩) মহম্মদ শাহ্ (১৪৩৪-৪৫)
      - (৪) আলা-উদ্দিন, আলম শাহ্ (১৪৪৫-৫১)

দিল্লীর লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

- (১) বহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-৮৯)
  - বারবক শাহ্ (জৌনপুর)
  - (২) নিজাম খাঁ, সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)
    - (৩) ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-২৬)
  - আলম্

মোগল সম্রাট বংশ

- (১) বাবর (১৫২৬-৩০)
  - (২) হুমায়ুন (১৫৩০-৪০, ১৫৫৫-৫৬)
    - (৩) আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)
      - (৪) জাহাঙ্গীর (সেলিম) (১৬০৫-২৭)
        - খস্রু
          - দাওয়ার বক্স
        - পর্ভেজ
        - (৫) খুর্রম (শাহ্জাহান) (১৬২৭-৫৯) (মৃত্যু, ১৬৬৬)
          - দারাশিকো
          - সুজা
          - (৬) ঔরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭)
            - মহম্মদ
            - (৭) মোয়াজ্জেম বা প্রথম বাহাদুর শাহ্ (প্রথম শাহ্ আলম্) (১৭০৭-১২)
              - (৮) জাহান্দার শাহ্ (১৭১২-১৩)
                - (১৪) আজিজ-উদ্দিন (দ্বিতীয় আলমগীর) (১৭৫৪-৫৯)
                  - (১৫) দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬)
                    - (১৬) দ্বিতীয় আকবর শাহ্ (১৮০৬-৩৭)
                      - (১৭) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ (শেষ মোগল সম্রাট) (১৮৩৭-৫৮, মৃত্যু ১৮৬২)
              - আজিম-উস্-শান
                - (৯) ফারুকশিয়ার (১৭১৩-১৯)
              - রফি-উস্-শান
                - (১০) রফি-উদ্-দরাজাত বা দ্বিতীয় শাহ্জাহান (১৭১৯)
                - (১১) রফি-উদ্-দৌলা (১৭১৯)
                - মহম্মদ ইব্রাহিম (১৭২০)
              - জাহান শাহ্
                - (১২) রোশন আখ্তার (মহম্মদ শাহ্) (১৭১৯-৪৮)
                  - (১৩) আহ্মদ শাহ্ (১৭৪৮-৫৪)
            - আজ্ম (১৭০৭)
            - আকবর (১৭০৪)
              - নেকুশিয়ার (১৭১৯)
            - কামবক্স (১৭০৯)
          - মুরাদ
        - শাহ্রিয়ার
      - মুরাদ
      - দানিয়াল
    - মির্জা মহম্মদ
  - কামরান
  - হিন্দাল
  - আস্করী

মারাঠা বংশাবলী

জিজাবাঈ = শাহজী = তুকাবাঈ

ব্যাঙ্কোজী বা একোজী (তাঞ্জোর)

সইবাঈ = শিবাজী (১৬২৭-৮০) = সয়রাবাঈ

প্রথম শম্ভুজী (১৬৮০-৮৯)

শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) (১৭০৮-৪৯)

(দত্তক) রামরাজা

দ্বিতীয় শাহু (দত্তক) (১৭৭৭-১৮১০)

প্রতাপসিংহ (১৮১০-৩৯)

শাহজী রাজা

তারাবাঈ = রাজারাম = রাজসবাঈ (১৬৯০-১৭০০)

তৃতীয় শিবাজী (১৭০০-১২)

রামরাজা (১৭৪৯-৭৭)

দ্বিতীয় শম্ভুজী (কোলহাপুর) (১৭১২-৬০)

চতুর্থ শিবাজী

পেশওয়া বংশ

বিশ্বনাথ

বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০)

প্রথম বাজী রাও (১৭২০-৪০)

চিমন্‌জী

সদাশিব রাও ভাও (মৃত্যু, ১৭৬১)

দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও (নানাসাহেব) (১৭৪০-৬১)

রঘুনাথ রাও (রাঘোবা) (১৭৭৩-৭৪)

বিশ্বাস রাও (মৃত্যু, ১৭৬১)

(প্রথম) মাধব রাও (১৭৬১-৭২)

নারায়ণ রাও (১৭৭২-৭৩)

(দ্বিতীয়) মাধব রাও নারায়ণ (১৭৭৪-৯৬)

অমৃত রাও (দত্তক)

বিনায়ক রাও

দ্বিতীয় বাজী রাও (১৭৯৬-১৮১৮)

নানাসাহেব (দত্তক)

চিমন্‌জী আপ্পা (১৭৯৬)

বাংলার নবাব বংশ

মুর্শিদকুলী খাঁ
(১৭০৩-২৭)

কন্যা = সুজা-উদ্দিন খাঁ
(১৭২৭-৩৯)

সর্‌ফরাজ খাঁ
(১৭৩৯-৪০)

* * *

আলিবর্দী খাঁ
(১৭৪০-৫৬)

(কন্যা) আমিনা বেগম = জৈন-উদ্দিন

সিরাজ-উদ্-দৌলা
(১৭৫৬-৫৭)

* * *

মিরজাফর
(১৭৫৭-৬০, ১৭৬৩-৬৫)

(কন্যা) ফতেমা বেগম = মিরকাশিম
(১৭৬০-৬৩)

নজম্-উদ-দৌলা
(১৭৬৫-৬৬)

সৈইফ্-উদ-দৌলা
(১৭৬৬-৭০)

শিখ গুরুগণ : গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৯)

গুরু অঙ্গদ (১৫৩৯-৫২)

গুরু অমরদাস (১৫৫২-৭৪)

গুরু রামদাস (১৫৭৪-৮১)

গুরু অর্জুনমল (১৫৮১-১৬০৬)

গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫)

গুরু হররায় (১৬৪৫-৬১)

গুরু হরকিশন (১৬৬১-৬৪)

গুরু তেগ বাহাদুর (১৬৬৪-৭৫)

গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮)

শিখ নেতা : বান্দা (১৭০৮-১৬)

শিখ শক্তি সাময়িকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত

কাপুর সিংহ

বারটি শিখ মিস্‌ল : ভাঙ্গি, কান্‌হিয়া, সুকারচকিয়া, নাকাই, ফাইজুল্লাপুরিয়া, আলুওয়ালিয়া, রামগারিয়া, ডালিওয়ালিয়া, কারোয়া সিঙ্গিয়া, নিশানওয়ালা, শহীদ এবং নাইহাং

রঞ্জিৎ সিংহের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষ

বুধ সিংহ (-১৭১৬)

নোধ সিংহ (১৭১৬-৫২)

চরত সিংহ (১৭৫২-৭৪)

মহা (মহান) সিংহ (১৭৭৪-৯০)

সিংহ (১৭৯০-১৮৩৯)

খরক সিংহ (১৮৩৯-৪০)

নৌ নিহাল সিংহ (১৮৪০)

চাঁদ কাউর (১৮৪০-৪১)

শের সিংহ (১৮৪১-৪৩)

দলীপ সিংহ (১৮৪৩-৪৯)

ব্রিটিশ আমলের গভর্নর ও গভর্নর-জেনারেলগণ

(১) বাংলার গভর্নরগণ

রবার্ট ক্লাইভ	১৭৫৭-৬০
ভ্যান্সিটার্ট	১৭৬০-৬৪
(লর্ড) রবার্ট ক্লাইভ (দ্বিতীয় বার)	১৭৬৪-৬৭
ভেরেল্স্ট্	১৭৬৭-৬৯
কার্টিয়ার	১৭৬৯-৭২
ওয়ারেন হেস্টিংস্	১৭৭২-৭৪

(২) বাংলার গভর্নর-জেনারেলগণ (১৭৭৩ খ্রীঃ রেগুলেটিং এ্যাক্ট্ অনুসারে নিযুক্ত)

ওয়ারেন হেস্টিংস্	১৭৭৪-৮৫
সার্ জন্ ম্যাক্ফার্সন্	১৭৮৫-৮৬
লর্ড কর্নওয়ালিস	১৭৮৬-৯৩
সার্ জন্ শোর	১৭৯৩-৯৮
লর্ড ওয়েলেস্লী	১৭৯৮-১৮০৫
লর্ড কর্নওয়ালিস (দ্বিতীয় বার)	১৮০৫
সার্ জর্জ বার্লো	১৮০৫-০৭
আর্ল-অব্-মিণ্টো (প্রথম)	১৮০৭-১৩
মার্কুইস্ অব্ হেস্টিংস্	১৮১৩-২৩
লর্ড আমহার্স্ট	১৮২৩-২৮
লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক	১৮২৮-৩৩

(৩) ভারতের গভর্নর-জেনারেলগণ

(১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার এ্যাক্ট্ অনুসারে নিযুক্ত)

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক	১৮৩৩-৩৫
সার্ চার্লস্ (লর্ড) মেট্কাফ্	১৮৩৫-৩৬
লর্ড অক্ল্যাণ্ড	১৮৩৬-৪২
লর্ড এলেনবরা	১৮৪২-৪৪
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪-৪৮
লর্ড ডালহৌসী	১৮৪৮-৫৬
লর্ড ক্যানিং	১৮৫৬-৫৮

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র অনুসারে ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল ও ভাইস্রয়

লর্ড ক্যানিং	১৮৫৮

পরিশিষ্ট

MODEL QUESTIONS

CHAPTER I

Essay type

1. Why is geography so important to history?
   ভূগোল ইতিহাসের ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
2. Determine the influence of geography on the country, people and history of India.
   ভারত, ভারতবাসী এবং ভারত-ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব নির্ণয় কর।
3. What are the different races that compose the Indian population?
   কোন্ কোন্ জাতি লইয়া ভারতীয় লোকসংখ্যা গঠিত?
4. Is it correct to regard Indian culture as a composite culture? Give reasons for your answer.
   ভারতীয় সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি বলিয়া বিবেচনা করা ঠিক হইবে কি? যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া বল।
5. Why is there a fundamental unity among the Indians?
   ভারতীয়দের মধ্যে মৌলিক ঐক্য কেন বিদ্যমান?
6. What do you mean by 'Unity in diversity' among the Indians?
   'বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা' ভারতীয়দের ক্ষেত্রে এই কথার তাৎপর্য কি?
7. 'India offers unity in diversity.' Elucidate.
   'বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেশ ভারতবর্ষ।' ব্যাখ্যা কর।

Short answer type

1. Discuss:
   (*i*) Relation of Geography with History.
   (*ii*) Influence of geography on India.
   (*iii*) Influence of geography on Indian history.
   (*iv*) Influence of geography on Indian people.
   আলোচনা কর:
   (১) ভূগোল ও ইতিহাসের সম্পর্ক।
   (২) ভারতের উপর ভূগোলের প্রভাব।
   (৩) ভারত-ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব।
   (৪) ভারতীয়দের উপর ভূগোলের প্রভাব।
2. What are the diversities to be noticed in India?
   ভারতে কি কি বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়?
3. What fundamental unity holds the Indian together?
   কি মৌলিক ঐক্য ভারতীয়দের একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে?
4. What are the names of the different racial groups that compose the Indian population?
   যে যে জাতির লোক লইয়া ভারতের লোকসংখ্যা গঠিত সেগুলির নাম কি কি?
5. Explain the composite nature of the Indian culture.
   ভারতীয় সংস্কৃতি 'মিশ্র সংস্কৃতি' একথা বুঝাইয়া বল।

Objective type

I. Tick off the correct answer in the space provided.
নির্দিষ্ট স্থানে √ চিহ্ন দিয়া সঠিক উত্তরটি দেখাইয়া দাও।

(*i*) Indian people are a racially ... people.

pure	
healthy	
mixed	
honest	

(১) ভারতীয়গণ জাতিগতভাবে একটি ... জাতি।

মৌল	
স্বাস্থ্যবান	
মিশ্রিত	✓
সৎ	

(*ii*) The Indian culture is a ... culture.

unitary	
composite	
multiple	
backward	

(২) ভারতীয় সংস্কৃতি একটি ... সংস্কৃতি।

ঐকিক	
মিশ্র	✓
বহুমুখী	
পশ্চাদপদ	

CHAPTER II

Essay type

1. What are the sources of ancient Indian history?
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি কি কি?
2. How do the accounts of the foreign travellers and writers help us in writing the history of ancient India?
বিদেশী পর্যটক ও লেখকদের রচনা কিভাবে আমাদিগকে ভারত-ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে?
3. Discuss the sources of medieval Indian history.
মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।
4. What are the source materials for writing the history of modern India?
আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি কি কি?

5. Discuss the principal sources of ancient and medieval Indian history.

প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

Short answer type

1. Discuss the importance of the following in reconstructing the history of ancient India.

   (*a*) Inscriptions, (*b*) Coins, (*c*) Foreigners' accounts, (*d*) Archaeological remains.

   প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলির গুরুত্ব আলোচনা কর।

   (ক) লিপি, (খ) মুদ্রা, (গ) বৈদেশিক রচনা, (ঘ) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

Objective type

1. Who are the authors of the following? Point out the correct answer.

   Memoirs of Jahangir Answer: Babur □ Feruz Shah □ Jahangir □

   Memoirs of Babur " Akbar □ Babur □ Humayun □

   নিম্নলিখিত গ্রন্থের রচয়িতা কে? শুদ্ধ উত্তরটি দেখাও।

   জাহাঙ্গীরের জীবনস্মৃতি উত্তর: বাবর □ ফিরুজ শাহ্ □ জাহাঙ্গীর □

   বাবরের জীবনস্মৃতি " আকবর □ বাবর □ হুমায়ুন □

CHAPTER III

Essay type

1. Give an idea of the Indus Civilisation. How old was it?

   সিন্ধু-সভ্যতা সম্পর্কে একটি ধারণা দাও। এই সভ্যতা কত কাল আগের সভ্যতা?

2. Give in brief an account of the Indus Valley Civilisation. What is its historical significance?

   সিন্ধু-সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি?

3. What do you know of the Indus Valley Civilisation?

   সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা সম্পর্কে কি জান?

4. Briefly describe the social and economic life of the Vedic Aryans.

   বৈদিক আর্যদের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

5. Who were the Aryans? Briefly describe their political organisation.

   আর্য কাহারা ছিলেন? তাঁহাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

6. What do you know of the social and political life of the Aryans in the Vedic Age?

   বৈদিক যুগের আর্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবরণ দাও।

7. Write a short account of the social and religious life of the Vedic Aryans. What is called Vedanta?

   বৈদিক আর্যদের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। বেদান্ত বলিতে কি বুঝ?

Short answer type

1. What was the character of the Indus Civilisation?

   সিন্ধু-সভ্যতার প্রকৃতি কিরূপ ছিল?

2. What were the other civilisations that had developed near about the same time with the Indus Civilisation?

   সিন্ধু-সভ্যতার সমসাময়িক আর কোন্ কোন্ সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল?

3. Write what you know about the streets and buildings discovered at Harappa and Mohenjodaro.
হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত রাস্তা এবং দালান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
4. What are the four Vedas? Which was composed first?
চারি বেদ কি কি? কোন্‌টি সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল?
5. What were the different stages or Asramas in life of the Vedic Aryans?
বৈদিক আর্যদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় বা আশ্রম কিরূপ ছিল?
6. Describe the Vedic social life.
বৈদিক সমাজের বর্ণনা দাও।

Objective type

1. Tick off the correct answer:
   (*a*) Nature of the Indus Civilisation

rural		urban		modern	

   (*b*) Indus Civilisation was contemporary with

Vedic civilisation		Egyptian-Chinese-Mesopotemian civilisations		Mahommedan civilisation	

(১) √ চিহ্ন দ্বারা শুদ্ধ উত্তরটি দেখাইয়া দাও:
(ক) সিন্ধু-সভ্যতার প্রকৃতি

গ্রাম্য		নগর		আধুনিক	

(খ) সিন্ধু-সভ্যতা যে সকল সভ্যতার সমসাময়িক ছিল

বৈদিক সভ্যতার		মিশরীয়-চৈনিক-মেসোপটেমিয়া সভ্যতার		মুসলমান সভ্যতার	

2. What do you mean by the four stages or Asramas in the life of the Vedic Aryans? Mark them as 1. 2. 3. 4. according to precedence.

Childhood □
Vanaprastha □
Adult age □
Brahmacharya □
Sannyasa □
After life □
Garhastya □

বৈদিক আর্যদের জীবনের চারি আশ্রম কি কি? ১. ২. ৩. ৪ লিখিয়া কোন্‌টির পর কোন্‌টি দেখাইয়া দাও।

বাল্যজীবন □
বানপ্রস্থ □
কৈশোর □
ব্রহ্মচর্য □
সন্ন্যাস □
পরজন্ম □
গার্হস্থ্য □

3. What is the relation between the Vedas and Upanishads ? Mark the correct answer.

Upanishads are the slokas of the Vedas ☐
" " " books composed before the Vedas ☐
" " " the philosophical knowledge derived from the Vedas ☐
" " " parts of the Rig Veda ☐
" " " the other name for Sham Veda ☐

বেদ ও উপনিষদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি ? শুদ্ধ উত্তরটি দাগ কাটিয়া দেখাও।

উপনিষদ্ বেদের শ্লোক ☐
" বেদের পূর্বে রচিত গ্রন্থ ☐
" বেদের উপর চিন্তার ফলে উদ্ভূত দার্শনিক জ্ঞান ☐
" ঋগ্বেদের অংশ ☐
" সামবেদের অপর নাম ☐

CHAPTER IV

Essay type

1. Discuss the teachings of Mahavira and Buddha.
মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্মনীতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
2. Review the life and teachings of Mahavira.
মহাবীরের জীবনী ও ধর্মনীতি আলোচনা কর।
3. Review the life and teachings of Gautama Buddha.
গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও ধর্মনীতি আলোচনা কর।
4. Distinguish between the teachings of Mahavira and Buddha.
মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্মনীতির পার্থক্য বুঝাইয়া বল।

Short answer type

1. What do you understand by Eightfold path ?
অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলিতে কি বুঝ ?
2. What are the virtues emphasised by Mahavira ?
কোন্ কোন্ সৎকর্মের উপর মহাবীর জোর দিয়াছেন ?
3. Why did Jainism and Buddhism grow up ?
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম কেন উদ্ভূত হইয়াছিল ?

Objective type

1. In which religion the doctrine of existence of life is extended to stone and metals ? Tick off the correct answer :

Answer : Buddhism ☐
Hinduism ☐
Jainism ☐
Vaishnavism ☐

কোন্ ধর্মমতে পাথর ও ধাতুর মধ্যে প্রাণ বিদ্যমান বলিয়া মনে করা হয় ? শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দিয়া দেখাও :

বৌদ্ধ ধর্ম ☐
হিন্দু ধর্ম ☐
জৈন ধর্ম ☐
বৈষ্ণব ধর্ম ☐

2. Fill in the gaps :

   The original name of Buddha was — .
   Mahavira died at — .
   Gautama Buddha preached his first sermon at — .
   Mahavira belonged to a — clan.

   শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

   বুদ্ধের আদি নাম ছিল — ।
   মহাবীর — দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ।
   গৌতম বুদ্ধ — তাঁহার ধর্মমত সর্বপ্রথম প্রচার করেন ।
   মহাবীর — বংশের সন্তান ছিলেন ।

CHAPTER V

Essay type

1. Give in brief an account of the foreign invasions from after the coming of the Aryans till the Huna invasion.
   আর্যদের ভারত আগমনের পর হইতে হূণ আক্রমণ পর্যন্ত বৈদেশিক আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও ।
2. Discuss the political condition of North-West India before the Persian and Greek invasions.
   পারসীক ও গ্রীক আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা কর ।
3. Give an account of Alexander's invasion of India. What was its direct result ?
   আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও । ইহার প্রত্যক্ষ ফল কি হইয়াছিল ?
4. Discuss the nature of resistance offered by the Indians against the foreign invaders. Why did the Indians fail ?
   বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিরোধের ধরন কিরূপ ছিল সে-সম্পর্কে আলোচনা কর । ভারতীয়দের অসাফল্যের কারণ কি ?
5. Discuss the social and cultural effects of the foreign invasions on the Indians.
   ভারতীয়দের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর বৈদেশিক আক্রমণের ফলাফল আলোচনা কর ।
6. Who were the Rajputs ? Give an account of the rise of the Rajputs.
   রাজপুতগণ কাহারা ? রাজপুতদের অভ্যুত্থানের বিবরণ দাও ।

Short answer type

1. Who were the Bactrians ? What do you know of their invasion of India ?
   বাহ্লিকগণ কাহারা ? তাহাদের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে কি জান ?
2. Describe Alexander's war with Poros.
   পুরুর সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধের বিবরণ দাও ।
3. Who were the Kushanas ? Who was their greatest king ?
   কুষাণগণ কাহারা ? তাহাদের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ?
4. Describe the efforts of Poros to save his country against Alexander's invasion.
   আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য পুরুর চেষ্টার বর্ণনা কর ।

Objective type

1. Tick off the correct answers :

Alexander was the king of — Greece ☐ / Rome ☐ / Macedon ☐ / Bactria ☐

Alexander invaded India in — 427 B. C. ☐ / 327 A. D. ☐ / 273 B. C. ☐ / 326 B. C. ☐ / 327 B. C. ☐

The greatest king of the Kushanas was — Kadphises I ☐ / Vima Kadphises ☐ / Kanishka ☐

2. King of which country stood against Alexander in defence of freedom ?

Mark the correct answer : — Taxila ☐ / Paurava ☐ / Madra ☐

১। শুদ্ধ উত্তরটি দাগ কাটিয়া দেখাও :

আলেকজাণ্ডার রাজা ছিলেন : — গ্রীস ☐ / রোম ☐ / ম্যাসিডন ☐ / ব্যাক্‌ট্রিয়া ☐

আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন : — খ্রীঃ পূঃ ৪২৭ ☐ / খ্রীঃ ৩২৭ ☐ / খ্রীঃ পূঃ ২৭৩ ☐ / খ্রীঃ পূঃ ৩২৬ ☐ / খ্রীঃ পূঃ ৩২৭ ☐

কুষাণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন : — প্রথম কদ্‌ফিসিস্ ☐ / বীম কদ্‌ফিসিস্ ☐ / কণিষ্ক ☐

কোন দেশের রাজা আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন ?

২। শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দাও :

তক্ষশিলা ☐ / পৌরব ☐ / মদ্র ☐

CHAPTER VI

Essay type

1. Write in brief the history of the expansion of Magadha into an empire from Bimbisara to Asoka.

বিম্বিসার হইতে অশোক পর্যন্ত মগধের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

2. Who was Chandragupta Maurya ? What were his achievements ?

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কে ছিলেন ? তাঁহার কৃতিত্ব কি কি ?

3. Review the career and achievements of Asoka.
অশোকের জীবনী ও কৃতিত্বের আলোচনা কর।
4, Discuss Asoka's place in history.
ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্ণয় কর।
5. Who was the founder of the Gupta empire? How did Samudragupta extend it?
গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? সমুদ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্য কিভাবে বিস্তৃত করিয়াছিলেন?
6. Sketch the career of Samudragupta and examine him as a statesman and a warrior.
সমুদ্রগুপ্তের জীবনী বিবৃত কর। দূরদর্শী রাজনীতিক এবং যোদ্ধা হিসাবে তাঁহার সমালোচনা-মূলক আলোচনা কর।
7. Write in brief the history of the Guptas from Chandragupta I to Skandagupta.
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত পর্যন্ত গুপ্ত বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।
8. Give in brief the history of the story of Harshavardhana's conflict with Sasanka of Gauda. Did Harshavardhana really succeed in the conflict?
গৌড়ের শশাঙ্কের সহিত হর্ষবর্ধনের দ্বন্দ্বের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে দাও। এই দ্বন্দ্বে হর্ষবর্ধন কি প্রকৃতই জয়ী হইয়াছিলেন?
9. Describe the extent of Sasanka's empire. Estimate his achievements.
শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বর্ণনা কর। তাঁহার কৃতিত্বের তর্জমা কর।
10. Who was the founder of the Pala dynasty of Bengal? Who was the greatest king of the dynasty? Give reasons for your answer.
বাংলার পাল বংশের স্থাপয়িতা কে ছিলেন? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া বল।
11. Account for the rise of the Palas under Gopala and form an estimate of the work of Dharmapala.
বাংলাদেশে গোপালের নেতৃত্বে পাল বংশের উত্থান বর্ণনা কর এবং ধর্মপালের কার্যাবলীর বিচার কর।
12. Give in brief the history of the Pala rule in Bengal with special reference to Dharmapala and Devapala.
ধর্মপাল ও দেবপালের শাসনকাল সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া পাল যুগের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

Short answer type

1. Describe Chandragupta's defence of the country against Seleukos's invasion.
সেলুকাসের আক্রমণের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দেশরক্ষার বিবরণ দাও।
2. What was the impact of the Kalinga War on Asoka?
অশোকের উপর কলিঙ্গ যুদ্ধের কি প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল?
3. Discuss Skandagupta's exploits against the Huna invasion.
হূণ আক্রমণের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর।
4. How did Kanauj come under the Pushyabhuti dynasty of Thaneswar?
থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের অধীন কনৌজ কিভাবে আসিয়াছিল?
5. To what extent was Harshavardhana successful in making the world 'Gaudaless'?
পৃথিবীকে গৌড়শূন্য করিতে হর্ষবর্ধন কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন?

6. What is *Matsya-nyaya*? How did the Bengalees save Bengal from *Matsya-nyaya*?

'মাৎস্য-ন্যায়' কাহাকে বলে? 'মাৎস্য-ন্যায়' হইতে কিভাবে বাঙালীরা বাংলাদেশকে রক্ষা করিয়াছিল?

Objective type

Tick off the correct answer:

(*i*) The founder of the Maurya dynasty was:

- Mura ☐
- Chandragupta I ☐
- Bindusara ☐
- Chandragupta ☐
- Bimbisara ☐

শুদ্ধ উত্তরটি ✓ চিহ্ন দিয়া দেখাও:

(১) মৌর্য বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন:

- মুরা ☐
- প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ☐
- বিন্দুসার ☐
- চন্দ্রগুপ্ত ☐
- বিম্বিসার ☐

(*ii*) The greatest king of the Maurya dynasty was:

- Bimbisara ☐
- Chandragupta ☐
- Asoke ☐
- Bindusara ☐

(২) মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন:

- বিম্বিসার ☐
- চন্দ্রগুপ্ত ☐
- অশোক ☐
- বিন্দুসার ☐

(*iii*) Skandagupta defended the country against

- Bactrian invasion ☐
- Parthian invasion ☐
- Huna invasion ☐
- Kushan invasion ☐
- Seleukos's invasion ☐

(৩) স্কন্দগুপ্ত দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন:

- বাহ্লিক আক্রমণ হইতে ☐
- পহ্লব ,, ,, ☐
- হূণ ,, ,, ☐
- কুষাণ ,, ,, ☐
- সেলুকাসের ,, ,, ☐

CHAPTER VII

Essay type

1. Write an essay on the social condition prevailing India from the Maurya period till the foundation of the Muslim rule in India.

মৌর্য যুগ হইতে শুরু করিয়া মুসলমান শাসনের পূর্বাবধি ভারতের সামাজিক পরিস্থিতির আলোচনামূলক প্রবন্ধ লিখ।

2. Describe the cultural development under the Guptas.
গুপ্ত রাজত্বকালে সাংস্কৃতির উন্নতির বর্ণনা কর।
3. Write a note on the Pallava Art.
পল্লব শিল্প সম্পর্কে একটি টীকা লিখ।
4. Discuss the art and architecture that flourished in South India.
দক্ষিণ-ভারতে শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনা কর।
5. What do you know of the art and literature under the Palas of Bengal.
বাংলার পাল বংশের রাজত্বকালে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে কি জান?

Short answer type

1. Write notes on :
    (*i*) Foreign influence on Maurya sculpture,
    (*ii*) Gandhara Art,
    (*iii*) Chola Art.

    টীকা লিখ :
    (১) মৌর্য ভাস্কর্যের উপর বৈদেশিক প্রভাব,
    (২) গন্ধার শিল্প,
    (৩) চোল শিল্প।
2. Why are the following noted in History :
    (*i*) Pataliputra,
    (*ii*) Mahabalipuram,
    (*iii*) Konarak,
    (*iv*) Ajanta,
    (*v*) Ellora,
    (*vi*) Elephanta,
    (*vii*) Sanchi.

    নিম্নলিখিতগুলি ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
    (১) পাটলিপুত্র,
    (২) মহাবলীপুরম্,
    (৩) কোণারক,
    (৪) অজন্তা,
    (৫) ইলোরা,
    (৬) এলিফ্যান্টা,
    (৭) সাঁচী।

Objective type

1. Fill in the gaps :
    (*a*) Completely Indian art and sculpture had developed side by side with Gandhara art in places like — —.
    (*b*) The gate way to South Indian temples is called —.
    (*c*) Kailash Temple is situated at —.

    শূন্যস্থান পূরণ কর :
    (ক) গন্ধার শিল্পের পাশাপাশি সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন — — স্থানে পাওয়া যায়।
    (খ) দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলির তোরণ দ্বারকে — বলে।
    (গ) কৈলাস মন্দির — অবস্থিত।

CHAPTER VIII

Essay type

1. Briefly narrate the story of the spread of the Indian culture and civilisation beyond India.
ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
2. What are the areas outside India where Indian culture and civilisation had been spread in ancient times?
প্রাচীন যুগে ভারতের বাহিরে কোন্ কোন্ স্থানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল?

Short answer type

1. Give the history of the spread of Indian culture and civilisation in Central Asia.
মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস দাও।
2. How had the Indian culture and civilisation been spread in Champa, Cambodia, Malay, Sumatra and other neighbouring countries?
চম্পা, কম্বোজ, মালয়, সুমাত্রা এবং অপর নিকটবর্তী দেশসমূহে কিভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল?

Objective type

1. What are the following?
Tick off the correct answer;

(*i*) Ankorbhat: A street name ☐
Name of a king ☐
A temple in Cambodia ☐
A palace in Java ☐
A king of Sumatra ☐

(*ii*) Kumarghosa: Brother of Aswaghosa ☐
Priest of Bayon temple ☐
The Bengalee preceptor of the Sailendra kings ☐
Prince of Sumatra ☐

১। নিম্নলিখিতগুলি কি?
শুদ্ধ উত্তর ✓ দাগ দিয়া বুঝাও।

(১) আঙ্কোরভাট: রাস্তার নাম ☐
রাজার নাম ☐
কম্বোজের একটি মন্দির ☐
যবদ্বীপের একটি রাজপ্রাসাদ ☐
সুমাত্রার একজন রাজা ☐

(২) কুমারঘোষ: অশ্বঘোষের ভ্রাতা ☐
বেয়ন মন্দিরের পুরোহিত ☐
শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের ধর্মগুরু ☐
সুমাত্রার যুবরাজ ☐

CHAPTER IX

Essay type

1. Give in brief the history of the establishment of Muslim rule in India from the Arab conquest of Sind till the accession of Qutb-uddin Aibak as Sultan in 1206 A. D.
আরবদের সিন্ধু-বিজয় হইতে শুরু করিয়া ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতব-উদ্দিন অইবকের সুলতানপদ গ্রহণ পর্যন্ত ভারতে মুসলমান অধিকার স্থাপনের ইতিহাস দাও।

2. Narrate the principal raids of Sultan Mahmud of Gazni. What were their direct results ?
গজনীর সুলতান মামুদের প্রধান অভিযানগুলির বিবরণ দাও। তাঁহার অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল কি হইয়াছিল ?

Give in brief the story of Muhammad Ghori's Indian expeditions with special reference to the two battles of Tarain (1191, 1192 A.D.).
মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানগুলি তরাইনের প্রথম এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের (১১৯১, ১১৯২ খ্রীঃ) বিশেষ উল্লেখসহ বর্ণনা কর।

4. What were the contributions of Iltutmish and Balban to the consolidation of the Muslim rule in India ?
ভারতে মুসলমান অধিকার সুদৃঢ় করিতে ইল্‌তুৎমিস্ ও বলবনের অবদান কি ছিল ?

5. Describe the expansion of the Sultanate under Alauddin Khalji.
আলা-উদ্দিন খল্‌জীর অধীনে সুলতানি সাম্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও।

6. Whom do you consider the most important of the Tughluq Sultans ? Give reasons for your answer.
তুঘ্‌লক বংশের সুলতানদের মধ্যে কাহাকে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দাও।

7. Do you consider Muhammad bin Tughlaq to be a mad king ? Give reasons for your answer.
মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লককে উন্মাদ রাজা বলিয়া মনে কর কি ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

8. How did Muhammad bin Tughlaq and Firuz Tughluq contribute to the downfall of the Delhi Sultanate ?
মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক ও ফিরোজ তুঘ্‌লক কিভাবে দিল্লী সুলতানির পতনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ?

9. Account for the decline of the Delhi Sultanate (Turko-Afghan Empire).
দিল্লী সুলতানির (তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্যের) অধঃপতনের কারণ নির্দেশ কর।

10. Who was the real founder of the Mughal empire ?
মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা কে ছিলেন ?

11. Give the history of the Mughal conquest of India from the first Battle of Panipath (1526) to the second Battle of Panipath (1556).
পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬ খ্রীঃ) হইতে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত ভারতে মোগল বিজয়ের ইতিহাস দাও।

12. Who was Sher Shah ? Narrate the history of his rise to the Delhi imperial throne.
শের শাহ্‌ কে ছিলেন ? দিল্লীর সম্রাটপদে আসীন হওয়া পর্যন্ত তাঁহার ইতিহাস বর্ণনা কর।

13. Examine Akbar's claim to be regarded at 'Great'.
আকবরকে 'মহান্‌' বলিবার যৌক্তিকতা আলোচনা কর।

14. Narrate Rana Pratap's struggle against the Mughals. What was its ultimate result?
মোগলদের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও। ইহার শেষ ফল কি হইয়াছিল?

15. How did Akbar make himself a National King?
আকবর নিজেকে ভারতীয়দের জাতীয় সম্রাটে কিভাবে পরিণত করিয়াছিলেন?

16. Examine Aurangzeb as a ruler. What was his responsibility for the downfall of the Mughal empire.
শাসক হিসাবে ঔরংজেবের বিচার কর। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তিনি কতদুর দায়ী ছিলেন?

17. What were the causes of the decline of the Mughal empire?
মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ কি ছিল?

Short answer type

1. Discuss Alauddin Khalji's administrative and military reforms.
আলা-উদ্দিন খল্‌জীর প্রশাসনিক ও সামরিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা কর।

2. What were the public welfare measures adopted by Firuz Tughluq?
ফিরুজ তুঘ্‌লক জনসাধারণের উপকারার্থে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন?

3. Write a note on Shah Jahan's magnificence.
শাহ্‌জাহানের জাঁকজমকপ্রিয়তার উপর একটি টীকা লিখ।

4. Who was Nur Jahan? What were the effects of her influence on Jahangir's administration?
নূরজাহান কে ছিলেন? জাহাঙ্গীরের শাসনব্যবস্থার উপর তাঁহার প্রভাবের ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল?

5. How did Aurangzeb alienate the Rajputs, Jats and the Sikhs?
ঔরংজেব রাজপুত, জাঠ ও শিখদিগকে কিভাবে শত্রুতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন?

6. Write notes on:
(*i*) Chengiz, (*ii*) Taimur, (*iii*) Nadir Shah, (*iv*) Ahmmad Shah Abdali, (*v*) Guru Govinda Singh, (*vi*) Sangram Singh, (*vii*) Rana Pratap.
টীকা লিখ:
(১) চিঙ্গিজ, (২) তৈমুর, (৩) নাদির শাহ্‌, (৪) আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আবদালী, (৫) গুরু গোবিন্দ সিংহ, (৬) সংগ্রাম সিংহ, (৭) রাণা প্রতাপ।

Objective type

1. Tick off the correct answer:

(*i*) Who sacked the Somnath Temple:
- Sabuktigin ☐
- Muhammad of Ghur ☐
- Sultan Mahmud ☐
- Alptigin ☐

(*ii*) With which Mughal Emperor did Sher Shah struggle for the Delhi throne:
- Babur ☐
- Himu ☐
- Humayun ☐
- Jahangir ☐

(*iii*) Who was Rana Pratap:
- King of Ambar ☐
- King of Bikaner ☐
- King of Mewar ☐
- King of Jaisalmir ☐

১। ✓ চিহ্ন দ্বারা সঠিক উত্তরটি দেখাইয়া দাও :

(১) কে সোমনাথ মন্দিরটি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন ?
- সবুক্তিগীন ☐
- মহম্মদ ঘুরী ☐
- সুলতান মামুদ ☐
- আলপ্তিগীন ☐

(২) কোন্ মোগল বাদশাহের সহিত শের শাহের দিল্লীর সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব হইয়াছিল ?
- বাবর ☐
- হিমু ☐
- হুমায়ুন ☐
- জাহাঙ্গীর ☐

(৩) রাণা প্রতাপ কে ছিলেন ?
- অম্বরের রাজা ☐
- বিকানীরের রাজা ☐
- মেবারের রাজা (রাণা) ☐
- জয়সল্মীরের রাজা ☐

CHAPTER X

Essay type

1. Discuss the effects of the impact of Muhammedan rule on the social and economic life of the Indians.

   ভারতের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান শাসনের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর।

2. Discuss the impact of the Muhammedan rule on the art, architecture and literature of India.

   ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের উপর মুসলমান শাসনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

3. Write a note on the Mughal art and architecture.

   মোগল শিল্প ও স্থাপত্যের উপর টীকা লিখ।

4. Write what you know of the reaction of the Indian society and culture under the impact of the Muslim culture.

   ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

5. Write notes on :

   (*i*) Ramananda, (*ii*) Namdev, (*iii*) Kabir, (*iv*) Nanak, and (*v*) Sree Chaitanya.

   টীকা লিখ :

   (১) রামানন্দ, (২) নামদেব, (৩) কবীর, (৪) নানক, এবং (৫) শ্রীচৈতন্য।

Short answer type

1. Write a note on the art, literature and language under the Sultanate.

   সুলতানি আমলে শিল্প, সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে টীকা লিখ।

2. What common features do you notice in the preachings of Kabir, Nanak and Sree Chaitanya ?

   কবীর, নানক ও শ্রীচৈতন্যের ধর্মমতের মধ্যে কি কি ঐক্য তুমি লক্ষ্য কর ?

3. Give a short account of the architecture under the Mughals.

   মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

4. Write notes on :

   (*i*) Social condition under the Sultanate,

   (*ii*) Social reforms under Akbar,

   (*iii*) Mughal art and painting.

টীকা লিখ :

(১) সুলতানি আমলের সামাজিক অবস্থা,

(২) আকবরের সামাজিক সংস্কার,

(৩) মোগল শিল্প ও চিত্র।

Objective type

1. Tick off the correct answer.

What is Tajmahal	Fort	☐
	Tomb	☐
	Mosque	☐

শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দাও :

তাজমহল সৌধটি কি ?	দুর্গ	☐
	সমাধি-সৌধ	☐
	মসজিদ	☐

2. Fill in the gaps :

(*i*) Amir Khasru was a — .

(*ii*) Ziauddin Barni was the greatest — of the Sultanate period.

(*iii*) *Akbarnama* was written by — .

(*iv*) Dewani Am and Dewani Khas were caused to be built by Mughal emperor — .

(*v*) Abdul Hamid Lahori was the author of — .

শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) আমীর খসরু একজন — ছিলেন।

(২) জিয়া-উদ্দিন বরণী সুলতানি আমলের শ্রেষ্ঠ — ছিলেন।

(৩) আকবরনামা — কর্তৃক রচিত হইয়াছিল।

(৪) দেওয়ান-ই-আম্‌ এবং দেওয়ান-ই-খাস্‌ মোগল সম্রাট — কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

(৫) আব্দুল হামিদ লাহোরী — রচনা করিয়াছিলেন।

CHAPTER XI

(a)

Essay type

1. Estimate the character and achievements of Shivaji.
শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

2. Describe briefly the administrative system built up by Shivaji.
শিবাজীর রাজ্যশাসন প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

3. Review the life and work of Shivaji.
শিবাজীর জীবনী ও কার্যকলাপ পর্যালোচনা কর।

4. Give in outline the career of Shivaji. What were his ideals? How far did he succeed?
শিবাজীর জীবনী সংক্ষেপে লিখ। তাঁহার আদর্শ কি ছিল? তিনি কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন ?

Short answer type

1. Discuss Aurangzeb's treatment of Shivaji in his court.
ঔরংজেবের রাজসভায় শিবাজীর প্রতি যে আচরণ করা হইয়াছিল সে-বিষয়ে আলোচনা কর।

2. Narrate Shivaji and Afzal Khan episode.
   শিবাজী ও আফজল খাঁর ঘটনার বর্ণনা দাও।

3. What were the aims and ideals of Shivaji ?
   শিবাজীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ কি ছিল ?

Objective type

1. Mark the correct answer :

(*i*) What title did Shivaji adopt at his coronation ?

- Samrat ☐
- Rajadhiraj ☐
- Gopalaka ☐
- Chatrapati-Go-brahman-Prajapalaka ☐
- Rastrapati Prajabrahmanpalaka ☐

১। শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দাও :

(১) শিবাজী তাঁহার অভিষেকের সময় কি কি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

- সম্রাট ☐
- রাজাধিরাজ ☐
- গোপালক ☐
- ছত্রপতি-গো-ব্রাহ্মণ-প্রজাপালক ☐
- রাষ্ট্রপতি প্রজা-ব্রাহ্মণ-পালক ☐

(*ii*) What is *Chauth* ?

- One-third share of the government revenue ☐
- One-tenth " " " " " " ☐
- One-sixth " " " " " " ☐
- One-fourth " " " " " " ☐

(২) 'চৌথ' কাহাকে বলে ?

- সরকারকে দেয় রাজস্বের তৃতীয়াংশ ☐
- " " " দশমাংশ ☐
- " " " ষষ্ঠাংশ ☐
- " " " চতুর্থাংশ ☐

(*iii*) Who was Kafi Khan ?

- Poet ☐
- Priest ☐
- Historian ☐
- Artist ☐

(৩) কাফি খাঁ কে ছিলেন ?

- কবি ☐
- পুরোহিত ☐
- ঐতিহাসিক ☐
- শিল্পী ☐

(b)

Essay type

1. Discuss the relations of the Sikhs with the Mughals from Guru Arjun to Guru Govinda Singh.
   গুরু অর্জুন হইতে গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত শিখ-মোগল সম্পর্ক আলোচনা কর।
2. What is 'Khalsa'? What led to its rise?
   'খাল্‌সা' কাহাকে বলে? খাল্‌সার উৎপত্তি কেন হইয়াছিল?
3. Sketch the career and statesmanship of Ranjit Singh.
   রঞ্জিৎ সিংহের জীবনী ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বিবরণ দাও।
4. Discuss in brief Anglo-Sikh relations between 1839-1849.
   ১৮৩৯ হইতে ১৮৪৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক আলোচনা কর।

Short answer type

1. Write notes on :
   (*i*) Teg Bahadur,
   (*ii*) Guru Govinda Singh.

১। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :
   (১) তেগ্‌ বাহাদুর,
   (২) গুরু গোবিন্দ সিংহ।

2. What do you know of Queen mother Jhindan?
   রাণীমাতা ঝিন্দন সম্পর্কে কি জান?

Objective type

1. Tick off the correct answer
   Who was called 'Indian Napoleon'?
   Dalip Singh ☐
   Ranjit Singh ☐
   Naunihal Singh ☐

১। সঠিক উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া দেখাও :
   ভারতের নেপোলিয়ন কাহাকে বলা হইত?
   দলীপ সিংহ ☐
   রঞ্জিৎ সিংহ ☐
   নৌনিহাল সিংহ ☐

CHAPTER XII

Essay type

1. Give an account of the Anglo-French rivalry in the Deccan.
   দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও।
2. Trace the circumstances leading to the Battle of Plassey, 1757. What were its results?
   যে সকল ঘটনা প্রবাহে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা দাও। এই যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল?
3. Trace the history of the Anglo-French rivalry in Bengal.
   বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের ইতিহাস দাও।

4. Give in brief the story of the transformation of the East India Company from a trading company to political power.
বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও।

5. Sketch the career of Siraj-ud-dowla.
সিরাজ-উদ্-দৌলার জীবনী বিবৃত কর।

Short answer type

1. Why did Siraj attacked Fort William.
ফোর্ট উইলিয়াম সিরাজ কি কারণে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

2. Discuss the part played by Robert Clive in the conspiracy leading to the Battle of Plassey.
যে ষড়যন্ত্রের ফলে পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহাতে রবার্ট ক্লাইভ কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

3. Write notes on :
(*i*) Dupleix (*ii*) Mir Jafar
টীকা লিখ :
(১) ডুপ্লে (২) মিরজাফর

4. What do you know of the following ?
(*i*) Vas-co-da-gama, (*ii*) Thomas Roe, (*iii*) Hawkins, (*iv*) Alivardi khan, (*v*) Mohanlal.
নিম্নলিখিতদের সম্পর্কে কি জান ?
(১) ভাস্কো-ডা-গামা, (২) টমাস্ রো, (৩) হকিন্স্, (৪) আলিবর্দী খাঁ, (৫) মোহনলাল।

5. Discuss the effects of the Battle of Plassey.
পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর।

Objective type

1. Mark the correct answer :
(*i*) In which year was the Battle of Plassey fought ?

1657 ☐
1567 ☐
1757 ☐
1857 ☐

(*ii*) Who came from Madras to recapture Calcutta after Siraj-ud-dowla had captured it in 1756 ?

Holwell and Watson ☐
Watson and Saunders ☐
Clive and Watson ☐
Clive and Holwell ☐

১। শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দাও :
(১) কোন্ বৎসর পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল ?

১৬৫৭ ☐
১৫৬৭ ☐
১৭৫৭ ☐
১৮৫৭ ☐

(২) সিরাজ-উদ্-দোলা কলিকাতা দখল করিলে মাদ্রাজ হইতে কে কে কলিকাতা পুনর্দখলের জন্য আসিয়াছিলেন ?

হলওয়েল ও ওয়াট্সন ☐
ওয়াট্সন ও সণ্ডার্স ☐
ক্লাইভ ও ওয়াট্সন ☐
ক্লাইভ ও হলওয়েল ☐

CHAPTER XIII

Essay type

1. Examine the contribution of Robert Clive to the foundation of British empire in India.
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে রবার্ট ক্লাইভ কি কি করিয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ কর।
2. Give an outline the history of Bengal from the Battle of Plassey (1757) to the Battle of Buxara (1764).
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হইতে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের মোটামুটি ইতিহাস দাও।
3. Describe the British relations with Mir Jafar and Mir Qasim.
মিরজাফর ও মিরকাশিমের সহিত ব্রিটিশ সম্পর্ক বর্ণনা কর।
4. Give an estimate of Mir Qasim.
মিরকাশিমের কৃতিত্ব বিচার কর।
5. Give in brief the events leading to the Battle of Buxar. What were its consequences ?
বক্সার যুদ্ধের কারণগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল ?
6. Trace the growth of British power in Bengal during the years 1757-1765 A.D.
১৭৫৭ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে বাংলাদেশে ব্রিটিশ শক্তি প্রসারের ইতিহাস লিখ।
7. What were the contributions of Warren Hastings to the consolidation of the British rule in India ?
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কি কি করিয়াছিলেন ?
8. What were the measures adopted by Lord Wellesley for the expansion of British power in India ?
ভারতে ব্রিটিশ শক্তি প্রসারে লর্ড ওয়েলেস্লী কি কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ?
9. Explain what you understand by Subsidiary Alliance. How did it help in the expansion of British power in India ?
অধীনতামূলক মিত্রতা বলিতে কি বুঝ ? এই মিত্রতা চুক্তি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারে কিভাবে সাহায্য করিয়াছিল ?
10. What do you mean by *Doctrine of Lapse* ? Who introduced it and with what results ?
স্বত্ববিলোপ-নীতি বলিতে কি বুঝ ? কে এই নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং উহার ফলাফল কি হইয়াছিল ?
11. Review the measures adopted by Lord Dalhousie for the expansion of the British power in India.
ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিস্তারকল্পে লর্ড ডালহৌসী কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা কর।

Short answer type

1. Discuss the implication of the Grant of Dewani to the East India Company in 1765.
১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানী প্রদানের অর্থ কি আলোচনা কর।
2. 'Mir Qasim was the last independent Nawab of Bengal'. Explain.
'মিরকাশিম বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন', বিশ্লেষণ কর।
3. Discuss the effects of the Battle of Buxar, 1764.
১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর।
4. What was 'Double Government' ? What were its effects.
'দ্বৈত শাসন' কি ছিল ? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল ?
5. What part did Hyder Ali and Tipu play for the defence of their country.
হায়দর আলি ও টিপু তাঁহাদের দেশরক্ষার জন্য কি করিয়াছিলেন ?
6. Write notes on :
   (*i*) First Anglo-Maratha War.
   (*ii*) Second Anglo-Maratha War.

   টীকা লিখ :

   (১) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।
   (২) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।
7. Write short notes on :
   (*i*) Treaty of Basein. (*ii*) Nepal War, (*iii*) Pindari, (*iv*) Treaty of Seringapattam, (*v*) Nana Fadnavis.

   টীকা লিখ :

   (১) ব্যাসিনের সন্ধি, (২) নেপাল যুদ্ধ, (৩) পিণ্ডারী, (৪) সেরিঙ্গাপত্তমের সন্ধি, (৫) নানা ফড়নবিশ।

Objective type

1. Tick off the correct answer :
   (a) In which year did the East India Company obtain the Grant of Dewani of Bengal ?

   1674 ☐
   1764 ☐
   1765 ☐
   1664 ☐
   1665 ☐

১। সঠিক উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া দেখাও :

(ক) কোন্ বৎসর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশের দেওয়ানি লাভ করিয়াছিলেন ?

১৬৭৪ ☐
১৭৬৪ ☐
১৭৬৫ ☐
১৬৬৪ ☐
১৬৬৫ ☐

(b) Who introduced the Subsidiary Alliance?

- Lord Dalhousie ☐
- Lord Bentinck ☐
- Lord Wellesley ☐
- Lord Hastings ☐
- Lord Cornwallis ☐

(খ) অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি কে প্রচলন করিয়াছিলেন?

- লর্ড ডালহৌসী ☐
- লর্ড বেন্টিঙ্ক ☐
- লর্ড ওয়েলেস্‌লী ☐
- লর্ড হেষ্টিংস্‌ ☐
- লর্ড কর্নওয়ালিস্‌ ☐

2. Fill in the gaps:

(*i*) Doctrine of Lapse was introduced by Lord ——.

(*ii*) Treaty of Sagauli brought —— war to a close.

(*iii*) Treaty of Mangalore was signed between —— and ——.

শূন্যস্থান পূরণ কর:

(১) স্বত্ববিলোপ-নীতি লর্ড —— প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

(২) সগৌলির সন্ধি —— যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়াছিল।

(৩) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি —— এবং —— মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

CHAPTER XIV

Essay type

1. Give an account of the administrative and judicial reforms under Warren Hastings.
ওয়ারেন হেষ্টিংসের অধীনে শাসনসংক্রান্ত ও বিচারসংক্রান্ত সংস্কারগুলির বিবরণ দাও।

2. Write what you know about Warren Hastings' administrative and revenue measures.
ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন ও রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থাগুলির বিবরণ দাও।

3. Describe briefly the reforms of Lord Cornwallis.
লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কারগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

4. Who introduced Permanent Settlement? Trace the circumstances leading to it.
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রচলন করিয়াছিলেন? যে ঘটনা প্রবাহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।

5. Why is the administration of William Bentinck so important in Indian history?
ভারত-ইতিহাসে উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকাল এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

6. Describe the reforms introduced by Lord William Bentinck.
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সংস্কারগুলির বর্ণনা দাও।

7. Discuss the judicial reforms of Lord Bentinck.
লর্ড বেন্টিঙ্কের বিচারব্যবস্থার সংস্কারগুলির আলোচনা কর।

8. Describe the reforms measures undertaken by Lord Dalhousie.
লর্ড ডালহৌসী যে সকল সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন সেগুলির আলোচনা কর।

9. What was Lord Dalhousie's responsibility for the Revolt of 1857 ?
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য লর্ড ডালহৌসীর দায়িত্ব কতদূর ?

10. What were Raja Rammohan Ray's contributions to the Indian Renaissance ?
ভারতীয় নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান কি ছিল ?

11. Write a note on the social and cultural reforms initiated by Raja Rammohan Ray, Iswar Chandra Vidyasagar.
রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের প্রবর্তন করিয়াছিলেন সে-বিষয়ের উপর টীকা লিখ।

Short answer type

1. Write notes on :
   (*i*) Derozio, (*ii*) Young Bengal, (*iii*) Dayananda, (*iv*) Syed Ahmmed Khan, (*v*) Prarthana Samaj.
   টীকা লিখ :
   (১) ডি'রোজিও, (২) ইয়ং বেঙ্গল, (৩) দয়ানন্দ, (৪) সৈয়দ আহ্মদ খাঁন, (৫) প্রার্থনা সমাজ।

2. What were the contributions of Brahma Samaj to the social regeneration of Bengal ?
বাংলার সামাজিক নবচেতনার ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজের অবদান কি ছিল ?

3. Write a note on Ramkrishna Paramhansa. What was the importance of his religious ideas and thoughts ?
রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে একটি টীকা লিখ। তাঁহার ধর্মীয় আদর্শ ও চিন্তাধারার গুরুত্ব কি ছিল ?

4. What was the most characteristic part of Dayananda's ideas ?
দয়ানন্দের চিন্তাধারার সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকটি কি ?

5. Who was the main figure of the Prarthana Samaj ? What were the ideals the Prarthana Samaj stood for ?
প্রার্থনা সমাজের মূল ব্যক্তি কে ছিলেন ? এই সমাজের আদর্শ কি ছিল ?

6. What were contributions of Pandit Iswarchandra Vidyasagar of the social reforms, Bengali language, literature and spread of education ?
সামাজিক সংস্কার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান কি ছিল ?

Objective type

1. Give direct (in one word) answer to the following :
   (*i*) Who was the founder of Arya Samaj ?
   (*ii*) Who may be called the father of Indian Renaissance ?
   (*iii*) Different religions are but different ways to reach God. Who said this ?

১। এক কথায় উত্তর দাও :
   (১) আর্য সমাজের স্থাপয়িতা কে ছিলেন ?
   (২) ভারতীয় নবজাগরণের পিতৃপুরুষ কে ছিলেন ?
   (৩) বিভিন্ন ধর্ম একই ঈশ্বরে পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। একথা কে বলিয়াছিলেন ?

CHAPTER XV

Essay type

1. Examine the causes of the Revolt of 1857.
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণগুলি বিচার কর।
2. Do you think that the Revolt of 1857 was a national revolt? Give reasons for your answer.
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে তুমি জাতীয় বিদ্রোহ বলিয়া মনে কর কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।
3. What was the character of the Revolt of 1857?
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ছিল?
4. Discuss the causes of the failure of the Revolt of 1857.
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতার কারণগুলির আলোচনা কর
5. What were the results of the Revolt of 1857?
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলাফল কি হইয়াছিল?

Short answer type

1. Discuss the background of the Revolt of 1857.
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পটভূমিকা আলোচনা কর।
2. Who was Lakshmi Bai? What part did she play in the revolt of 1857?
লক্ষ্মীবাঈ কে ছিলেন? ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে তিনি কি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন?
3. Explain the Doctrine of Lapse.
স্বত্ববিলোপ-নীতির ব্যাখ্যা কর।
4. Write notes on:
(*i*) Tantia Topi, (*ii*) Nana Shaib.
টীকা লিখ: (১) তাঁতিয়া তোপী, (২) নানাসাহেব।
5. What were the areas to which the Revolt of 1857 had spread?
কোন্ কোন্ স্থানে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করিয়াছিল?
6. How was the Revolt of 1857 suppressed?
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ কিভাবে দমন করা হইয়াছিল?
7. What was the Declaration of the Queen Victoria of 1858?
মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণা কি ছিল?

Objective type

Who was the Mughul descendant declared the Emperor of Hindustan by the rebels in 1857? Mark the correct answer.

Ahmmed Shah II ☐
Muhammed Shah II ☐
Bahadur Shah II ☐
Barbak Shah II ☐

কোন্ মোগল বংশধরকে বিদ্রোহীরা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মোগল বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল? সঠিক উত্তরটি দাগ দাও।

দ্বিতীয় আহম্মদ শাহ্ ☐
" মহম্মদ শাহ্ ☐
" বাহাদুর শাহ্ ☐
" বারবক্ শাহ্ ☐